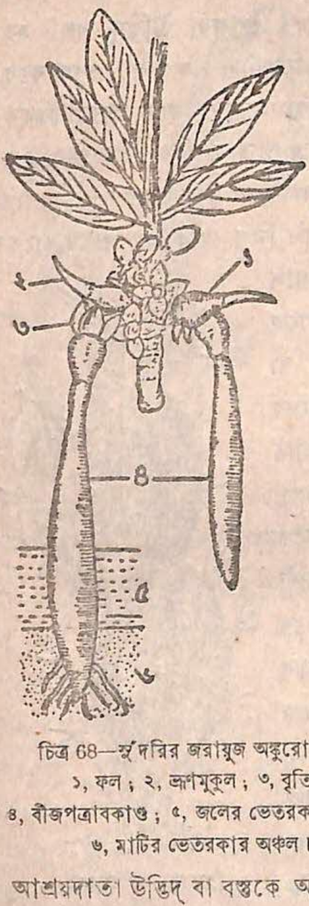
জীবন-বিজ্ঞান

পঞ্চম ভাগ



ডক্টর হরিদাস গুপ্ত

রূপান্তরিত করে। এই ধরনের অভিযোজন পান, গজ-পিপুল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতাকে অবলম্বন ক'রে আলোক ও বাতাসের সন্ধানে উপরের দিকে উঠতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রোহিণী উদ্ভিদ্, যেমন—ঝুমকোলতা, কুমারিকা, ছাগলবটি, মটর, উলটচণ্ডাল ও কুমড়ো—আকর্ষের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্ বা বস্তুকে অবলম্বন ক'রে এদের উপরের দিকে উঠতে দেখা যায়। রাস্না বা অর্কিড তার বায়বীয় মূলের সাহায্যে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেন বাতাস থেকেই গ্রহণ করে। অর্কিড পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্, তাই নিজের পরিপোষণের জন্যে উপরোক্তভাবে মূলগুলিকে অভিযোজিত করে। কেশরদাম জলজ উদ্ভিদ্, তাই কাণ্ড থেকে অস্থানিক মূল বের করে। মূলের ভেতরে প্রচুর বাতাস আবদ্ধ থাকায়, সেটি বেশ স্থূল দেখায়। বাতাস আবদ্ধ থাকার জন্যে উদ্ভিদ্‌টি জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। অঙ্গজ-জনন-প্রক্রিয়ায় বংশ-বিস্তারের জন্যে নানা উদ্ভিদ্ অভিযোজনের সাহায্য নেয়। **পরাগ-সংযোগের জন্য** উদ্ভিদের ফুলে নানারকমের অভিযোজন দেখা যায়।



চিত্র 68—সুঁদরির জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম।
১, ফল; ২, ভ্রূণমুকুল; ৩, বৃতি;
৪, বীজপত্রাবকাণ্ড; ৫, জলের ভেতরকার অঞ্চল;
৬, মাটির ভেতরকার অঞ্চল।



চিত্র 69—অর্কিড বা রাস্নার
পরাশ্রয়ী মূল:
১, বায়বীয় মূল।

পরাগ-সংযোগ বায়ু, জল, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীদের দ্বারা সাধিত হয়। কীট-পতঙ্গ-পরাগী ফুলগুলি আকারে বড়, বর্ণে রঙিন এবং গন্ধ ও মিষ্ট-রসে পূর্ণ থাকে। স্বপরাগযোগকে এড়িয়ে গিয়ে ফুলগুলি ইতরপরাগযোগে ব্রতী হয়। নানারকমের বৈচিত্র্যময় অভিযোজনের দ্বারা ফুলগুলি ইতরপরাগযোগ সংঘটিত করে। বহুপ্রকার **উদ্ভিদ্ আত্মরক্ষার্থে** তার বিবিধ অঙ্গগুলি সেইভাবে অভিযোজিত করে। বাগানবিলাস, করঞ্জা, বেল প্রভৃতির উদ্ভিদের শাখা কণ্টকে পরিণত হয়ে উদ্ভিদ্‌কে বহিঃ-আক্রমণ হতে রক্ষা করে। ঘৃতকুমারী, শিয়ালকাঁটা, খেজুর, বাবলা, কুল, বেত প্রভৃতি পাতা বা পাতার যে-কোন অংশ ও উপপত্র পত্র-কণ্টকে রূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষামূলক অঙ্গে পরিণত হয়। ফণিমনসা, তেশিরা-মনসা, ক্যাকটাস প্রভৃতি গাছে কণ্টকগুচ্ছ বা কূর্চ দেখা যায়। এগুলি আত্মরক্ষার অঙ্গ। গোলাপ, কন্টিকারি, কাঁটা-নটে ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও বৃতির বহিস্ত্বক্ থেকে সূচালো বা বাঁকা কণ্টক উৎপন্ন হয়। এগুলিও আত্মরক্ষার অঙ্গ।

প্রাণীদের অভিযোজনঃ নিম্নলিখিত পন্থায় প্রাণীদের বিবিধ পরিবেশে অভিযোজন কার্যকরী হয়ঃ

(ক) **জলে অভিযোজন** (*Aquatic adaptation*);

(খ) **আকাশে অভিযোজন** (*Volant adaptation*);

(গ) **স্থলে অভিযোজন** (*Terrestrial adaptation*);

(ঘ) **আত্মরক্ষার জন্য অভিযোজন** (*Mimicry adaptation*)।

স্থলের বিবিধ অভিযোজনের পন্থাকে আবার আলাদাভাবে দেখা যায়; যথাঃ

(i) **দ্রুতগতির জন্য অভিযোজন** (*Cursorial adaptation*);

(ii) **খনন-কার্যের জন্য অভিযোজন** (*Fossorial adaptation*);

(iii) **মরু-বাসের জন্য অভিযোজন** (*Desert adaptation*);

(iv) **বৃক্ষ-বাসের জন্য অভিযোজন** (*Scansorial adaptation*);

(v) **গুহা-বাসের জন্য অভিযোজন** (*Cave adaptation*)।

উপরোক্ত অভিযোজনের জন্য জীব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানারকমের পরিবর্তন ঘটে। এমনও দেখা গেছে যে, অনেক জীব-দেহের অন্তর্গঠনেও এই অভিযোজনের জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অভিযোজনের ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলি বংশপরম্পরা-বাহিত হয় এবং প্রাণী জন্মাবার সময়েই উক্ত পরিবর্তনগুলি সঙ্গে

প্রকাশক :
কে. বসু,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

Paper used for printing of this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৪
মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫
মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

মূল্য : টা. 4·00

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৬

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS X

125 pages (Suitably illustrated)

Size—Double Demy (1/16). Type—Small Pica type

Size of the diagram—3″ × 2″ minimum.

(1) Introduction to Nervous system and Sense Organs (Detailed description not required). [15 pages]

(2) General idea about Hormones. [10 pages]

(3) Cell division and its significance—mitosis and meiosis (outline stages only), detail not required. [10 pages]

(4) Growth and reproduction. [15 pages]

(5) Heredity (outline idea only illustrating simple inheritance). [10 pages]

(6) Evolution (outline idea). [10 pages]

(7) Adaptations as exemplified by specimens mentioned in the course content. [20 pages]

(8) Carbon cycle, Nitrogen cycle and Oxygen cycle. [10 pages]

(9) General idea about Eco-system and Conservation. [15 pages]

(10) Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :—

Experiments to show growth, Phototropic movement and Geotropic movement.

Toad—excretory system and male reproductive system. Heart and arterial arches. [10 Pages]

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ প্রবর্তিত ১৯৭৫ সাল হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবশ্যপাঠ্য জীবন-বিজ্ঞানের দশম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত

জীবন-বিজ্ঞান

[পঞ্চম ভাগ : দশম শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর হরিদাস গুপ্ত, এম্.এস্.-সি., ডি.ফিল্.,

অধ্যক্ষ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী,

প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, জীব-বিজ্ঞান ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ ;

ভূতপূর্ব জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, মণিমালা গার্লস কলেজ,

(অধুনা 'মহিলা কলেজ'), আসানসোল

এবং

জীব-বিজ্ঞান প্রবেশ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান প্রয়োগ সমীক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান (পি. ইউ.), *Practical Zoology* (B.Sc.), বিজ্ঞানভারতী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা ;

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

[স্থাপিত ১৯৪০]

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

জীবন-বিজ্ঞান

[পঞ্চম ভাগ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়ু-অঙ্গসমূহ

(Nervous System and Sense Organs)

এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণী চলাফেরা করতে পারে, খাদ্য গ্রহণ ক'রে রেচন ও শ্বসন ইত্যাদি কাজও ক'রে থাকে। এসব সে করে তার কোষের প্রোটোপ্লাজমের গুণের জন্য। এমনকি আলো, বাতাস, স্পর্শ ও বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি তার সংবেদনশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াও পরিষ্কার দেখা যায়।

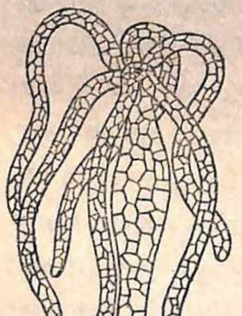
অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। পরিবেশের প্রতি তার অনুভূতি ও ক্রিয়া এবং শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম যে-কোন বহুকোষী প্রাণীরই মতো। এককোষী প্রাণী অভিব্যক্তি-প্রবাহে বহুকোষী প্রাণীতে রূপান্তরিত হবার পরে প্রাণীর দেহে বহু কলা, অঙ্গ ও তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। নানা তন্ত্র নানারকমের কাজ ক'রে চলে। পৌষ্টিকতন্ত্র খাদ্য হজম করে, শ্বাসতন্ত্র অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের ক'রে দেয়, সংবহনতন্ত্র রক্ত-চলাচলের মাধ্যমে দেহের প্রতিটি কোষে খাবার, জল, ভিটামিন, হরমোন ইত্যাদি সরবরাহ করে। দেহের ভেতরকার ময়লা বের করে রেচনতন্ত্র। বংশধারা বজায় রাখার জন্য জনন-তন্ত্র বহুকোষী প্রাণীদের দেহের ভেতর কাজ করে। কিন্তু দেহের ভেতর এদের কাজ কখন কোন্‌টা কে করবে বা কে কতটা কাজ করবে ইত্যাদি প্রশ্নগুলি থেকে যাচ্ছে।

মনে কর, একজন মানুষ দৌড়চ্ছে, সুতরাং বেশী ক'রে রক্ত তার পায়ের পেশীতে সরবরাহ করা দরকার। এই সরবরাহের ব্যবস্থা কে করবে? কিংবা মনে কর, একটি ছাত্রকে ষাঁড়ে তাড়া করেছে। তাকে চট্ ক'রে দৌড়ে পালাতে হবে। কি ক'রে সে পালাবে? কে রক্ত-সংবহনতন্ত্রকে এই বাইরের অনুভূতির খবর দেবে? রক্তও বা এত তাড়াতাড়ি কি ক'রে পেশীতে বেশী পরিমাণে পৌঁছাবে? দেহের সব রকমের তন্ত্রকে সময়মতো কাজ করানো এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা-বন্ধনে

বেঁধে প্রাণিদেহকে সজীবতার আওতার মধ্যে রেখে স্বাভাবিকভাবে চালনা করে প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র। প্রাণী যাতে এককভাবে নিজের জীবন চালাতে পারে, তা সম্ভব করাই স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য কাজ।

স্নায়ু হচ্ছে মানুষের সব কাজের মূল সূত্র। অনেক যন্ত্রপাতি-ভরা মেশিন যেমন তেল বা ইলেকট্রিক বিনা চলতে পারে না, তেমনি মানুষের দেহে সব রকমের তন্ত্র সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলেও স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। খাদ্য-পরিপাক ও মুখ দিয়ে নেমে যাওয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন, ফুস্‌ফুসের সংকোচন ও প্রসারণ ইত্যাদি সবই স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণে চলে। তেমনি বাইরের পরিবেশের অনুভূতি স্নায়ু-অঙ্গের ভেতর দিয়ে দেহে ক্রিয়া করে। একটি ছাত্র যখন তেঁতুলের আচার খায়, পাশে উপবিষ্ট আর একটি ছাত্র তা চোখে দেখলে বা আচারের ঘ্রাণ পেলে তার মুখও স্যালিভা-রসে ভরে যায়। এটা কিন্তু স্নায়ুর কীর্তি। দ্বিতীয় ছাত্রটি ব্যাপারটা বুঝবার আগেই তার মুখবিবর রসে ভরপুর।

সিলিয়া-পরিবেষ্টিত এককোষী প্রাণী, যেমন—প্যারামিসিয়ম, ভরটিসিলা—এরা সিলিয়া-চালনে চলাফেরা করে। এদের প্রোটোপ্লাজম থেকে বের-হওয়া সরু সরু সুতোর মতো ফাইবার প্রতিটি সিলিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এই ফাইবারগুলিই স্নায়ুর কাজ করে। **ছিদ্রালদেহা প্রাণী**, যেমন **স্পঞ্জ**—এদের দেহের প্রতিটি কোষই স্নায়ুকোষের মতো অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে ও সেইভাবে দেহ পরিচালনা করে। **একনালীদেহী প্রাণী** হাইড্রার দেহে পরিষ্কারভাবে স্নায়ুর জাল দেখা যায়। স্নায়ুকোষগুলি তার লম্বা লম্বা স্নায়ুতন্তু দিয়ে হাইড্রার সারা দেহ জালের মতো পরিবেষ্টন ক'রে থাকে। এই স্নায়ুজাল (*Nerve net*) হাইড্রার দেহের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কাজ পরিচালনা করে এবং এদের প্রোটোপ্লাজম দিয়ে তৈরী স্নায়ুতন্তু প্রতিটি কোষ, গ্রন্থি ও যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, হাইড্রার জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখে এই স্নায়ুজাল। তাই হাইড্রা একক প্রাণী।



হাইড্রার স্নায়ুতন্তু

চিত্র 1

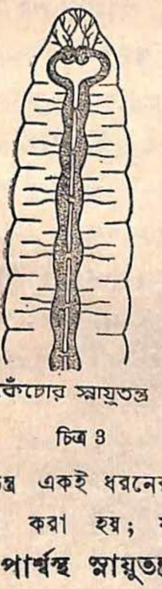
প্লানেরিয়া বা **চ্যাপ্টা ক্রিমি** আরও এক ধাপ উঁচু পর্বের প্রাণী—এদের দেহে পরিষ্কার স্নায়ুতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেহের দুইপাশ দিয়ে দুই প্রধান স্নায়ু থাকতে দেখা যায়। এই স্নায়ু থেকে অসংখ্য শাখা-স্নায়ু বের হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

মাথার দিকে এই দুই সমান্তরাল স্নায়ুরজ্জু যুক্ত হয়। যুক্তস্থানে প্রচুর স্নায়ুকোষ একসঙ্গে থাকে এবং এদের স্নায়ুকোষ-গুচ্ছ বা **গ্যাংলিয়া** (*Ganglia* : sing. *ganglion*) বলা হয়। এই গুচ্ছ থেকে মাথার চারপাশে প্রচুর স্নায়ু বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। চিংড়ির দুটি যৌগিক চোখের মূলে আমরা দেখতে পাই দুটি বড় **সুপ্রা-ঈসোফাজিয়েল** (*Supra-œsophageal*) গ্যাংলিয়া পরস্পর-যুক্ত। এটি চিংড়ির মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক থেকে অঙ্কীয়দেশের মাঝখান থেকে একটি **অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু** (*Ventral nerve cord*) সোজা লম্বালম্বিভাবে চিংড়ির পশ্চাদ্‌ভাগে নেমে যায়। প্রতিটি খণ্ডকে অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুতে একটি ক'রে গ্যাংলিয়া থাকে এবং গ্যাংলিয়া থেকে দু'পাশে অনেকগুলি স্নায়ু বের হয়। শামুক ও তারামাছের স্নায়ুতন্ত্র তাই অত জটিল। শামুকের স্নায়ুতন্ত্রে দেহের নানা জায়গায় কয়েক জোড়া গ্যাংলিয়া থাকে। এরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থেকে সারা দেহকে এককভাবে পরিচালনা করে।



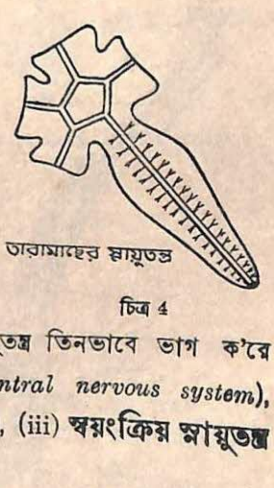
চেপ্টা ক্রিমির স্নায়ুতন্ত্র

চিত্র 2



কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্র

চিত্র 3



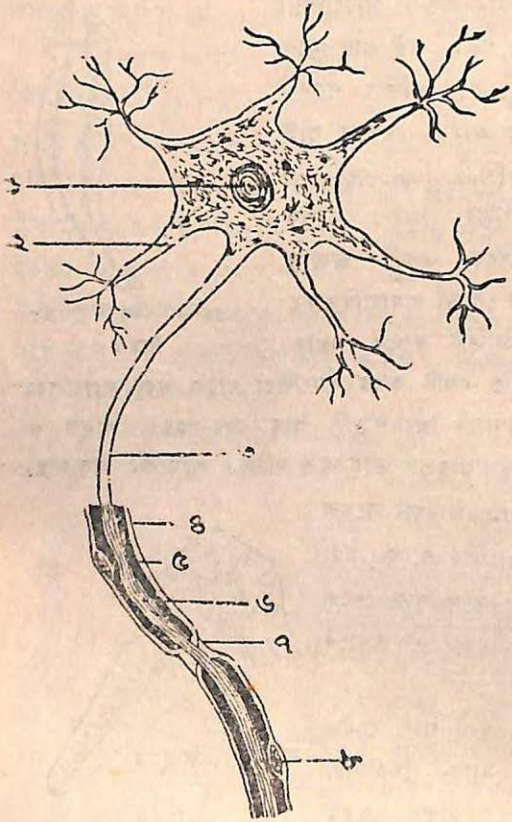
তারামাছের স্নায়ুতন্ত্র

চিত্র 4

মেরুদণ্ডী প্রাণী, যেমন—মাছ, ব্যাঙ, গিরগিটি, পাখি ও মানুষ—এদের স্নায়ুতন্ত্র একই ধরনের। তাই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র তিনভাবে ভাগ ক'রে বর্ণনা করা হয়; যথা—(i) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Central nervous system*), (ii) **পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র** (*Peripheral nervous system*), (iii) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Autonomic nervous system*)।

(i) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Central nervous system*) : **মস্তিষ্ক** ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (*Spinal Cord*)—এই দুটির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের সরু ও লম্বা পশ্চাৎ-অংশই সুষুম্নাকাণ্ড। একরকমের লাঠি দেখা যায়, যার মাথা মোটা আর গোল। মোটা আর গোল মাথাটাকে মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, আর লাঠির সরু শেষ অংশটা সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। করোটির

মধ্যে থাকে মস্তিষ্ক, আর সুষুম্নাকাণ্ড দেহের পৃষ্ঠদেশে **কশেরুকার** (*Vertebral Column*) ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকে। মস্তিষ্কের ভেতরটা ফাঁপা, আর এই ফাঁপা অংশ সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রসারিত। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না-কাণ্ডের ভিতরকার ফাঁপা অংশে একরকমের রস থাকে। এই রসের নাম **মস্তিষ্ক-সুষুম্না-রস** (*Cerebro-spinal fluid*)। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা অংশকে যে স্তর পরিবেষ্টিত ক'রে রাখে তা স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরি। স্নায়ুকোষকে **নিউরন** (*Neuron*) বলা হয়। নিউরনে অনেক শাখা-প্রশাখা থাকে। কোষ-গুলি দেখতে মাকড়সার জালের মতো। নিউরনের যে শাখাটি সোজা বের হয় এবং প্রশাখা-বিহীন হয়, সেই শাখাটিকে **অ্যাক্সন** (*Axon*) বলা হয়। অন্যান্য শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট শাখাগুলিকে ডেনড্রন (*Dendron*) বলে। স্নায়ুকোষ ও



চিত্র ৫—একটি স্নায়ুকোষসহ স্নায়ুরজ্জু দেখানো হচ্ছে।
১. নিউক্লিয়াস ; ২. ডেনড্রাইট ; ৩. অ্যাক্সন ;
৪. নিউরিলেমা ; ৫. মেডুলার আবরণ ; ৬. স্নায়ুসূত্রসমষ্টি ;
৭. র‍্যানিভারের পর্ব ; ৮. নিউরিলেমার নিউক্লিয়াস।

তার অ্যাক্সনের আবরণীকে **নিউরিলেমা** (*Neurilemma*) বলে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের দুটি স্তরকে **মেনিনজেস** (*Meninges*) বলে। ডেনড্রাইটের (*Dendrites*) ভেতর দিয়ে দেহ-অঞ্চল থেকে অনুভূতির স্রোত স্নায়ুকোষে পৌছায় এবং স্নায়ুকোষ থেকে অনুভূতির সংবাদ অ্যাক্সনের ভিতর দিয়ে দেহ-অঞ্চলে পৌছায়। অ্যাক্সনকেই স্নায়ুতন্তু (*Nerve fibre*) বলা হয়। স্নায়ুতন্তু শেষ হবার সময়ে অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম রোমের মতো শাখায় পরিণত হয়। এদের বলা হয়

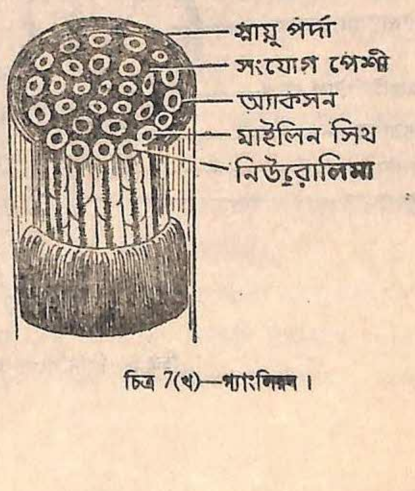
আরবোরিজেশান (*Arborization*)। এর অতি নিকটে দেখা যায় পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সূক্ষ্ম রোমের মতো শাখা। এদের মধ্যকার শূন্যস্থানকে **সাইনাপ্‌স** (*Synapse*) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে আরবোরিজেশানের সঙ্গে সাইনাপ্‌সের কোন সংযোগ থাকে না। মানুষের অনেক স্থানের স্নায়ুতন্তু বেশ লম্বা হয়, যেমন সুষুম্নাকাণ্ড থেকে স্নায়ুতন্তু বেরিয়ে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত লম্বা—এমন স্নায়ুতন্তু দেখা যায়। এই স্নায়ুতন্তু খুব দ্রুত বিদ্যুতের স্রোতের মতো অনুভূতি প্রবাহিত করে। এক গুচ্ছ ডেনড্রাইট্‌স বা অ্যাক্সন যদি লম্বা হয়ে আবরণীবিশিষ্ট হয়, তখন সেটিকে এক কথায় **স্নায়ু** (*Nerve*) বলা হয়। স্নায়ুর কোন অংশে (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড ছাড়া) কয়েকটি স্নায়ুকোষের শাখা-প্রশাখা গুচ্ছ হয়ে যদি ফুলে ওঠে তখন স্নায়ুর সেই স্থানকে **গ্যাংলিয়ন** (*Ganglion*)



চিত্র 6—একটি নিউরনের প্রকৃতি।



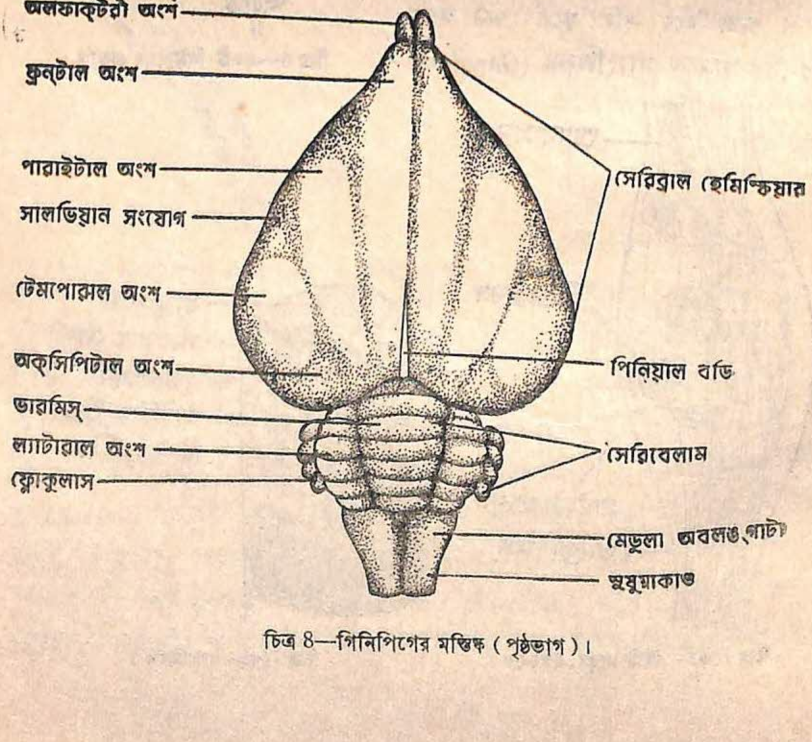
চিত্র 7(ক)—একটি স্নায়ুর প্রস্থচ্ছেদ।



চিত্র 7(খ)—গ্যাংলিয়ন।

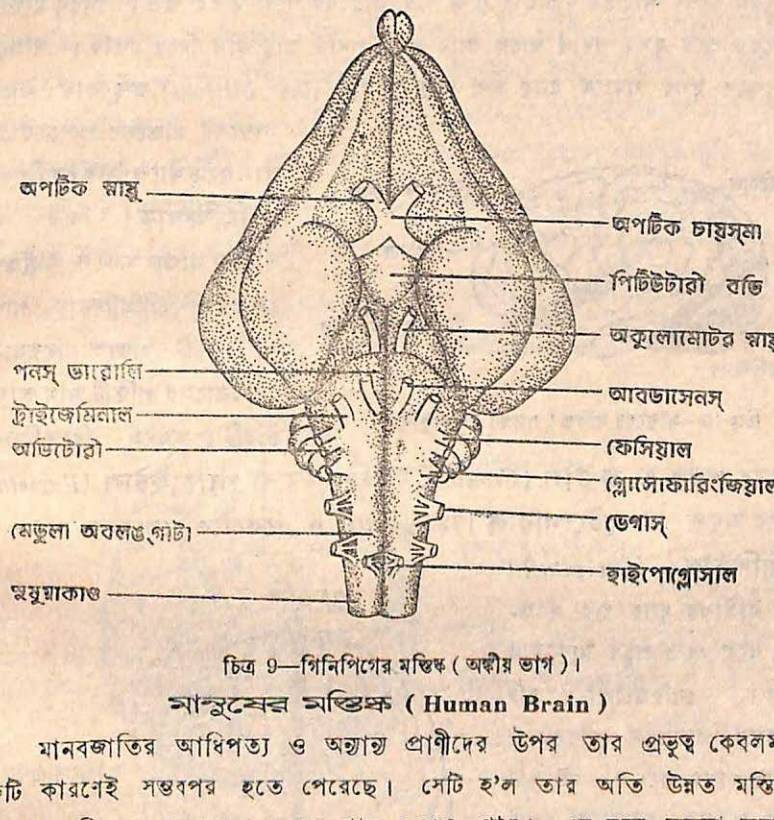
বলা হয়। অনেকগুলি নিউরন যখন একগুচ্ছ হয়ে কাজ করে, তখন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সেই স্থানকে **স্নায়ুকেন্দ্র** (*Nerve centre*) বলা হয়। মস্তিষ্কের দুটি স্তরের মধ্যে বাইরের যেটি অস্থি-সংলগ্ন স্তর, সেটি পুরু ও শক্ত। এটি ধূসর বর্ণের স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। এই স্তরটিকে **ধূসর-পদার্থ** (*Grey matter*) **স্তর** বলা হয়। দ্বিতীয় স্তরটি নরম ও পাতলা স্নায়ুতন্তু দিয়ে তৈরি। এটি ভেতরের স্তর, দেখতে সাদা, তাই এটিকে **শ্বেত-পদার্থ** (*White matter*) **স্তর** বলা হয়। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুব্যবস্থা অন্যরকম। এর গাত্র দুটি স্তরে গঠিত। ভেতরের স্তর স্নায়ুকোষবিশিষ্ট ধূসর পদার্থ দিয়ে ও বাইরের স্তরটি স্নায়ুতন্তু বা শ্বেত পদার্থ দিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড পর পর দুটি আবরণ দিয়ে পরিবেষ্টিত। বাইরের আবরণটি স্থূল এবং এর নাম **ডুরামেটার** (*Duramater*)। ভেতরের পাতলা আবরণীটিকে বলা হয় **পায়ামেটার** (*Piamater*)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক করোটির ভেতর আবদ্ধ। অগ্রভাগ হতে পশ্চাদ্‌ভাগ ধ'রে মস্তিষ্ককে তিনটি অঞ্চলে ভাগ ক'রে বর্ণনা করা হয়। প্রথম অঞ্চল বা অগ্রভাগ বা **অগ্রমস্তিষ্ক** (*Fore-brain*) আবার দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। দ্বিতীয়ভাগ বা **মধ্যমস্তিষ্ক**



চিত্র ৪—গিনিপিগের মস্তিষ্ক (পৃষ্ঠভাগ)।

(*Mid-brain*)—এটিও দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। তৃতীয় ভাগ বা **পশ্চাদ্‌মস্তিষ্ক** (*Hind-brain*)-এর একটি অঞ্চল।



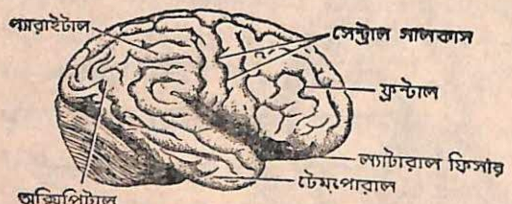
চিত্র 9—গিনিপিগের মস্তিষ্ক (অঙ্কীয় ভাগ)।

মানুষের মস্তিষ্ক (Human Brain)

মানবজাতির আধিপত্য ও অন্যান্য প্রাণীদের উপর তার প্রভুত্ব কেবলমাত্র একটি কারণেই সম্ভবপর হতে পেরেছে। সেটি হ'ল তার অতি উন্নত মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্কের গড়পড়তা ওজন প্রায় 1,350 গ্রাম। এর সঙ্গে তুলনা করলে, গোরিলার মস্তিষ্কের ওজন 430 গ্রাম ও কুকুরের প্রায় 150 গ্রাম। জন্ম থেকে চার বছর পর্যন্ত মানব-শিশুর মস্তিষ্ক তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। তারপর কুড়ি বছর পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বেড়ে পূর্ণতালাভ করে। কুড়ি বছরেই মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও ওজন সবচেয়ে বেশী হয়। বৃদ্ধবয়সে মস্তিষ্কের ওজন আবার কমতে থাকে। দেখা গেছে, বৃদ্ধবয়সে গড়ে মস্তিষ্কের 28 গ্রাম ওজন কমে যায়।

মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল তার বাইরের স্তরের ঢেউ-খেলানো ভাব। এর ফলে মস্তিষ্কের আয়তন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: একটা রুমাল টেবিলের উপর রেখে দু'পাশ থেকে ভাঁজ ক'রে দাও। দেখ,

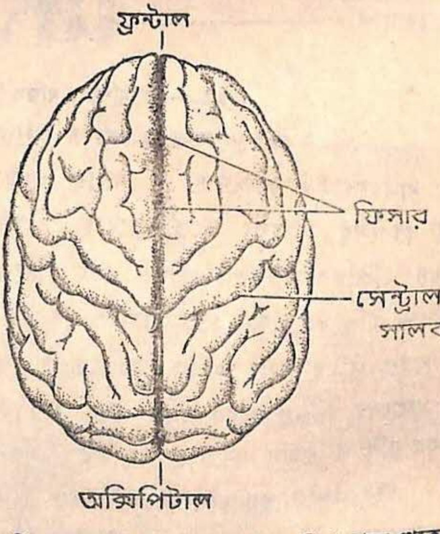
রুমালটি কতটুকু জায়গা দখল ক'রে রেখেছে। অথচ রুমালটির ভাঁজ খুলে দিলে দেখবে সেটি ভাঁজ-করা অবস্থা থেকে আরও বহুগুণ জায়গা বেশী দখল ক'রে নেয়। মস্তিষ্কের বাইরের স্তরের আয়তন যত বেশী বৃদ্ধি পায়, মানুষের পক্ষে ততই শুভ। কারণ মস্তিষ্কের বাইরের স্তরে ধূসর পদার্থ থাকে আর ধূসর পদার্থ স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরি। মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে ধূসর পদার্থে প্রায় **দশ শত কোটি** (*ten billions*) স্নায়ুকোষ আছে।



চিত্র 10—মানুষের মস্তিষ্ক (পার্শ্বের বহিরাকৃতি)।

মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে থাকে তার **সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার।** এটি অগ্র বা গুরু মস্তিষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার পাশা-পাশি দুটি অঞ্চলে বিদ্যমান। সেরিব্রালের প্রতিটি ভাগ আবার চারটি অঞ্চলে বিভেদিত—সামনের অঞ্চল বা **ফ্রন্টাল** (*Frontal*), মাঝের অঞ্চল বা **প্যারাইটাল** (*Parietal*), পাশের অঞ্চল বা **টেম্পোরাল** (*Temporal*), ও একেবারে পেছনের অঞ্চল বা **অক্সিপিটাল** (*Occipital*)।

এর বাইরের ধূসর স্তর ভাঁজ-করা, ফলে এতে প্রচুর স্নায়ুকোষ থাকে। সেরিব্রালের দুটি গোলার্ধে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় গহ্বর থাকে। এই দুটি গহ্বর আবার প্রত্যেকে একটি ক'রে সরু নালী দ্বারা তৃতীয় গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয় গহ্বরটি মস্তিষ্কের মধ্যভাগে থাকে। তৃতীয় গহ্বর আবার মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যকার চতুর্থ গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত।

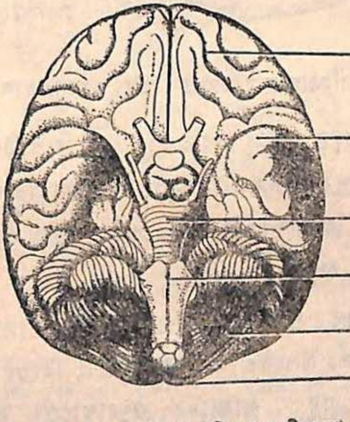


চিত্র 11—মানুষের মস্তিষ্কের বহিরাকৃতি (পেছন থেকে)।

মস্তিষ্কের চারপাশে বা মস্তিষ্ককে বেষ্টন ক'রে থাকে অসংখ্য রক্তজালক। গহ্বরের মধ্যে থাকে সেরিব্রোস্পাইনাল রস। মস্তিষ্কের প্রায় সমস্ত কাজই সেরিব্রাল নিয়ন্ত্রণ

করে। চেতনা, বোধশক্তি, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মনের জোর, আবেগ প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ ও প্রকাশের স্থান হ'ল সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। চোখের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও চামড়ার সংবেদনশীলতার জন্য স্নায়ুকেন্দ্র এই সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে দেখা যায়। ঐচ্ছিক পেশীর কাজও এই অঞ্চল থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসি-কান্না, শোক-ভোগ, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বুদ্ধি, চেতনা, স্মৃতি, উত্তেজনা ইত্যাদি মনের ভাবগুলি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারই করে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার-এর সামনের দিকে দেখা যায় **ঘ্রাণকেন্দ্র অঞ্চল** বা **অপটিক লব** অঞ্চল। এই অঞ্চলের দ্বারা চোখের দৃষ্টি ফুটে ওঠে। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের শেষ প্রান্তে একটি বিশেষ গোলাকার গ্রন্থি দেখা যায়। এটি **পিট্যুইটারী বডি**। এটির নিঃসৃত রসে দেহের বৃদ্ধি হয় এবং দেহ পুষ্টতা লাভ করে।

মানুষের **সেরিবেলাম** (*Cerebellum*) অন্যান্য প্রাণীদের সেরিবেলামের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত। দেহের ভারসাম্যতা, আকৃতি ও ঐচ্ছিক পেশীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন



চিত্র 12—মানুষের মস্তিষ্ক (অঙ্কীয়দেশ থেকে বহিরাকৃতি)।

করানো সেরিবেলামের দায়িত্ব। হাত ঘুরিয়ে কাজ করা, হাত তোলা ও ওঠানো, হাঁটা-চলা, কথা-বলা, মুখের ভেতরে জিভ-নাড়ানো প্রভৃতি কাজগুলি ঐচ্ছিক পেশীর সাহায্যে সেরিবেলামই সম্পন্ন করে। সেরিবেলামের নিচে স্নায়ুতন্তু-সমন্বিত একটি ফিতার মতো অঞ্চল দেখা যায়। এটিকে **পন্‌স ভেরোলি** বলা হয়। এটি দেহের প্রাথমিক কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। **মেডুলা অবলঙ্গাটা** দেহের সব রকমের শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করে ; যেমন—হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ, রক্ত-সরবরাহ, রক্তের চাপ, শ্বসনের গতি ও হার, পৌষ্টিক নালীর ভেতর

খাদ্যমণ্ডের গতি, পৌষ্টিক গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, চামড়ার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (*Reflex action*), বমি-করা, হাঁচি ও নাক-সুড়সুড়-করা কাজগুলিও মেডুলা নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায়, মানুষের শরীরের অধিকাংশ বিপাকীয় কাজ ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা মেডুলার কাজ। করোটির মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে। কিন্তু করোটির বহু ছিদ্রপথে মস্তিষ্কের বিবিধ অংশ হতে **করোটি স্নায়ু**

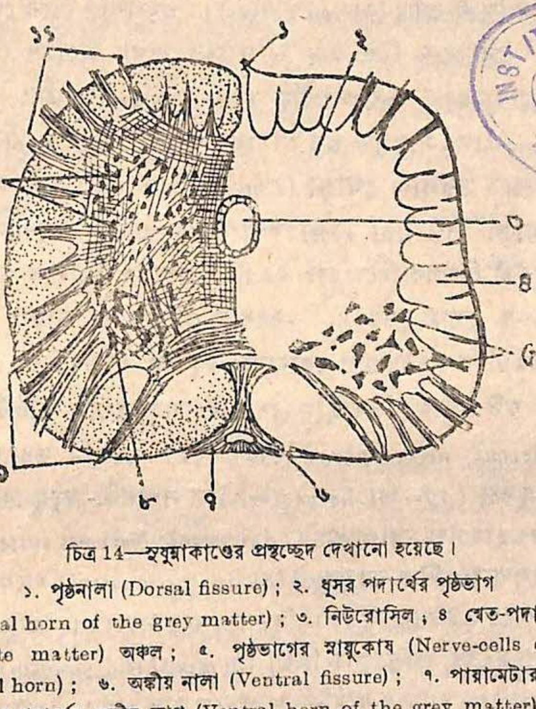


চিত্র 13—মানুষের মস্তিষ্ক : সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের বিবিধ অঞ্চলের কাজ।

(*Cranial nerve*) নামে **বারো-জোড়া স্নায়ু** বের হয়। এরা করোটির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। মেডুলা অবলঙ্গাটার পরবর্তী অঞ্চল সুষুম্নাকাণ্ডের (*Spinal cord*) মূল। সুষুম্নাকাণ্ডটি মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানুষের ককৃশিস কশেরুকায় শেষ হয়।

সুষুম্নাকাণ্ড (*Spinal cord*) : দুটি সরু নলকে যদি লম্বালম্বিভাবে জুড়ে দেওয়া যায়, তা হলে জোড়া-দুটি নলের উপরের দিকে একটি এবং নিচের দিকে একটি গভীর খাঁজ (*Deep notch*) দেখা যায়। আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডের আকারও ঠিক সেইরকম। দুটি গোলাকার স্নায়ু জুড়েই সুষুম্নাকাণ্ডের সৃষ্টি। সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা ও অঙ্কীয়-মধ্যরেখার স্থানে তাই যথাক্রমে দুটি গভীর খাঁজ দেখা যায়। পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় অবস্থিত খাঁজকে বলা হয় **ডরসাল ফিসার** (*Dorsal fissure*) এবং অঙ্কীয়-মধ্যরেখা স্থানে অবস্থিত খাঁজকে বলা হয় **ভেণ্ট্রাল ফিসার** (*Ventral fissure*)। সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যস্থিত গহ্বরকে **সেণ্ট্রাল ক্যানাল** (*Central Canal*) বা **নিউরোসিল** (*Neurocoel*) বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের শেষাগ্র মেরুদণ্ডের ককেশিস হাড়ের ভেতর শেষ হয়ে যায়। মস্তিষ্কের ভেতরের সেরিব্রো-স্পাইনাল রস সুষুম্নাকাণ্ডের সেণ্ট্রাল ক্যানালের ভেতরেও পূর্ণ থাকে। নিউরোসিলের ভেতরের

দিকের স্তর নিউরন বা স্নায়ুকোষ দিয়ে তৈরি হওয়ায় দেখতে ধূসর, তাই একে **ধূসর-বস্তু** (*Grey matter*) **স্তর** বলা হয়। নিউরোসিলের বাইরের দিকের স্তর স্নায়ুতন্তু দিয়ে গড়া, তাই দেখতে সাদা। একে **শ্বেত-বস্তু** (*White matter*) **স্তর** বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক ও দেহের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে স্নায়ুর দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করে। ত্বক্ ও পেশী হতে মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক হতে ঐসব স্থানে স্নায়ুর সাহায্যে নির্দেশ চলাচলে সাহায্য করে।



চিত্র 14—সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে।

১. পৃষ্ঠনালা (Dorsal fissure) ; ২. ধূসর পদার্থের পৃষ্ঠভাগ (Dorsal horn of the grey matter) ; ৩. নিউরোসিল ; ৪ শ্বেত-পদার্থ (White matter) অঞ্চল ; ৫. পৃষ্ঠভাগের স্নায়ুকোষ (Nerve-cells of dorsal horn) ; ৬. অঙ্কীয় নালা (Ventral fissure) ; ৭. পায়ামেটার ; ৮. ধূসর পদার্থের অঙ্কীয় ভাগ (Ventral horn of the grey matter) ; ৯. সুষুম্নাকাণ্ডের অঙ্কীয় মূল হতে তন্তুর সৃষ্টি ; ১০. স্নায়ুকোষ ; ১১. সুষুম্নাকাণ্ডের পৃষ্ঠদেশের মূল হতে তন্তুর সৃষ্টি।

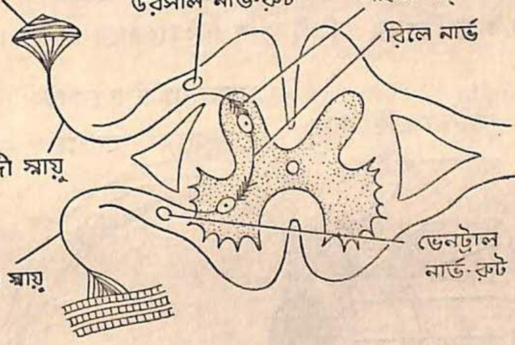
(ii) **পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র** (*Pheripheral Nervous system*) : মস্তিষ্ক হতে করোটি এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বের-হওয়া 'সুষুম্না স্নায়ু' (*Spinal Nerves*)-এর সমন্বয়ে পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। করোটি-স্নায়ুর বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্নায়ু কতকগুলি **স্নায়ুতন্তু** (*Nerve fibres*) দিয়ে গড়া। পার্শ্বস্থ স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতন্তুগুলির প্রকৃতি এই রকমের। কতকগুলি স্নায়ুতন্তু দেহের বিভিন্ন **জ্ঞানেন্দ্রিয়**

(*Sense organs*) হতে অনুভূতি বহন ক'রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে দেয়। এই ধরনের স্নায়ুকে **অন্তর্বাহী** বা **সংবেদী স্নায়ু** (*Afferent or Sensory nerves*) বলা হয়। আর এক রকমের স্নায়ুতন্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হতে নির্দেশ বহন ক'রে দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে দেয় ও সেই নির্দেশ অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কাজ করে। এই ধরনের স্নায়ুকে **বহির্বাহী** বা **চেষ্টীয় স্নায়ু** (*Efferent or Motor nerves*) বলা হয়। উপরোক্ত দুই প্রকৃতির স্নায়ুতন্তু দিয়ে গড়া স্নায়ু দুই রকমেরই কাজ করে; এদেরকে বলা হয় **মিশ্র স্নায়ু** (*Mixed nerves*)। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে-সমস্ত স্নায়ু বের হয়েছে সেগুলি প্রকৃতিতে মিশ্র স্নায়ু ও তাদের সংখ্যা একত্রিশ জোড়া। প্রতিটি সুষুম্নাস্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের **পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয়** (*Dorso-lateral*) এবং **অঙ্কীয়-পার্শ্বীয়** (*Ventro-lateral*) তলের সঙ্গে যুক্ত দুটি আলাদা-আলাদা গোড়া (Root) থেকে বের হয়। পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয় গোড়াকে **ডরসাল গোড়া** (*Dorsal root*) এবং অঙ্কীয়-পার্শ্বীয় গোড়াকে **ভেন্ট্রাল গোড়া** (*Ventral root*) বলা হয়। প্রতিটি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু-দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ দিয়ে বের হয়। ছিদ্রপথের চারদিকে চুনের গুঁড়ো জমা থাকায় এর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। ডরসাল গোড়ায় বা গোড়ার উৎপত্তির কাছে অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তুগুলির অনেকগুলি কোষদেহ একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থেকে **ডরসাল গ্যাংলিয়নের** সৃষ্টি করে। ভেন্ট্রাল গোড়ায় স্নায়ুতন্তুগুলি **বহির্বাহী** বা **চেষ্টীয় স্নায়ুতন্তু** (*Efferent nerve fibres*) বের করে। তেমনি ডরসাল গোড়া হতে **অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্তু** (*Afferent nerve fibres*) বা **সংবেদী-স্নায়ু** বের করে।

(iii) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (*Autonomic Nervous system*) **:** সাধারণতঃ খুব সরু দুটি **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জু** (*Sympathetic trunk*) থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের দু'পাশে একটি ক'রে এই স্নায়ুরজ্জু লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জুতে অনেকগুলি **স্নায়ু গ্যাংলিয়া** (*Sympathetic ganglia*) থাকে। প্রতিটি গ্যাংলিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের র‍্যামাস কমিউনিকান্‌স-এর সঙ্গে যুক্ত। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুরজ্জু হতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা-স্নায়ু বের হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও যন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর ভেতর প্রবেশ করে। হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীবহুল গাত্রে, রক্ত-সংবহন নালীর পেশীতে এবং পৌষ্টিক নালীর পেশীতেও এরা একাধিক শাখায় প্রবেশ করে। যন্ত্রের ভেতর বা পেশীর ভেতর ঢোকার আগে পরস্পর মিলিত হয়ে জালক তৈরি ক'রে নেয়,; একে **স্নায়ুজাল** (*Nerve-plexus*) বলে। হৃদ্‌যন্ত্রে **কার্ডিয়েক স্নায়ুজাল** (*Cardiac plexus*), অরিকিউলার প্রাচীরের **বিডার্স স্নায়ুজাল** (*Bider's plexus*), সাইনাস ভেনোসাসের **রিম্যাক স্নায়ুজাল** (*Remak plexus*) প্রভৃতি স্নায়ুজাল মানব-দেহে দেখা

যায়। এই স্নায়ুজাল থেকে বের-হওয়া স্নায়ু পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদিতে স্নায়ুতন্তু সরবরাহ করে। উপরোক্ত জালগুলি গ্রন্থির মতো দেখায় ব'লে এদের গ্রন্থিত বলা হয়। দেহের ভেতর হতে উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং তা নিয়ন্ত্রণ করাই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ।

প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (*Reflex action*) : ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক যখন বিশ্রাম নেয়, তখন সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুগুলি জীবের স্নায়বিক ক্রিয়া পরিচালনা করে। ঘুমন্ত অবস্থায় মশা কামড়ালে মানুষ সেই অবস্থায়ই কামড়ানো স্থানে হাত বুলোয়। মশা কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের ত্বকের সংবেদী-স্নায়ু কামড়ানোর উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের ডরসাল গোড়ায় উত্তেজনার সংবাদটি পৌঁছে দেয়। এই সংবাদটি সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুর সাইনাপ্‌সের মাধ্যমে রিলে স্নায়ুর সাহায্যে ভেণ্ট্রাল গোড়ায় পৌঁছায়। সেখান থেকে সংবাদটি চেষ্টীয় স্নায়ুর মাধ্যমে হাতের পেশীতে মশা



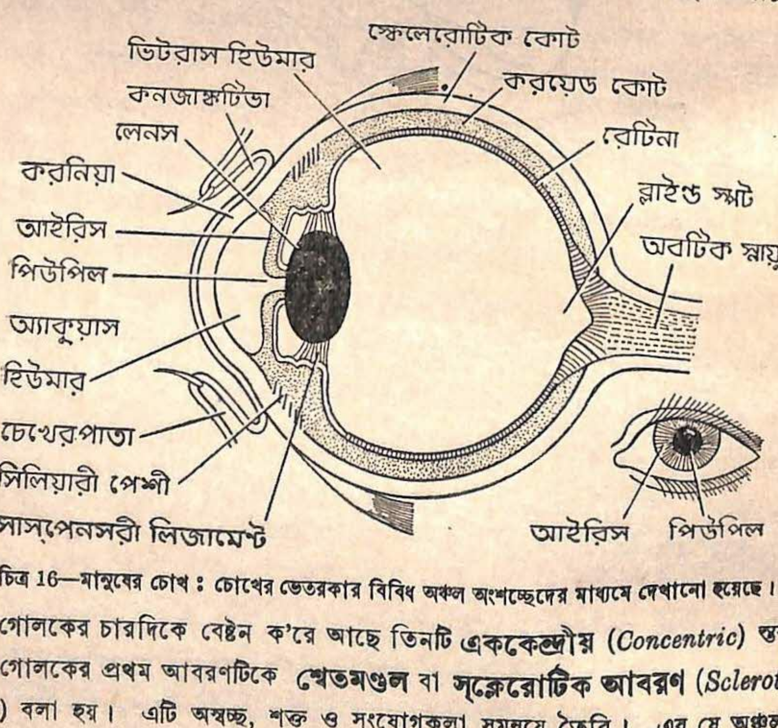
চিত্র 15—প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া।

কামড়ানো-জনিত সংবাদ গিয়ে পৌঁছায়। তখন মানুষ হাত তুলে মশা-কামড়ানো স্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় আঘাত করে। মস্তিষ্ককে বাদ দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহণকে বলা হয় **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (*Reflex action*)। যে নিয়ন্ত্রিত পথে এটি কার্যকরী হয়, তাকে বলা হয় **প্রতিক্ষিপ্ত বৃত্তচাপ** (*Reflex arc*)। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া **শর্ত-নিরপেক্ষ** এবং **শর্ত-সাপেক্ষ**—এই দুই প্রকারের হতে পারে। চোখে ধুলো-বালি পড়লে চোখ আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাওয়া, আগুন হতে হাত সরিয়ে নেওয়া— এইগুলিকে **শর্ত-নিরপেক্ষ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (*Unconditional reflex action*) বলা হয়। অভ্যাসবশতঃ হাত বা পা নাড়া, বিশেষ কোন অভ্যাস, সময়মতো খাওয়া ও ঘুমানো— এইগুলিকে **শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া** (*Conditional reflex action*) বলা হয়।

জাগ্রত অবস্থায় জীবের ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হয়। মস্তিষ্ক তখন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার উপর খবরদারি করে। অঙ্গের উত্তেজনা সংবেদী-স্নায়ুর সাহায্যে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছায়। সুষুম্নাকাণ্ড সংবাদটি সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক তখন স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে নির্দেশ পাঠায় এবং সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্কের নির্দেশমতো বিবিধ পেশীকে তার স্নায়ুর সাহায্যে কাজ করতে উদ্দীপিত করে। আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি বা জিভে স্বাদ পাই—এইগুলি কেবলমাত্র উত্তেজনা-গ্রহণকারী অঙ্গ মাত্র। এদের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলি ও মস্তিষ্ক আমাদের চোখের দৃষ্টি দেয়, কানের যন্ত্রকে শোনার উপযুক্ত করে বা জিভের স্বাদ গ্রহণের শক্তি এনে দেয়।

বোধেন্দ্রিয় (Sense Organs)

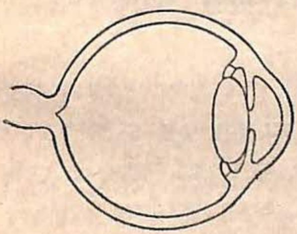
1. **চোখ** (*Eye*)**:** চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক্ বা চামড়া সাধারণতঃ বোধেন্দ্রিয় হিসেবে গণ্য করা হয়। **মানুষের** চোখ তার নানারকমের বোধেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি এবং এটি বেশ জটিল। চোখের লম্বালম্বিভাবে ছেদের ছবিতে (*Longitudinal section*) তার **অন্তর্গঠনের** প্রতিটি অংশ পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। মানুষের



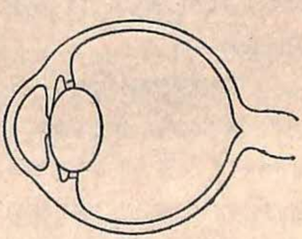
চিত্র 16—মানুষের চোখ : চোখের ভেতরকার বিবিধ অঞ্চল অংশচ্ছেদের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

নেত্র-গোলকের চারদিকে বেষ্টন ক'রে আছে তিনটি **এককেন্দ্রীয়** (*Concentric*) স্তর। নেত্র-গোলকের প্রথম আবরণটিকে **শ্বেতমণ্ডল** বা **স্ক্লেরোটিক আবরণ** (*Sclerotic Coat*) বলা হয়। এটি অস্বচ্ছ, শক্ত ও সংযোগকলা সমন্বয়ে তৈরি। এর যে **অঞ্চলটি**

নেত্র-গোলকের ভেতর থাকে, সেটিকে বলা হয় **স্‌ক্লেরা** (*Sclera*), আর যেটি নেত্র-গোলকের সামনে থাকে, অর্থাৎ চোখের সাদা অংশকে অচ্ছোদপটল বা **করনিয়া** (*Cornea*) বলা হয়। করনিয়া স্বচ্ছ এবং এর ভেতর দিয়ে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করতে পারে। দ্বিতীয় আবরণটি বা মধ্যাবরণটিকে কৃষ্ণমণ্ডল বা **করয়েড আবরণ** (*Choroid Coat*) বলা হয়। স্‌ক্লেরোটিক আবরণের ভেতরে এটি থাকে এবং এটি খুব সূক্ষ্ম ও কালো রঙের **রঞ্জক** (*Pigment*) দিয়ে ভরা। এর ভেতরে প্রচুর সংখ্যায় রক্তবাহী নালী ও স্নায়ুর সূক্ষ্ম শাখা প্রবেশ ক'রে এটিকে পরিবেষ্টিত ক'রে রাখে। কালো রঞ্জন-পদার্থে পূর্ণ থাকায় এর ভেতর দিয়ে আলোক-রশ্মি ঢুকতে পারে না। ফলে, করনিয়ার ভেতর দিয়ে কেবল আলোক-রশ্মি ঢুকতে পারে। করয়েড আবরণ স্‌ক্লেরা ও করনিয়ার সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রসারিত হবার পরে, নিচের দিকে নেমে লেন্‌সের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। লেন্‌সের উপরের এই কালো গোলাকার পর্দা যেটি আমরা বাইরে থেকেও দেখতে পাই, সেটিকে **কনীনিকা** বা **আইরিস** (*Iris*) বলা হয়। এর মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, একে **তারারন্ধ্র** বা **পিউপিল** (*Pupil*) বলে। এর ব্যাস 2—8 মিলিমিটার। কনীনিকার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে তারারন্ধ্রের ছিদ্রটি ব্যাসে ছোট বা বড় হয়। এর ফলে তারারন্ধ্রের ভেতর কতটা আলোক-রশ্মি প্রবেশ করতে পারে তা প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রিত হয়। চোখের তৃতীয় আবরণ বা নেত্র-গোলকের শেষ আবরণকে **অক্ষিপট** বা **রেটিনা** (*Retina*) বলা হয়। এটি সংবেদনশীল স্নায়ুপূর্ণ আবরণ। অপটিক স্নায়ু নেত্র-গোলকের পেছন থেকে প্রবেশ ক'রে পাতলা আবরণে পরিণত হয়ে রেটিনা তৈরি করে এবং অক্ষিপট বা রেটিনাকে আলোক-



চিত্র 17(ক)—দূরের বস্তু দেখার সময়ে চোখের লেন্‌সের অবস্থা।



চিত্র 17(খ)—কাছের বস্তু দেখার সময়ে চোখের লেন্‌সের অবস্থা।

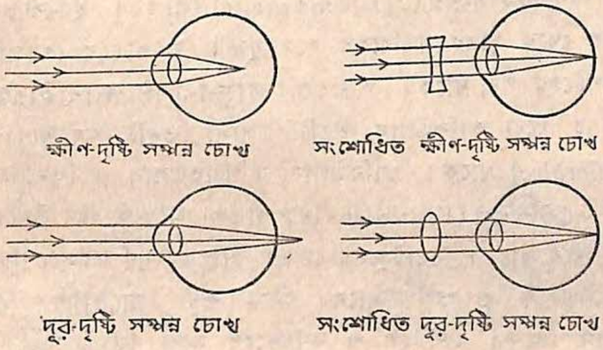
সংবেদ ক'রে তোলে। রেটিনায় দুই রকমের কোষ দেখা যায়। প্রথমপ্রকার কোষগুলি পাতলা নলের মতো এবং মানুষের চোখে প্রায় একশো কুড়ি কোটি এই

ধরনের কোষ থাকে। এদের **রড-কোষ** (*Rod cell*) বলা হয়। কোষগুলি লম্বভাবে থাকে ও প্রতিটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত। রড-কোষের ভেতর **রোডপ্‌সিন** (*Rhodopsin*) নামে একপ্রকার রাসায়নিক রঞ্জক-পদার্থ থাকে। রোডপ্‌সিনে ক্যারোটিন-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ও তার মধ্যে **ভিটামিন-এ** থাকে। তাই ভিটামিন-এ অভাবে রাত-কানা রোগ হয়। রড-কোষগুলি মৃদু আলোক ও বর্ণ-সংবেদী। দ্বিতীয় প্রকার কোষ, যেগুলি রেটিনার মধ্যে থাকে, তাকে **কোন্‌-কোষ** (*Cone-cell*) বলা হয়। এগুলি ক্ষুদ্র ও গোলাকার। এরাও স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত। কোন্‌-কোষগুলি উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ-সংবেদী। মানুষের চোখের রেটিনায় প্রায় সাত কোটি কোন্‌-কোষ থাকে। অপটিক স্নায়ু রেটিনার যে স্থানে প্রবেশ করছে, সেখানে রেটিনার কোন রড বা কোষ নেই। ফলে, এই স্থানে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। তাই এই স্থানের নাম **অন্ধকেন্দ্র** বা **ব্লাইণ্ড-স্পট** (*Blind-spot*)। ব্লাইণ্ড-স্পটের দু'পাশের রেটিনার মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় রড ও কোন্‌-কোষ থাকায়, এই অঞ্চলে বস্তুর চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং সেইজন্য এই অঞ্চলকে **সংবেদ-কেন্দ্র** (*Sensitive spot* or *Yellow spot*) বলে। মানুষের চোখের লেন্‌সটি দ্বি-উত্তল ও স্বচ্ছ। এটি করয়েডের সঙ্গে সূক্ষ্ম পেশীয় **আবদ্ধ-তন্তুর** (*Suspensory ligament*) দ্বারা যুক্ত। করনিয়া ও লেন্‌সের মধ্যে একটি অঞ্চল দেখা যায় এবং একে চোখের **অগ্রকক্ষ** (*Anterior Chamber*) বলা হয়। অগ্রকক্ষ নির্মল জলের মতো তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে; একে **জলীয় পদার্থ** (*Aqueous Humor*) বলা হয়। লেন্‌সের পেছনে ও রেটিনার সামনে একটি আঠালো, জেলীর মতো পদার্থ-পূর্ণ গহ্বর থাকে এবং এর নাম **সান্দ্র পদার্থ** (*Vitreous Humor*)।

উপযোজন ক্রিয়া (*Accommodation*) : কাছের বস্তু দেখার সময় চক্ষুগোলকের সিলিয়ারী পেশীর সংকোচনে চোখের তারারন্ধ্র ছোট হয়ে যায় এবং লেন্সে স্থূলত্ব বা উত্তলভাব বেশী হয়। দূরের বস্তু দেখার সময়ে চক্ষুগোলকের সিলিয়ারী পেশীর প্রসারণের ফলে চোখের তারারন্ধ্র বড় হয়ে যায় এবং লেন্সের উত্তলভাব কমে যায়। এই প্রণালীকে চোখের **উপযোজন ক্রিয়া** বলা হয়।

ক্ষীণদৃষ্টি (*Myopia* or *short sight*) : যখন দেখার কোন বস্তু হতে আলোক-রশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে অক্ষিপটের সামনে বা আগে দৃষ্টিকোণ তৈরি করে, তখন লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব বেশী হয়ে যায়। এই অবস্থাগত চোখকে **ক্ষীণদৃষ্টি** বলে। এর ফলে দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি

একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে, তা হলে দৃষ্টিকোণ অক্ষিপটের উপর পড়ে, তখন দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখা যায়।



চিত্র 18

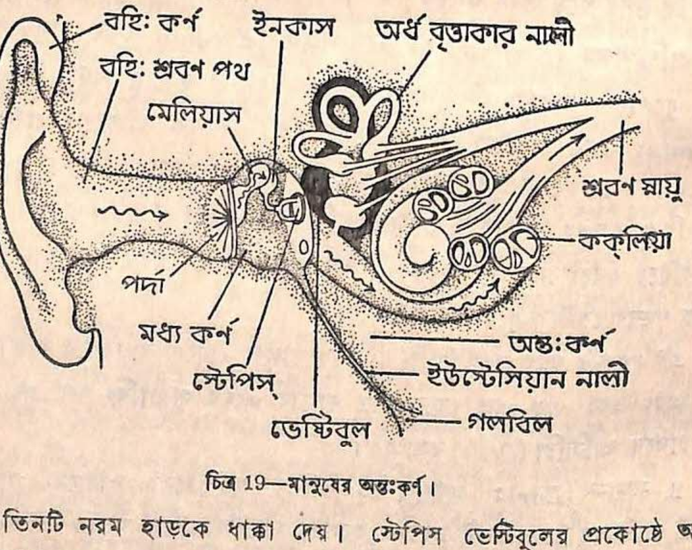
দীর্ঘদৃষ্টি (*Long sight*) : চোখের লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব কম হয়ে গেলে দেখা জিনিসের প্রতিচ্ছবি তখন অক্ষিপটের পেছনে দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে। এর ফলে কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয়। চোখের এই অবস্থাকে **দীর্ঘদৃষ্টি** বলা হয়। বৃদ্ধ বয়সে চোখের অবস্থা এই ধরনের হয়। যখন উত্তল লেন্সের চশমা-ব্যবহারে দৃষ্টিকোণ অক্ষিপটের উপর পড়ে তখন কাছের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়।

অক্ষিপক্ষ্ম (*Eye-lash*) ও **নেত্র-পল্লব** (*Eye-lids*) নেত্র-গোলককে জোর আলো, ধুলো ও বাতাস থেকে রক্ষা করে। চোখের **তৃতীয় পর্দা** (*Nictitating membrane*) নেত্র-গোলকের কোণে দেখা যায়। অনেক সরীসৃপের চোখের পর্দা স্বচ্ছ হয়ে নেত্র-গোলকের উপর আটকে থাকে। বাইরের কোণের দিকে নেত্র-গোলকের উপরে, কিন্তু চোখের পাতার নিচে **অশ্রুগ্রন্থি** (*Lacrimal glands*) থাকে। এ-থেকে অশ্রু বেরিয়ে সর্বদা নেত্র-গোলককে ভিজিয়ে রাখে ও বাইরের থেকে কোন কিছু নেত্র-গোলকে পড়লে সেটিকে ধুয়ে বের ক'রে দেয়।

এই ধরনের সরল চোখ চিংড়ি বা আরশোলার চোখে লম্বাকারে হাজার হাজার থাকে এবং এরা এক এক গুচ্ছ একত্র থাকায় এদের **পুঞ্জাক্ষি** বলা হয়। প্রতিটি সরল চোখকে **অসিলি** (*Ocili*) বলা হয়।

2. **কান** (*Ear*) : **মানুষ**-এর কানের অন্তর্গঠনের কাঠামো প্রায় অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো একই রকমের হলেও, যন্ত্রগুলির সঙ্গে অনেক প্রভেদ রয়েছে। মানুষের কানের বহিঃকর্ণ অংশটি বেশ বড়। এটি শব্দ-স্রোত সংগ্রহ করতে সাহায্য

করে। গোরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা এটিকে শব্দ-স্রোত অনুযায়ী ঘোরাতে পারে। এর দ্বারা শব্দ-স্রোত সংগ্রহে সুবিধা হয়। মধ্যকর্ণের ভেতর যে নলের মতো গহ্বর থাকে তাকে **কর্ণপটহ-গহ্বর** (*Tympanic cavity*) বলা হয়। ইউস্টেচিয়ান নালীটি কর্ণপটহ-গহ্বর থেকে মুখের গলবিলের সঙ্গে যুক্ত। কর্ণপটহের শেষপ্রান্তে কানের পর্দা বা কর্ণপটহের পর্দা থাকে। অন্তঃকর্ণের **হাড়-বিশিষ্ট ল্যাবাইরিন্থ** (*Osseous labyrinth*)-এর মধ্যে স্যাকিউলাস, ইউট্রিকিউলাস, তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী ও **কক্লিয়া** (*Cochlea*) থাকে। স্যাকিউলাস, ইউট্রিকিউলাস ও তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালীকে একটি **ভেস্টিবুল** (*Vestibule*) নামক পাতলা অস্থি-আবরণ উপরোক্ত তিনটি যন্ত্রকে ঢাকা দিয়ে রাখে। ভেস্টিবুলের ভেতর স্নায়ুকোষপূর্ণ তরল পেরিলিম্ফ থাকে এবং ইউট্রিকিউলাস ও স্যাকিউলাসের নিম্নে প্রচুর **অটোলিথ** (*Otolith*)-সহ শ্রবণী-স্নায়ুরোম থাকে। ভেস্টিবুল ও কর্ণপটহের মধ্যে তিনটি সরু, নরম হাড় পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকে। কর্ণপটহের সঙ্গে যুক্ত প্রথম হাড়টির নাম **মেলিয়াস** (*Malleus*)। মেলিয়াস আবার যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় হাড়ের সঙ্গে, যার নাম **ইন্‌কাস** (*Incus*)। ইন্‌কাস আবার যুক্ত হয়েছে তৃতীয় হাড়ের সঙ্গে, যার নাম **স্টেপিস** (*Stapes*)। স্টেপিসের শেষাগ্র ভেস্টিবুলের প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত। শব্দ-স্রোত মধ্য-কর্ণের ভেতর দিয়ে এসে কর্ণপটহে ধাক্কা দেয়। কর্ণপটহ সেই ধাক্কায় উত্তেজিত হয়ে



চিত্র 19—মানুষের অন্তঃকর্ণ।

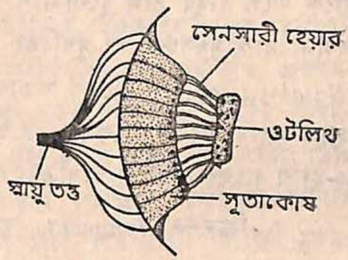
উপরোক্ত তিনটি নরম হাড়কে ধাক্কা দেয়। স্টেপিস ভেস্টিবুলের প্রকোষ্ঠে আঘাত দেওয়ায় পেরিলিম্ফ ও এন্ডোলিম্ফ এই দুটি স্নায়ুকোষপূর্ণ তরল পদার্থ শব্দের সঙ্গে

তরঙ্গাহত হয়ে ইউট্রিকিউলাস, স্যাকিউলাস ও তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালীতে শব্দের ইঙ্গিত পাঠিয়ে দেয়। উপরোক্ত তিনটি যন্ত্রের মধ্যে স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুরোম থাকায় সেগুলি শব্দের ইঙ্গিতকে বাড়িয়ে তোলে এবং শ্রবণী-স্নায়ুর সাহায্যে **ককলিয়া** (*Cochlea*) নামক শেষ শ্রবণ-যন্ত্রে শব্দের স্রোতকে পাঠিয়ে দেয়। ককলিয়া একটি আড়াই প্যাঁচের নালী। এই নালীর মধ্যে **অরগ্যান অফ করটি** (*Organ of Corti*) নামে স্নায়ুযন্ত্র থাকে।



মানুষের ভারসাম্য অঙ্গ ও ইহার বিবিধ অঙ্গ

চিত্র 20(ক)



মানুষের কানের অভ্যন্তর

চিত্র 20(খ)

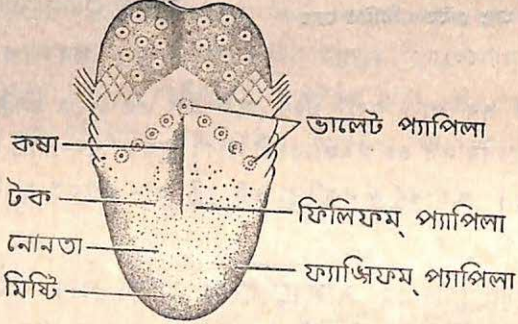
ককলিয়ার বর্ধিত শব্দ-স্রোত করটি গ্রহণ করে এবং এর থেকে শ্রবণী-স্নায়ু বের হয়ে সোজা মস্তিষ্কে গিয়ে মিলিত হয় অলফ্যাক্টরী লবের সঙ্গে। শব্দ-স্রোত মস্তিষ্কে পৌঁছালে মানুষ শুনতে পায়। অন্তঃকর্ণ ও ককলিয়া এই দুটি অংশ থেকেই শ্রবণী-স্নায়ু মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়।

3. **চামড়া** (*Skin*)**: মানবদেহ**-এর চামড়া তার দেহের ভেতরকার পেশীগুলিকে আঘাত হতে ও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ হতে রক্ষা করে। অসংখ্য সংবেদনশীল স্নায়ুর সূক্ষ্ম অংশ চামড়ার সর্বত্র ছড়ানো। দেহের প্রতিটি অঙ্গের চামড়ায় স্নায়ু-প্যাপিলা থাকে, তাই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে দেহ স্পর্শের ইঙ্গিত বুঝতে পারে। মানুষের **চামড়ার মধ্যস্তরে** (*Papillary layer*) রয়েছে রঞ্জন-পদার্থ, এর জন্যই মানবদেহের চামড়ার রঙ কালো, ফরসা বা পীত দেখায়। সবচেয়ে নিচের স্তরে বা **অন্তস্ত্বকের** (*Dermis*) মধ্যে রয়েছে ধমনী ও শিরার সূক্ষ্ম জালক, নার্ভ বা স্নায়ুর শেষাগ্র, তৈলগ্রন্থি, লোমগ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি ইত্যাদি। এই স্তরের দেহের উদ্বৃত্ত চর্বি সঞ্চিত থাকে। ত্বকে যে-সব নার্ভ আছে তাদের সাহায্যে স্পর্শ, চাপ, তাপ ও ব্যথার অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায়। চুল বা লোমে নার্ভ থাকে না, তাই চুল কাটলে ব্যথা লাগে না। ভয়ে বা আনন্দে চুল বা লোমের গোড়ার পেশী সংকুচিত হয় ব'লে রোমাঞ্চ হয়। ত্বকের ঘর্মগ্রন্থিতে ঘাম উৎপন্ন হয়ে ঘর্মনালী

দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘামের সঙ্গে দেহের অতিরিক্ত জল এবং দূষিত পদার্থ দেহের বাইরে যায়। ঘাম হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল দেহের তাপসাম্য বজায় রাখা।

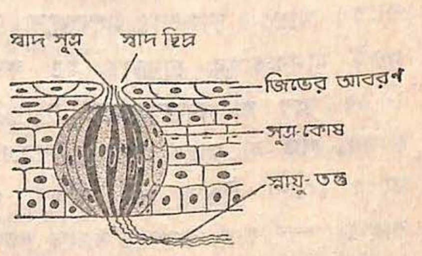
4. **নাক** (*Nose*): **মানুষ**-এর নাকের ডগার দিকটা তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি এবং একটি দেওয়াল দিয়ে ছুটি কোটরে ভাগ করা রয়েছে। নাকের গহ্বর-ছুটিকে **নাসারন্ধ্র** (*Nostril* or *Nasal cavity*) বলা হয়। এর গায়ে অনেক স্নায়ুযুক্ত লোম থাকে ব'লে বায়ুর সঙ্গে ধুলোবালি বা অন্য কোন ময়লা ফুস্‌ফুসে যেতে পারে না। এখান থেকে মুখগহ্বর বা মুখবিবর পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিকোণ গহ্বরের নাম **নাসাপথ** (*Nasal passage*)। নাকের অভ্যন্তর ভাগ শ্লেষ্মা-ঝিল্লি দিয়ে ঢাকা। এর চারপাশে স্নায়ুর অসংখ্য জালক থাকে। এই স্নায়ুর সাহায্যে ঘ্রাণের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এ-ছাড়া নাকের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

5. **জিভ** (*Tongue*): মুখের মধ্যে পেশীবহুল এবং শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর আবরণে



চিত্র 21—জিভের বিবিধ অঞ্চল ও তার কাজ।

ঢাকা একটি জিভ আছে। জিভের উপরে অসংখ্য ছোট ছোট **গুটিকা** (*Papillae*) থাকে। এদের সাহায্যেই আমরা নানা রকমের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। জিভের ডগায় অবস্থিত গুটিকাগুলির সাহায্যে মধুর ও লবণাক্ত স্বাদ গ্রহণ করা যায়। ছুই-পাশের গুটিকাগুলি অম্লস্বাদ-গ্রহণে সাহায্য করে, আর পেছনে *V*-এর আকারে সাজানো গুটিকাগুলির সাহায্যে আমরা তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।



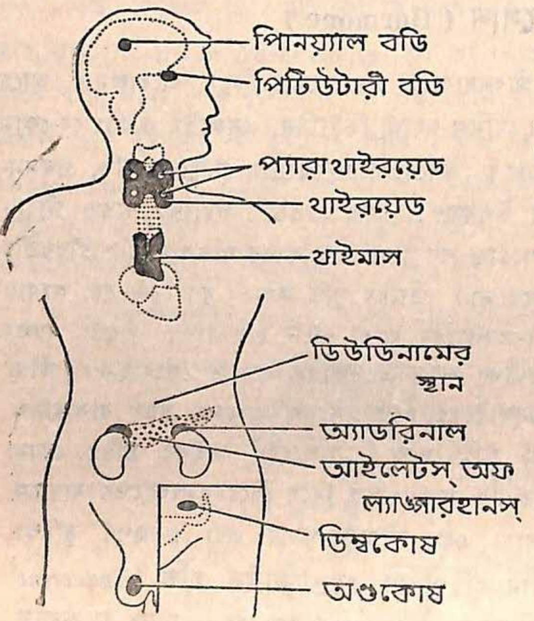
চিত্র 22—জিভের একটি গুটির ভেতরকার কোষতন্ত্র দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরমোন (Hormone)

মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারণের জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন। আগে বলা হয়েছে—নানা রকমের খাদ্য, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন, এন্‌জাইম ও জল যে-কোন প্রাণীর বাঁচার জন্য খুবই দরকার। উপরোক্ত পদার্থগুলি প্রাণীদের বৃদ্ধি, প্রজনন-ক্ষমতা, শক্তি ও সতেজ রাখার উপকরণ। কিন্তু এতগুলি পদার্থের পরেও জীবন-বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, জীব উপরোক্ত সব পদার্থ গ্রহণ করার পরেও তার শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মগুলি ঠিকমতো করতে পারে না। তাদের বৃদ্ধি কখনও খুব বেশী হয়, আবার কখনও বা কম বৃদ্ধির জন্যে বামন-অবতারের মতো বেঁটে হয়ে যায়। হাড়ের দৃঢ়তা আসে না। জীবন-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে এর কারণ জানতে পেরেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, শরীরের মধ্যে এন্‌জাইমের মতো অনেক রকমের তরল রাসায়নিক পদার্থ দেহের ভেতরকার কয়েকটি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এইসব গ্রন্থির কোন নালী থাকে না। তাদের নিঃসৃত রস রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে রক্তস্রোতের মাধ্যমে সারা দেহের কোষে পৌছে যায় এবং জীবদেহ-গঠনে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সব নালীবিহীন গ্রন্থিগুলিকে **এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি** (*Endocrine gland*) বা **নালী-বিহীন গ্রন্থি** (*Ductless gland*) বলা হয়। মানুষ বা অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের ভেতর এ-ধরনের গ্রন্থিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে একটি রাসায়নিক নিয়মে বা পন্থায় কাজ করে। তাই এই গ্রন্থিগুলির কাজকর্মকে এককথায় **এণ্ডোক্রাইন তন্ত্র** (*Endocrine system*) নামে অভিহিত করা হয়। এণ্ডোক্রাইন তন্ত্রটির বিশেষত্ব আছে। এই তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে গ্রন্থিগুলি সুন্দরভাবে সারা দেহে ছড়িয়ে অবস্থান করে। এদের কাজের ধারা-সমন্বয় করলে দেখা যায়, এরা শারীরবৃত্তীয় কাজই করে, অর্থাৎ, দেহ বৃদ্ধি করা, দেহের সতেজতা বজায় রাখা, কর্মক্ষমতা অটুট রাখা, হাড় শক্ত করা ও প্রজননের জন্য শুক্র ও ডিম্বকে তৈরি করতে সহায়তা করা, কোষ-বিভাজন ইত্যাদি কাজকর্ম এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিরই কাজ। প্রথম সারির এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলির কোন নালী নেই, যেমন **পিট্যুইটারী** (*Pituitary*), **থাইরয়েড** (*Thyroid*), **প্যারাথাইরয়েড** (*Parathyroid*) ও **অ্যাড্‌রিন্যালস্** (*Adrenals*)—এদের দেহ-নিঃসৃত রস সোজাসুজি রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে কাজ করে। দ্বিতীয় সারির

গ্রন্থিগুলি, যেমন **অগ্ন্যাশয়** (*Pancreas*), **শুক্রাশয়** (*Testes*) ও **ডিম্বাশয়** (*Ovary*)—এদের নালী আছে ও তাদের মাধ্যমে এরা রস নিঃসৃত করে এবং তা পরে রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করে। এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিরস শারীরবৃত্তীয় কাজগুলিকে উত্তেজিত করে, অর্থাৎ, শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি যাতে ভালোভাবে হয়, তার একটি রাসায়নিক পরিবেশ তৈরি ক'রে উপরোক্ত কাজগুলিকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থিরসকে **হরমোন** (*Ho mone*; Gr. hormao = to excite) বলে। এন্‌জাইম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তুকে জল-সংযোজন-প্রণালী দ্বারা সরল ও তরলে পরিণত করে। হরমোন উত্তেজক এবং উদ্দীপক রাসায়নিক শারীরবৃত্তীয় তরল পদার্থ। একই প্রকার এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি একাধিক হরমোন নিঃসরণ করতে পারে।

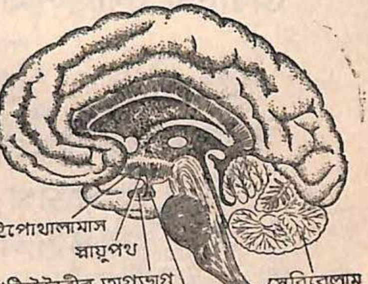


চিত্র 23—মানবদেহের বিভিন্ন এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থির অবস্থান দেখানো হচ্ছে।

হরমোনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ (i) কোন নির্দিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণীর এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থির হরমোন যে কেবল সেই প্রাণীর শরীরে কাজ করে তা নয়, অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে তা যদি প্রবেশ করানো যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়। তাই দেখা যায় যে, গাভীর থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে তা মানুষের শরীরে কাজ করে। (ii) হরমোন এমন একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা শরীর ধ'রে রাখতে পারে না। তাই অতি সামান্য হরমোন বারে বারে শরীরে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। বেশী হরমোন-প্রয়োগে কাজ পাওয়া যায় না। (iii) অতি সামান্য হরমোন-প্রয়োগে শরীরের শারীরবৃত্তীয় কাজের হার দ্রুত বৃদ্ধি করে ঃ যেমন—থাইরক্সিন (থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন)-বিহীন অবস্থায়

যদি 0·5 mg. থাইরক্সিন কোন মানুষের দেহে প্রবেশ করানো যায়, তাহলে তার শ্বাসক্রিয়া শতকরা 65 ভাগ বেড়ে যায়। (iv) দেহের বিবিধ তন্ত্রের কার্যকারিতাকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে রাখে হরমোন। দেহের ভেতরকার বিবিধ যন্ত্রের বৃদ্ধি ও কাজ এবং এক তন্ত্রের কাজের সঙ্গে অন্য তন্ত্রের কাজের মধ্যে সংযোগ ও সমতা রক্ষা ক'রে সে-সবকে নিয়ন্ত্রণ করে এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হরমোন। (v) একই গ্রন্থি বিভিন্ন রকমের হরমোন উৎপন্ন করে। (vi) ভিটামিন হরমোনের কাজকে প্রভাবিত করে। (vii) হরমোন অনুঘটক রূপে কাজ করে।

1. পিট্যুইটারী গ্রন্থি (*Pituitary gland*)**:** মানুষের মস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশের নিচের দিকে স্ফিনয়েড অস্থির চাপা গর্তের ভেতর পিট্যুইটারী গ্রন্থি বা **হাইপোফাইসিস্** (*Hypophysis*) দেখা যায়। এর আকার সাধারণতঃ মটরের মতো এবং এর ওজন 0·5 গ্রাম। জীবন-বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থিকে অন্য গ্রন্থিগুলির চেয়ে নানা দিক থেকে বিচার ক'রে **নিয়ন্ত্রক-গ্রন্থি** (*Master gland*) নামে অভিহিত করেন। এই গ্রন্থি হতে নানাপ্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এই হরমোন উদ্দীপক হিসেবে কাজ ক'রে অন্যান্য এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলিকে হরমোন নিঃসৃত করতে সাহায্য করে। পিট্যুইটারী গ্রন্থির সঙ্গে অন্যান্য এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলির একটা যোগসূত্র দেখা যায়। কারণ, যখন পিট্যুইটারী গ্রন্থির হরমোন কম নিঃসৃত হয়, তখন অন্যান্য গ্রন্থির নিঃসরণ বেশীমাত্রায় হয়। ফলে, হরমোনের ক্রিয়া সারা দেহে ঘাটতি না হয়ে স্বাভাবিক থাকে। আবার এর বিপরীতও হয়, অর্থাৎ পিট্যুইটারী গ্রন্থির নিঃসরণ বেশী হলে, অন্যান্য এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থির নিঃসরণ কম হয়। দুটি পন্থাই দেহের স্বাভাবিক হরমোনের চাহিদা বজায় রাখে।



চিত্র 24—মানব মস্তিষ্কে পিট্যুইটারী গ্রন্থির অবস্থান।

পিট্যুইটারী গ্রন্থির ব্যাস সাধারণতঃ বারো থেকে পনেরো মিলিমিটার। সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের এর আকার পুরুষদের ও সাধারণ স্ত্রীলোকদের পিট্যুইটারির চেয়ে বড় হয়। পিট্যুইটারী পরিষ্কারভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এর **অগ্রভাগ** (*Anterior lobe*) কলাপূর্ণ গ্রন্থিবিশেষ এবং **পশ্চাদ্ভাগ** (*Posterior lobe*) স্নায়ুকলা দ্বারা তৈরি। এই দুটি অঞ্চলকে **পারস্ ইণ্টারমিডিয়া** নামে একটি সরু কলা সংযোগ করে। অগ্রভাগ অঞ্চলের পশ্চাদ্ভাগ পেয়ালার মতো

গঠনের ভেতর পিট্যুইটারীর পশ্চাদ্‌ভাগের অবস্থিতি নজরে পড়ে। এই গ্রন্থির অগ্রভাগ পশ্চাদ্‌ভাগের চেয়ে অনেক বড়।

পিট্যুইটারীর অগ্রাংশের ভেতর নানারকমের কোষ দেখা যায়। এরা নানা-রকমের হরমোন নিঃসরণ করে। জীবন-বিজ্ঞানীরা পরিষ্কারভাবে ছয় প্রকারের হরমোন চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

সোম্যাটোট্রপিক (*Somatotropic*) বা বৃদ্ধি-উদ্দীপক হরমোন দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি, হাড়ের বৃদ্ধি ও পুষ্টির কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। এই হরমোন অতিরিক্ত নিঃসৃত হলে মানুষ বিরাট লম্বা হয়ে যায়। তার হাত-পা ও মুখ অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যায় এবং দেখা গেছে এভাবে অতি-নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবে মানুষ আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়েছে। আবার, সোম্যাটোট্রপিক হরমোন খুব কম নিঃসৃত হলে মানুষের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ 'বামন' বা খুব বেঁটে হয়ে যায়।

গোন্যাডোট্রপিক (*Gonadotropic*) হরমোন বা জনন-অঙ্গ-বৃদ্ধিকারী হরমোন পিট্যুইটারীর অগ্র-অঞ্চলের আর এক প্রকারের নিঃসৃত হরমোন। এই হরমোন



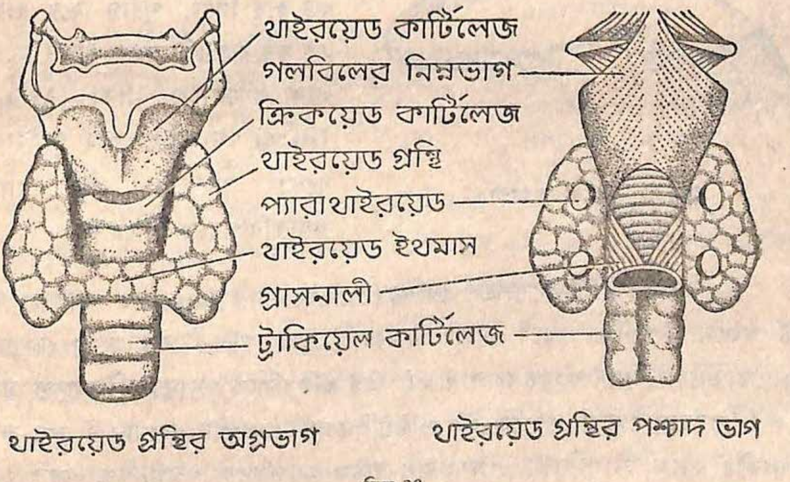
চিত্র 25—পিট্যুইটারীর বহিরাকৃতি।

জনন-অঙ্গ (ডিম্বাণু ও শুক্রাশয়)-বৃদ্ধি, পুষ্টতা এবং অঙ্গের কার্যকারিতা স্থায়ী ও অটুট রাখতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। এদের মধ্যে **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (*Follicle stimulating hormone* : FSH) ও **লুটিনাইজিং হরমোন** (*Luteinizing hormone* : LH) প্রধান। এরা **এস্ট্রোজেন** (*Estrogen*), **প্রোজেস্টেরন** (*Progesterone*) ও **টেস্‌টো-স্টেরন** (*Testo-sterone*) ইত্যাদি হরমোন নিঃসরণ করে।

এরা মানুষের সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি ও জন্মদানের উত্তেজক হরমোন। তৃতীয় প্রকার হরমোন হচ্ছে দুগ্ধ-উৎপাদনকারী। **দুগ্ধ-উৎপাদনকারী** (*Lactogenic*) হরমোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ-তৈরিতে সহায়তা করে। **থাইরোট্রপিক** (*Thyrotropic*) ও **এড্‌রিনোট্রপিক** (*Adrenotropic*) হরমোন থাইরয়েড ও এড্‌রিন্যাল এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পিট্যুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ-অঞ্চল হতে **পিট্যুইট্রিন** (*Pituitrin* or *Pitressin*) ও **অক্সিটোসিন** (*Oxytocin*) নামে দু'রকমের হরমোন পাওয়া যায়। পিট্যুইট্রিন সরু সরু শাখা-ধমনীগুলিকে সংকুচিত ক'রে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে এবং বৃক্কের ভেতর থেকে রক্তের মধ্যে থাকা জল শোষণ করতে সাহায্য করে। ফলে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। এই হরমোন কম নিঃসৃত হলে, মানুষ ঘন ঘন ও বেশী পরিমাণে প্রস্রাব করে। অক্সিটোসিন হরমোন সন্তান-প্রসবের সময় জরায়ুর পেশীগুলিকে সংকুচিত ক'রে প্রসবে সহায়তা করে। এই হরমোনের উত্তেজনায় স্তন থেকে দুধ নিঃসৃত হয়।

2. **থাইরয়েড গ্রন্থি** (*Thyroid gland*)ঃ থাইরয়েড গ্রন্থি দুই-ভাগে বিভক্ত। এটি ট্রাকিয়ার উপরে এবং স্বরযন্ত্রের নিচে থাকে। দু'ভাগের

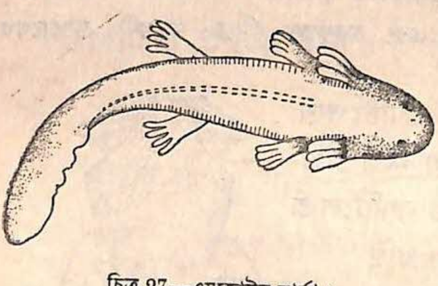


চিত্র 26

কলাগুচ্ছগুলি উঁচু হয়ে ট্রাকিয়ার পাশের অঞ্চলকে বেষ্টন ক'রে রাখে এবং এই দু'ভাগকে যুক্ত ক'রে রাখে একটি সরু অঞ্চল। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে **থাইরক্সিন**

(*Thyroxin*) নামক হরমোন নিঃসৃত হয়। এর রাসায়নিক ফরমূলা জানার ফলে, এখন কৃত্রিম উপায়ে ওষুধ হিসেবে থাইরক্সিন তৈরি ক'রে চিকিৎসা করা হয়। থাইরক্সিনের রাসায়নিক নাম **ট্রাইহাইড্রোট্রিডো-অক্সিবিটা ইণ্ডল-প্রোপিওনিক অ্যাসিড** (*Trihydrotrido-oxybeta Indol-propionic acid*)। **থাইরোগ্লোবিউলিন** (*Thyroglobulin*) হিসেবে উক্ত হরমোন থাইরয়েড কলায় থাকে। পরে এটি পিট্যুইটারী হরমোনের প্রতিক্রিয়ায় থাইরক্সিনে পরিণত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। থাইরক্সিনে শতকরা 65 ভাগ শুধু আইয়োডিন থাকে। থাইরক্সিন দেহের প্রতিটি কলার অক্সিজেন-শোষণের শক্তি বা দহনের শক্তি বাড়িয়ে তোলে, ফলে কোষে-কোষে প্রচুর গতিশক্তি নির্গত হয়। পরোক্ষভাবে এর জন্য দেহের উত্তাপ বাড়ে এবং প্রচুর রেচন-পদার্থ দেহের ভেতর তৈরি হয়। এক কথায়, থাইরক্সিনে শরীরের সর্বপ্রকার বিপাকীয় কাজ বৃদ্ধি পায়, ফলে মানুষের শরীরও স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

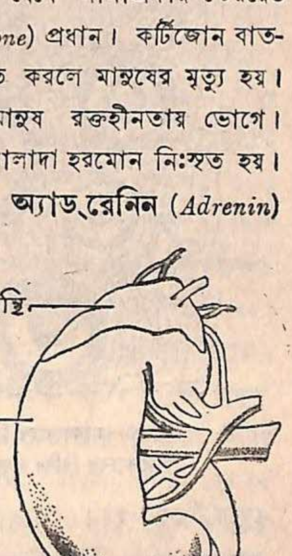
আমেরিকার **অ্যাম্বাইস্টোমা** (*Ambystoma*) উভচর প্রাণীর ব্যাঙাচি-দশায় অতিরিক্ত থাইরয়েড গ্রন্থির রস নিঃসৃত হওয়ায়, ব্যাঙাচি বিরাট বড় হয়ে গিয়ে, পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এই বড় ব্যাঙাচি জনন-কার্যও করে। একে এস্‌জোটল লার্ভা (Axotoll Larva) বলা হয়। পরে থাইরয়েড রসের অভাবে এরা ব্যাঙে রূপান্তরিত হতে পারে না।



চিত্র 27—এস্‌জোটল লার্ভা।

3. **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** (*Parathyroid glands*): থাইরয়েডের ছুটি অঞ্চলে উপর-নিচ ভাবে চারটি গ্রন্থিকে (ছোট মটর-বীজের মতো দেখতে) আলতোভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই গ্রন্থিগুলিকে **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি** বলে। প্যারাথাইরয়েড এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থিগুলি প্রোটিন-জাতীয় হরমোন নিঃসৃত ক'রে বিপাকীয় কাজে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস খনিজ-অণুগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। এই হরমোনের স্বল্পতায় রক্তে ক্যালসিয়ম কমে যায় এবং পেশী-কম্পনের ফলে মানুষ কাঁপতে থাকে। প্যারাথাইরয়েড হরমোন যদি বেশী নিঃসৃত হয়, তা হলে গলায় টিউমার দেখা দেয় ও হাড়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম জমা হতে দেখা যায়।

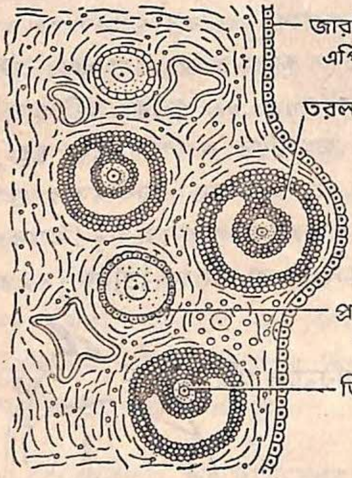
4. **অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি** (*Adrenal glands*) **:** মানুষের দুটি বৃক্কের উপরে টুপির মতো বা মোরগের ঝুঁটির মতো একটি ক'রে গ্রন্থি দেখা যায়। এদের অ্যাড্রিন্যাল এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি বলা হয়। গ্রন্থির বাইরের কলাকে করটেক্স ও ভিতরের কলাকে মেডুলা অঞ্চলরূপে অভিহিত করা হয়। করটেক্স অঞ্চল থেকে নানাপ্রকার স্টেরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় এবং তার মধ্যে **কর্টিজোন** (*Cortisone*) প্রধান। কর্টিজোন বাত-নিবারক। অ্যাড্রিন্যালের করটেক্স অঞ্চল অপসারিত করলে মানুষের মৃত্যু হয়। এই অঞ্চল আঘাতপ্রাপ্ত হলে রক্তচাপ কমে যায় ও মানুষ রক্তহীনতায় ভোগে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির মেডুলা অঞ্চলের কোষ হতে একটি আলাদা হরমোন নিঃসৃত হয়। একে বলা হয় **এপিনেফ্রিনি** (*Epinephrine*) বা **অ্যাড্রেনিন** (*Adrenin*) হরমোন। এটি স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। এটি স্নায়ু-উত্তেজক হওয়ায় রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন স্বাভাবিক করে।



চিত্র ২৪—মানবদেহে অ্যাড্রিন্যাল বা সুপ্রারিন্যাল গ্রন্থির অবস্থান।

5. **অগ্ন্যাশয়** (*Pancreas*) **:** অগ্ন্যাশয়ের কথা নবম শ্রেণীতে বলা হয়েছে। এটি ডিওডিনামের মাঝে থাকে। অগ্ন্যাশয়ের কলার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের কোষগুচ্ছ দেখা যায়। এই কোষগুচ্ছের নাম আবিষ্কারকের নামানুসারে দেওয়া হয়েছে **আইলেট্‌স অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্‌স** (*Islets of Langerhans*)। এর থেকে **ইন্‌সুলিন** (*Insulin*) নামক হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এটি সোজাসুজি রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। ইন্‌সুলিন যকৃতের ভেতর শ্বেতসার-পরিপাকের উপর কাজ করে। যকৃতের ভেতর গ্লুকোজ যাতে বেশী তৈরি না হয়, ইন্‌সুলিন তা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্লুকোজের ভেতর অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দহন করায়। ইন্‌সুলিন যকৃতের ভেতর গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি করাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ইন্‌সুলিনের স্বল্পতায় রক্তে বেশী পরিমাণে গ্লুকোজ মিশে যায় এবং তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। একেই **ডাইবিটিস** বা **বহুমূত্র** রোগ বলে। ইন্‌সুলিন বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়, ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ রক্তস্রোত থেকে গ্লুকোজ শোষণ করতে পারে না। এর ফলে ধীরে-ধীরে মানুষের মৃত্যু হয়।

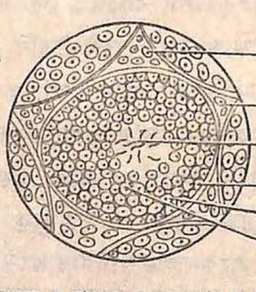
6. **ডিম্বাশয় (*Ovary*)** : স্ত্রী-জাতির ডিম্বাশয় হতে নানাপ্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়। **এস্ট্রোজেন** (*Estrogen*) নামে একপ্রকার হরমোন ডিম্বাশয়ের গ্র্যাফিয়ান ফলিকল থেকে নিঃসৃত হয়। এটি স্ত্রীলোকের ঋতু-নিঃসরণ যাতে ঠিকমতো হয় তা নিয়ন্ত্রণ করে। এ-ছাড়াও যৌন-অঙ্গ-গঠন, বহিঃ-যৌন-অঙ্গের বিকাশ ও যৌন-ক্রিয়া এবং ব্যবহারে এই হরমোন সক্রিয় কাজ করে। **প্রোজেস্টেরন** (*Progesterone*) দ্বিতীয় প্রকার হরমোন, যেটি ডিম্বাশয়ের **করপাস ল্যুটিয়্যাম** (*Corpus luteum*) থেকে নিঃসৃত হয়। স্ত্রীলোকের স্তন-গঠনে ও বৃদ্ধিতে এবং গর্ভাবস্থায় এই হরমোন কার্যকরী হয়। **রিলাক্সিন** (*Relaxin*) নামে আর একটি হরমোন ডিম্বাশয়ের শ্রোণীচক্রের পেশীগুলিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে এবং এর ফলে স্ত্রীলোক সহজে সন্তান প্রসব করতে পারে।



চিত্র 29—মানবদেহের ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদে ডিম্বকোষের বিবিধ অবস্থা দেখানো হচ্ছে।

7. **শুক্রাশয় (*Testes*)** : পুরুষের শুক্রাশয়ের গাত্রকোষ হতে **টেস্টোস্টেরন** (*Testosterone*) নামে একপ্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন





চিত্র 30—মানবদেহের শুক্রাশয়ের লম্বচ্ছেদ ও প্রস্থচ্ছেদে শুক্রকোষ দেখানো হচ্ছে।

পুরুষের যৌন-অঙ্গ-গঠনে ও বহিঃ-যৌন-অঙ্গগুলির বিকাশে প্রয়োজনীয় এবং যৌন-অঙ্গের ব্যবহার ও ক্রিয়াও এই হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্ভিদ্-হরমোনঃ আলোকবৃত্তি পরীক্ষায় দেখা যায় যে আলোকে আলোকিত সদ্য-অঙ্কুরিত উদ্ভিদের অগ্রভাগটি আলোকের উৎসমুখের দিকে বেঁকে যায়। অগ্রভাগটির বৃদ্ধি হতেও দেখা যায়। কিন্তু অগ্রভাগটি বিনষ্ট করলে বৃদ্ধি বাধা-প্রাপ্ত হয়। স্যাক্স, বয়সেন-জেনসেন (*Boysen-Jensen*), ওয়েন্ট (*Went*) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য আপন পরিবেশ হতে গৃহীত আলো, জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের বিপাকীয় কাজের মধ্যে সমতা রাখার জন্য জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন। আয়তাকার অ্যাগার ব্লকের (*Agar block*) সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে কোষ-কলা থেকে নিঃসৃত একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ সদ্য-অঙ্কুরিত কলিওপ্টাইলের অগ্রভাগের বৃদ্ধির কারণ। বৃদ্ধিকারী বস্তুটিকে **অক্সিন** (*Auxin*) বলা হয়। এটি একপ্রকার **উদ্ভিদ্-হরমোন।** উদ্ভিদে হরমোন নিঃসৃত কোন গ্রন্থি নেই। বর্ধনশীল কাণ্ডের আগায়, পাতা, মুকুল, প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরী বা ফুল ইত্যাদিতে উদ্ভিদ্-হরমোন নিঃসৃত হয়ে ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে উদ্ভিদের সর্বাঙ্গে পরিবাহিত হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিভেদ, কোষ-বিভাজন, মুকুল, পুষ্প ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম ইত্যাদি হরমোনের প্রভাবে বা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হয়।

উদ্ভিদ্-হরমোনের বেশীর ভাগই নাইট্রোজেন-ঘটিত জৈব পদার্থ। উদ্ভিদের দেহে সংশ্লেষিত হরমোনগুলিকে **প্রাকৃতিক হরমোন** বলা হয়। অক্সিন বা ইণ্ডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA); জিবেরেল্লিন বা জিবেরেল্লিক অ্যাসিড (GA); এবং জিয়াটিন (সাইটোকাইনিন)—এই তিনটি প্রাকৃতিক হরমোন। জুঁই গাছের বর্ধনশীল অঞ্চল থেকে অক্সিন পাওয়া যায়। কাণ্ডের অগ্রভাগ, বীজ, ক্রমবর্ধনশীল পাতা প্রভৃতিতে এদের ভাজক কলায় অক্সিন তৈরি হয়। অক্সিন দ্রবণীয় জৈব পদার্থ। এটি ব্যাপনক্ষম এবং প্রায়ই প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ঘনত্ব বা পরিমাণের অক্সিন উদ্ভিদের নানারকম অঙ্গে নানাভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে। অক্সিন কোষ-প্রাচীরের সম্প্রসারণতা বৃদ্ধি ক'রে কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে। মূলোদ্গম, মুকুল ও ফুলের বিকাশ, ফুল ও ফলের অকাল পতন-রোধ, গাছের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি ও দিক্-নির্ণীত চলন প্রভৃতি উদ্ভিদের বিবিধ ক্রিয়া অক্সিন নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় প্রকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ্-হরমোনের নাম **জিবেরেল্লিন্স** (*Gibberelliens*)। এটি জিবেরেল্লা ফুজিকুরই নামক ছত্রাক হতে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এটি অঙ্কুরিত ও

পরিণত বীজ, ক্রমবর্ধনশীল বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অক্সিনের মতো এটিও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপাকীয় কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্ভিদের **খর্বতা গুণ** (*Dwarfism*) বিনষ্ট ক'রে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। **সাইটোকাইনিন** (*Cytokinin*) উদ্ভিদের তৃতীয় প্রকারের প্রাকৃতিক হরমোন। নানারকমের বীজের শস্যে, ডাবের জলে, আপেল, টম্যাটো, কলা প্রভৃতি ফলে সাইটোকাইনিন হরমোন পাওয়া যায়। এটি কোষ-বিভাজনকে প্রভাবিত করে। কোষের প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। **অ্যাবসিসিন** নামক হরমোন পর্ণমোচী উদ্ভিদের পর্ণমোচনে সাহায্য করে। **ফাইলোক্যালিন** নামক হরমোন পাতার বৃদ্ধি ঘটায়। **ফ্লোরিজেন** নামক হরমোন উদ্ভিদের পুষ্প-প্রস্ফুটনে সাহায্য করে। **রাইজোক্যালিন** হরমোন উদ্ভিদের মূলের গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।

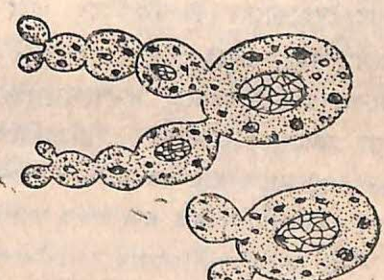
কৃষিকার্য, পুষ্পোদ্যান ও **বাগিচা** রচনায় উদ্ভিদ্-হরমোনের প্রভাব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। ফুল ও ফলপ্রদেয় উদ্ভিদের কলম তৈরির জন্য বাজারে **সিরাডিক্স** (*Seradix*) নামে উদ্ভিদ্-হরমোন পাওয়া যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম অক্সিন হরমোন। কৃষিক্ষেত্রে আগাছা ধ্বংসের জন্য নানা রকমের অক্সিন ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম উদ্ভিদ্-হরমোনের সাহায্যে অকাল মুকুলোদ্গম নিবারণ, পুষ্পোদ্গম ত্বরান্বিত করা, নিষেক ব্যতিরেকে ফলোৎপাদন করা, ফলের আকৃতি বৃদ্ধি করা এবং ফল ও বীজের পুষ্টতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোষ-বিভাজন

(Cell-division)

জীবের বৃদ্ধি তার কোষের বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কোষের সৃষ্টি কখনও নতুন ক'রে হয় না, পূর্বেকার কোষ হতে বিভক্তির দ্বারাই নতুন কোষের উৎপত্তি হয়। নতুন কোষগুলিকেই **অপত্য-কোষ** (*Daughter cell*) বলা হয়। অপত্য-কোষগুলি ধীরে-ধীরে পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে আবার বিভক্তির দ্বারা নতুন কোষের উৎপত্তি করে। এইভাবে একটিমাত্র পুষ্ট কোষ থেকে উদ্ভিদের বা প্রাণীদের বা আমাদের সমস্ত দেহটি তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোষের বিভক্তির দ্বারা। আমাদের দেহে প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার কোষ তাদের কাজ শেষ ক'রে মরে যাচ্ছে, আবার তেমনি পুরোনো কোষ-বিভাজনে নতুন নতুন সজীব কোষের সৃষ্টি হয়ে দেহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো কোষের মৃত্যু ও নতুন কোষের সৃষ্টি জীবকে সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখে। এককোষী উদ্ভিদ্, যথা—ঈস্ট, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি উদ্ভিদের **অঙ্গজ-জননের** (*Vegetative reproduction*) দ্বারা কোষ-বিভাজনে বংশ-বৃদ্ধি হয়। একে **কোষোদ্গম** (*Budding*) বলা হয়। এককোষী জীবের কোষ-প্রাচীর হতে মুকুলের মতো এক অংশ স্ফীত হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ সেটি বড় হয়। ইতিমধ্যে কোষের নিউক্লিয়সের বৃদ্ধি হয় এবং এটি লম্বা হয়ে এর কিছু অংশ কোষ-প্রাচীরের স্ফীত অংশের ভেতর প্রবেশ করে। এখন নিউক্লিয়সটির মাঝামাঝি অংশ থেকে কেটে বা ভেঙে গিয়ে দুটি অপত্য-নিউক্লিয়সে বিভক্ত হয়ে যায়। কোষ-প্রাচীরের স্ফীত অংশের ভেতর একটি অপত্য-নিউক্লিয়স-কোষে কিছু সাইটোপ্লাজম নিয়ে বড় হতে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ হলে মাতৃকোষ থেকে কেটে একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ কোষে পরিণত হয়। এইভাবে এককোষী জীব অঙ্গজ-জনন-প্রণালীর দ্বারা নতুন এককোষী জীব তৈরি করতে পারে।



চিত্র 31—ঈস্ট উদ্ভিদের কোরকোদ্গম।

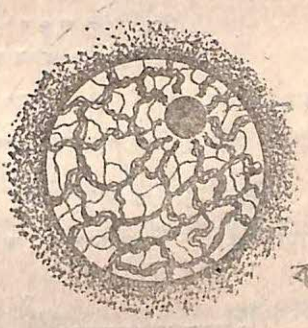
বহুকোষী উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের দেহে অসংখ্য কোষ থাকে। সাধারণ কোষ বা যে-সমস্ত কোষ দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে, তাদের **দেহকোষ** (*Somatic cell* or *Body cell*) বলা হয়। দেহকোষে প্রতিটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় **ক্রোমোজোম** (*Chromosome*) থাকে ; যেমন—মটরগাছের কোষে ১৪টি, পেঁয়াজে ১৬টি, তামাকে ৪৮টি, ইত্যাদি। কোষের ভেতর যে নিউক্লিয়-জালিকা অণুবীক্ষণের তলায় দেখা যায়, তা থেকেই ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়। দেহকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যাকে জীবন-বিজ্ঞানীরা **'2n'-সংখ্যাযুক্ত ক্রোমোজোম** বা **ডিপ্লয়েড** (*Diploid*) **ক্রোমোজোম** ব'লে অভিহিত করেন। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং প্রাণীর পেশী, হৃদ্‌যন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতিতে যে-সমস্ত কোষ থাকে, সেগুলি সবই দেহকোষ।

উদ্ভিদের রেণু ও ডিম্বকের মধ্যে এবং প্রাণীর **শুক্রাণু** (*Sperm*) ও ডিম্বকোষের (*Ovary*) মধ্যে কিন্তু ডিপ্লয়েড সংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকে না। এইসব কোষকে **বীজকোষ** (*Germ cell*) বলা হয়। বীজকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক থাকে, অর্থাৎ মটর উদ্ভিদের দেহকোষে ১৪টি ক্রোমোজোম থাকে। তাহলে মটরের **জনন-নিউক্লিয়সে** (*Spermatid*) ৭টি ক্রোমোজোম থাকবে এবং তার **ডিম্বাণু** (*Ovum*)-তেও ৭টি ক্রোমোজোম থাকবে। জনন-নিউক্লিয়স ও ডিম্বাণুর মিলনে বীজের সৃষ্টি হবে, তখন আবার দেহকোষের উৎপত্তি হবে এবং প্রতিটি কোষে আবার ১৪টি (৭+৭) ক্রোমোজোম থাকবে। তাই জনন-নিউক্লিয়স কোষ, ডিম্বাণু কোষ, শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের নিউক্লিয়সকে **'n'-সংখ্যাযুক্ত ক্রোমোজোম** বা **হ্যাপ্লয়েড** (*Haploid*) সংখ্যা ক্রোমোজোম থাকে। বীজকোষকে অনেক জীবন-বিজ্ঞানীরা **যৌন কোষ** (*Sex cell*) নামে অভিহিত করেন। ক্রোমোজোমগুলি কতকগুলি কঠিন রাসায়নিক জারক-বস্তুর দ্বারা নির্মিত এবং এদের মধ্যেই **বংশগত ধর্ম** (*Hereditary characters*) বা বৈশিষ্ট্য থাকে। বীজকোষ বা যৌনকোষ মাধ্যমেই বংশ-পরম্পরা ক্রোমোজোমের চলন অবাধে সাধিত হয়। যেহেতু প্রতিটি জীবের ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাই প্রতিটি জীবের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের হের-ফের হয় না। মটর-উদ্ভিদের বীজ থেকে মটর-উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাঙের শুক্রাণু ও ডিম্বের মিলনের দ্বারা যে কোষের উৎপত্তি হয়, তার বিভাজনে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ আমরা দেখতে পাই। কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর বীজকোষ বা যৌনকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কম-বেশী হলে, সেই উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আগেকার মতো থাকে না।

দেহকোষ একটি প্রণালীতে বিভক্ত হয়। এই ধরনের বিভাগ দুটি দশা বা অবস্থায় (*Stage*) বিভক্ত। প্রথম অবস্থাকে **মাইটোসিস** অথবা **ক্যারিওকাইনেসিস**

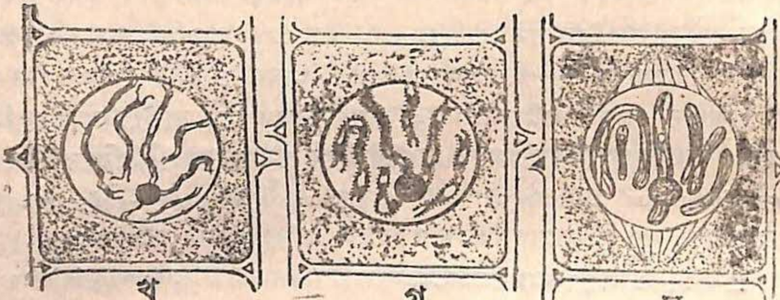
বা **সোমাটিক মাইটোসিস** (*Mitosis* or *Karyokinesis* or *Somatic Mitosis*) বলে। উপরোক্ত প্রণালীতে দেহকোষের নিউক্লিয়স প্রথমে জটিলভাবে দুইটি অপত্য-নিউক্লিয়সে বিভক্ত হয়। এই জটিল প্রক্রিয়াকে **মাইটোসিস** বলা হয়। দ্বিতীয় অবস্থাকে **সাইটোকাইনেসিস** (*Cytokinesis*) বলা হয়। মাতৃ-নিউক্লিয়স দুটি অপত্য-নিউক্লিয়সে বিভক্ত হবার পরে কোষের সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি আলাদা স্বাধীন কোষের সৃষ্টি করে। এই কোষ-বিভাজনকে **সাইটোকাইনেসিস** বলা হয়। **ক্যারিওকাইনেসিস** বা **মাইটোসিস** বা **পরোক্ষ নিউক্লিয়ো-বিভাগ** (*Karyokinesis* or *Mitosis* or *indirect Nuclear divison*)—এই প্রণালীতে দেহকোষ চারটি দশা বা অবস্থা অতিক্রম ক'রে দুটি অপত্য-কোষের সৃষ্টি করে।

প্রথম অবস্থা বা প্রোফেজ (*Prophase*)ঃ দেহকোষ বিভাজনের আগে বড় ও স্ফীত হয়, পরে নিউক্লিয় জালিকা স্ফীত হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সরু সুতোর মতো অংশে ভাগ হয়ে যায়। এই সরু সুতোকে **ক্রোমোনিমাটা** (*Chromonemata*) বা **ক্রোমোজোম** (*Chromosome*) বলা হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বা ও বক্রভাবে থাকে। ক্রোমোজোমগুলি ফুলে স্থূল হয়ে সঠিক লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। তখন ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এখন, ক্রোমোজোমের প্রতিটি ভাগকে **ক্রোমাটিড** (*Chromatid*) বলা হয়। ক্রোমাটিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সর্পিলভাবে (*Spirally*) পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে নিউক্লিয় ঝিল্লি ও নিউক্লিয়োলাস ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে থাকে এবং **নিউক্লিয়প্লাজম** (*Nucleoplasm*) থেকে কতকগুলি **নিউক্লিয় তন্তুর** (*Nuclear spindle*) উদ্ভব হয়। এই নিউক্লিয় তন্তু বর্ণহীন ও এর আকার মাকুর মতো। এর মাঝখানটা মোটা বা স্ফীত, তাই এই স্থানটিকে **বিষুব-অঞ্চল** (*Equatorial region*) বলা হয়। এর সূক্ষ্ম দুই প্রান্তকে **মেরু** (*Pole*) বলা হয়। প্রত্যেকটি ক্রোমাটিডের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট যোজন-স্থান বা তন্তুর সঙ্গে **সংযোগ-স্থান** (*Spindle attachment region*) থাকে। ক্রোমাটিডের এই যোজন-স্থানকে **সেণ্ট্রোমিয়ার** (*Centromere*) বলে। যে-সব তন্তুতে ক্রোমাটিডগুলি আটকে থাকে, সেই সব তন্তুকে **আকর্ষ-তন্তু** (*Traction fibre*) বলে এবং অপর



চিত্র 32(ক)
একটি স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস।

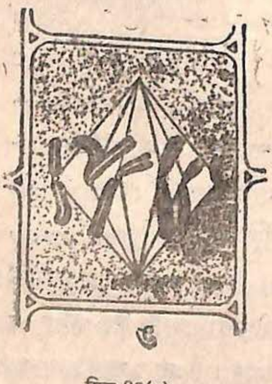
তন্তুগুলিকে বেমতন্তু (*Spindle fibre*) বলা হয়। ক্রোমাটিডগুলি আকর্ষ-তন্তুতে আটকে-থাকা অবস্থায় এদের শেষ অংশ-দুটি বা বাহু-দুটি ঝুলতে থাকে। এই ঝুলন্ত



চিত্র 32 (খ, গ ও ঘ)—মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের বিভিন্ন দশা।
খ, গ, ঘ—প্রথম অবস্থার বিভিন্ন দশা বা প্রোফেজ স্টেজ।

বাহু-দুইটি কখন কখন 'L' বা 'V' বা 'U' অক্ষরের আকার ধারণ করে। ইতমধ্যে নিউক্লিয় ঝিল্লী ও নিউক্লিয়োলাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা বা মেটাফেজ (*Metaphase*)**:** এই অবস্থায় ক্রোমাটিডগুলি বিষুব-অঞ্চলে আকর্ষ-তন্তুর সঙ্গে আটকে থাকে। এই সময়ে



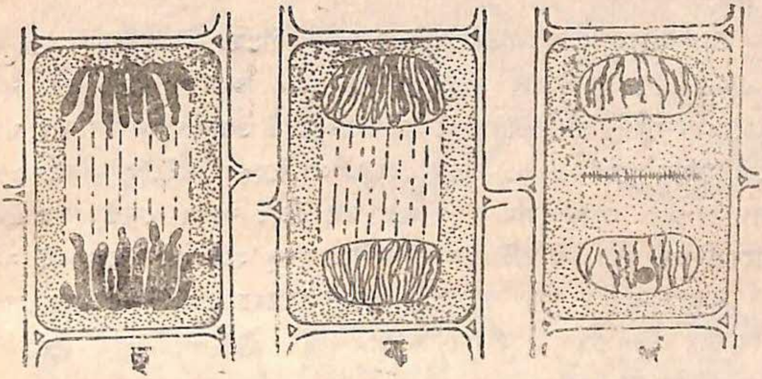
চিত্র 32(ঙ)
মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের বিভিন্ন দশা।
ঙ—দ্বিতীয় অবস্থা বা মেটাফেজ স্টেজ।



চিত্র 32(চ)
মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের বিভিন্ন দশা।
চ—তৃতীয় অবস্থা বা প্রথম অ্যানাফেজ স্টেজ।

ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলি স্পষ্ট দেখা যায় এবং এদের নির্দিষ্ট সংখ্যাও গণনা করা যায়।

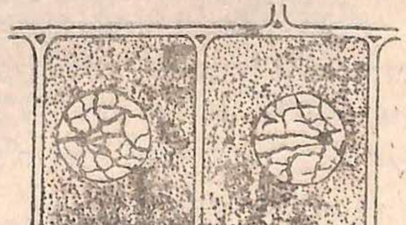
তৃতীয় অবস্থা বা অ্যানাফেজ (*Anaphase*)**ঃ** এই অবস্থায় প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের জোড়া ক্রোমাটিড বা অপত্য-ক্রোমোজোম পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। তন্তুগুলি সংকুচিত হওয়াতে ক্রোমাটিডগুলি ধীরে-ধীরে দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমাটিড বা অপত্য-ক্রোমোজোম এক



চিত্র 32 (ছ, জ, ঝ)—মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের বিবিধ দশা।
ছ—অ্যানাফেজের দ্বিতীয় স্টেজ। ঝ, জ—চতুর্থ অবস্থা, টেলোফেজ স্টেজ।

মেরুতে এবং অপর অর্ধেক ক্রোমোটিড বা অপত্য-ক্রোমোজোম বিপরীত মেরুতে গিয়ে জমা হয়।

চতুর্থ অবস্থা বা টেলোফেজ (*Telophase*)**ঃ** অর্ধেক ক্রোমাটিড প্রত্যেক মেরুতে পৌছানোর পর পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পাইরিম গঠন করে ও পরে নিউক্লিয় জালিকায় পরিণত হয়। তন্তুগুলি ধীরে-ধীরে ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিউক্লিয় ঝিল্লী বা মেমব্রেন নিউক্লিয় জালিকাকে আবৃত করে। এখন নতুন সৃষ্ট অপত্য-কোষ-দুটির মধ্যে নিউক্লিয়োলাস তৈরি হতে দেখা যায়। এইভাবে দুটি নতুন অপত্য-কোষের নিউক্লিয়সে মাতৃ-নিউক্লিয়সের মতো সমসংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকে।



চিত্র 32(ঞ)—মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের একটি দশা। ঞ—কোষ-বিভাগের সাইটোকাইনেসিস।

কোষ-বিভাজন বা সাইটোকাইনেসিস (*Cytokinesis*)**ঃ** নিউক্লিয়-বিভক্তির চতুর্থ অবস্থা বা দশা আরম্ভ হবার আগেই

কোষের বিষুব-অঞ্চলে বিন্দু-বিন্দু সেলুলোজ-কণা জমা হতে থাকে। পরে এটি একটি সূক্ষ্ম পর্দায় পরিণত হয়। পরে এটি অন্তঃকোষ-প্রাচীর বা **কোষ-পাত** (*Nuclear plate*) রূপে পরিণত হয়। এই কোষ-পাত ভেতর থেকে লম্বালম্বি চিরে যায় ও মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজম সম্পূর্ণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষের সৃষ্টি করে।

প্রাণিকোষ : মাইটোসিস প্রণালীতে বিভাজন (*Animal cell-division*) : প্রাণিকোষ উদ্ভিদ্-কোষের চেয়ে অনেক ছোট এবং সজীব প্রোটোপ্লাজম-পূর্ণ। এর নিউক্লিয়সের ঠিক উপরে একটি উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায়, তাকে **সেণ্ট্রোসোম** (*Centrosome*) বলা হয়। প্রাণিকোষ মাইটোসিস প্রণালীতে বিভাজনের সময় সেণ্ট্রোসোম মাকুর মতো তন্তু তৈরি করে। সেণ্ট্রোসোম প্রথমে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। প্রতিটি ভাগ ধীরে-ধীরে পৃথক্ হতে থাকে এবং এই সময়ে এদের মধ্যে নিউক্লিয় তন্তুর সৃষ্টি হয়। সেণ্ট্রোসোমের একটি ভাগ উত্তর মেরু ও দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ মেরুর দিকে গিয়ে অবস্থান করে। ধীরে-ধীরে মাকুর মতো সমস্ত কোষে নিউক্লিয় তন্তু দেখা যায়।

প্রোফেজ পর্যায় (*Prophase stage*) : সেণ্ট্রোসোম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নিউক্লিয় তন্তু তৈরি করার পরে কোষের নিউক্লিয় জালিকাগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ক্রোমোজোমে বা ক্রোমোনিমাটায় বিভক্ত হয়।

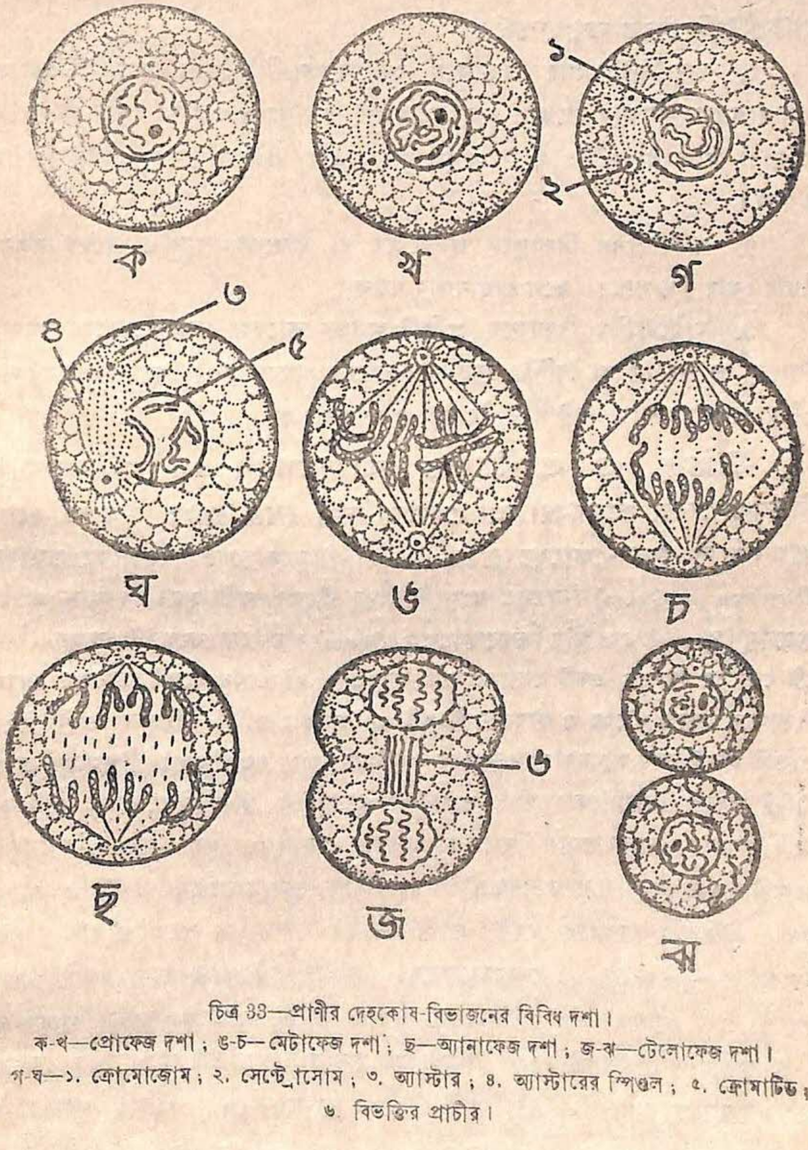
মেটাফেজ পর্যায় (*Metaphase stage*) : প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে চিরে যায়। একটি ক'রে ক্রোমোজোম দুটিতে পরিণত হয়। এখন প্রতিটি ক্রোমোজোমের চিড়কে ক্রোমাটিড বলা হয়। ক্রোমাটিডগুলি আকর্ষ-তন্তুতে আটকে ঝুলতে থাকে। এদের দুই শেষ অংশ কখন 'L' বা 'V' বা 'U' অক্ষরের অনুকরণে তন্তুর সঙ্গে আটকে ঝুলতে থাকে।

অ্যানাফেজ পর্যায় (*Anaphase stage*) : এই পর্যায়ে ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিউক্লিয় তন্তুর সাহায্যে জোড়া ক্রোমাটিডগুলির একটি উত্তর মেরুর দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ মেরুর দিকে সরে যেতে দেখা যায়। ক্রোমোজোমের অর্ধেক ক্রোমাটিড উত্তর মেরুর কাছে এবং বাকি অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে জমা হয়।

টেলোফেজ পর্যায় (*Telophase stage*) : এই পর্যায়ে ক্রোমাটিডগুলি জলশোষণের পর লম্বা ও সোজা হয়ে যায়। এরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন নিউক্লিয় জালিকা সৃষ্টি করে। এই সময়ে নিউক্লিয় তন্তু লুপ্ত হয়ে যায় এবং নতুন ক'রে

নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার পর্দার সৃষ্টি হয়। এইভাবে অপত্য-কোষ-দুটি তৈরি হবার পর প্রতিটির মাথার উপর নিউক্লিয়ার পর্দার উপর একটি ক'রে সেণ্ট্রোসোম দেখা যায়।

সাইটোকাইনেসিস (*Cytokinesis*)ঃ নিউক্লিয় বিভাগের পর



চিত্র 33—প্রাণীর দেহকোষ-বিভাজনের বিবিধ দশা।
ক-খ—প্রোফেজ দশা; ঙ-চ—মেটাফেজ দশা; ছ—অ্যানাফেজ দশা; জ-ঝ—টেলোফেজ দশা।
গ-ঘ—১. ক্রোমোজোম; ২. সেণ্ট্রোসোম; ৩. অ্যাস্টার; ৪. অ্যাস্টারের স্পিণ্ডল; ৫. ক্রোমাটিড; ৬. বিভক্তির প্রাচীর।

কোষের বিষুবীয় অঞ্চলের দু'ধারে প্রোটোপ্লাজমে একটি ক'রে খাঁজ পড়ে। এই খাঁজ-দুটি পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায় এবং শেষে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাতৃকোষের প্রোটোপ্লাজমকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। এর ফলে দুটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ অপত্য-কোষের সৃষ্টি হয়।

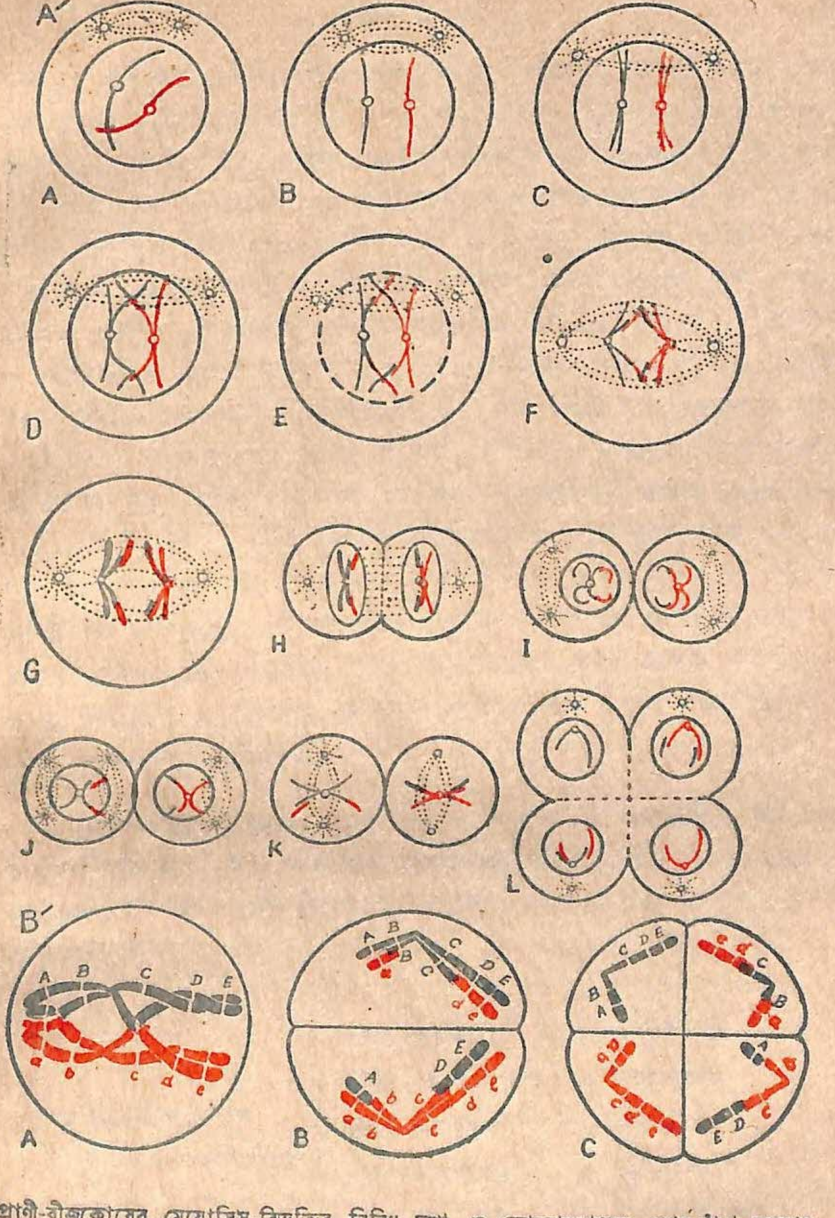
মাইটোসিসের তাৎপর্য :

1. মাতৃ-নিউক্লিয়সের বিভাজনে সৃষ্ট অপত্য-নিউক্লিয়সে মাতৃ-নিউক্লিয়সের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। বারে বারে এই বিভাজনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মাইটোসিসের এইটিই প্রধান তাৎপর্য।

2. মাইটোসিস বিভাজনে জননকোষ বা বীজকোষ ব্যতীত দেহের সকল-প্রকার কোষ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহ সজীব থাকে।

3. মাইটোসিস বিভাজনে প্রতিটি অপত্য-কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা, উপাদান ও গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য হুবহু মাতৃকোষের অনুরূপ হয়। ফলে অপত্য-কোষ দুটি মাতৃকোষের ন্যায় একই গঠন, বৈশিষ্ট্য ও গুণসম্পন্ন হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের বীজকোষ বা যৌনকোষ বিভাজনের প্রণালী বা মেয়োসিস (Meiosis) : উদ্ভিদের ফুলের রেণুর মধ্যে **পুং-জনন-কোষের** (*Male pronucleus*) সঙ্গে ফুলের ডিম্বকোষের **ডিম্বাণুর** (*Oosphere* or *Ovum*) মিলনের ফলে উদ্ভিদের বীজের সৃষ্টি হয়। তেমনি প্রাণীর **শুক্রাণু** (*Sperm*) এবং স্ত্রীর **ডিম্বকোষের** (*Ovum*) সংযোগের ফলে নিষেক হয়। এই দুটি কোষের মিলনে একটি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এই কোষ হতেই ক্রমাগত কোষ-বিভাজনের ফলে জীবের ও জীবনের উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কিংবা প্রতিটি জীবই তার জীবনযাত্রা শুরু করে একটিমাত্র কোষ সম্বল ক'রে। পুরুষের একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক ক্রোমোজোম তার শুক্রাণুতে থাকে এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষেও সেইরকম নির্দিষ্ট-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। সুতরাং শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের নিষেকে যে কোষটির সৃষ্টি হয়, তাতে স্বভাবতঃই দ্বিগুণ-সংখ্যক ক্রোমোজোমের উপস্থিতি থাকার কথা। উদ্ভিদের বেলায়ও সেই একই নিয়ম। কিন্তু এর ফলে প্রতিটি পুরুষের (বংশধারা—*generation*) ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কথা। কোন জীবের প্রথম পুরুষে যদি 12টি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পুরুষে তা 24টি, তৃতীয় পুরুষে 36টি হবে। **কিন্তু তা হয় না।** প্রতিটি জীবে তার কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। তাই উদ্ভিদের পুং-জনন-কোষ, ডিম্বাণু এবং প্রাণীর



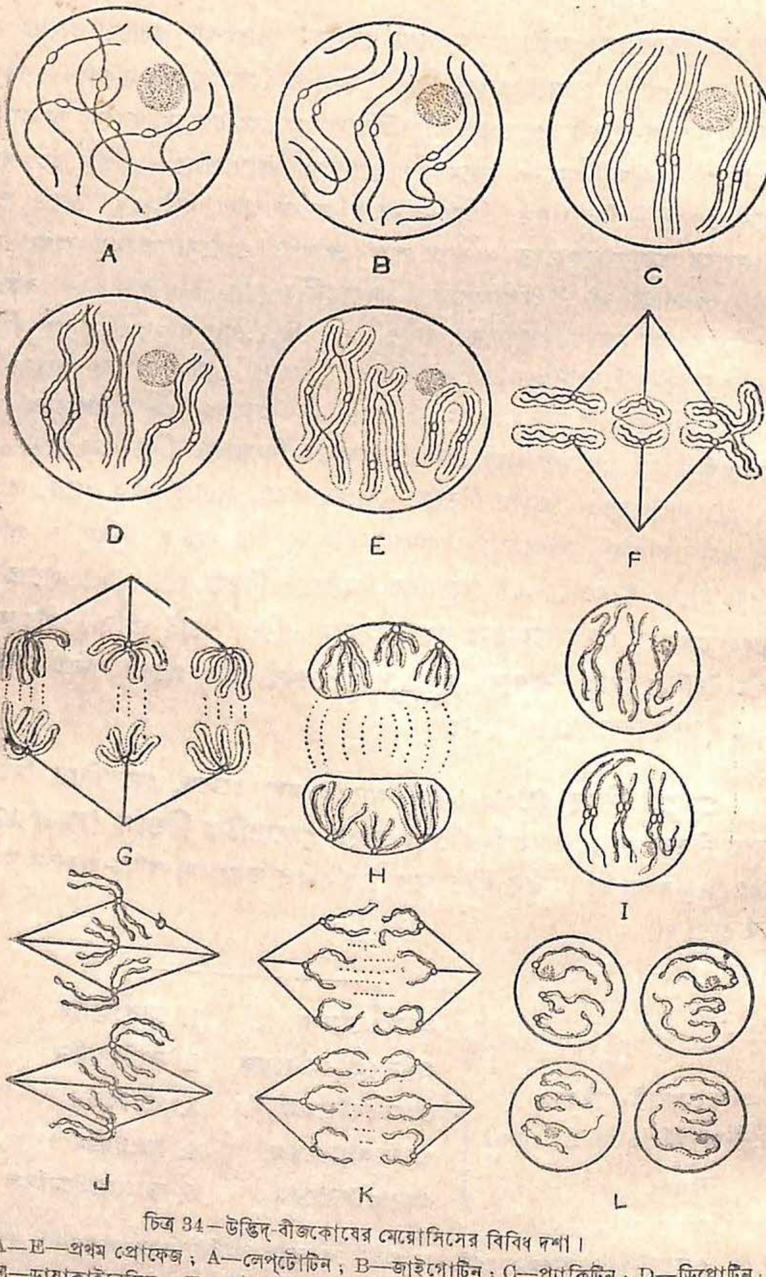
প্রাণী-বীজকোষের মেয়োসিস-বিভক্তির বিবিধ দশা ও ক্রোমোজোমের জোড়-বাঁধা অবস্থায় (Synapsis) তার গঠন-বৈশিষ্ট্য ও জোড় খোলার পরে এদের গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে :
a—e—প্রথম প্রোফেজ। a, লেপটোটিন ; b, জাইগোটিন , c. প্যাকিটিন ; d, ডিপ্লোটিন ; e, ডায়াকাইনেসিস ; f, মেটাফেজ প্রথম ; g, অ্যানাফেজ প্রথম ; h. টেলোফেজ প্রথম , i, প্রোফেজ দ্বিতীয় ; j, মেটাফেজ দ্বিতীয় ; k, অ্যানাফেজ দ্বিতীয় ; l টেলোফেজ দ্বিতীয়।
উপরের চিত্রে জোড়-বাঁধা বা সিন্যাপ্‌সিস হোমোলগাস বাইভালেন্ট-এর মধ্যে চারটি ক্রোমাটিড A, B, C, D স্থানে যুক্ত হওয়ায়, ক্রোমাটিডের ভিতরকার জীন বা বংশাণুর গতি অবাধ হয়, ফলে ক্রোমাটিডগুলি পরে আলাদা হয়ে গেলে, এদের বংশাণুঘটিত পরিবর্তন ক্রোমাটিডে দেখা যায়।

শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের সৃষ্টির সময়ে এদের কোষের ভেতরকার ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক অভিনব প্রক্রিয়ায় **অর্ধেক** হয়ে যায়। ফলে উদ্ভিদের পুং-জনন-কোষ ও ডিম্বাণুর নিষেকে যে কোষের সৃষ্টি হয়, তাতে মাতৃ-উদ্ভিদের কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার সঙ্গে মিল থাকে ; অর্থাৎ নিষেকের কোষ ও মাতৃকোষের ক্রোমাজোমের সংখ্যা এক থাকে। তেমনি শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের মিলনের ফলে যে কোষটির সৃষ্টি হয়, তাতে তাদের মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার সঙ্গে কোষটির ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে। প্রকৃতির এই অভিনব পদ্ধতিকে **মেয়োসিস** (*Meiosis*) বলা হয়। বীজকোষ বা যৌনকোষের কোষ-বিভাজনের সময়ে এর নিউক্লিয়স পর-পর **দু'বার বিভক্ত** হয়। **দু'বার** সাইটোকাইনেসিস কার্যকরী হয়। ফলে, একটি কোষ-বিভাজনের দ্বারা চারটি কোষে পরিণত হয়। প্রথম বিভাগে নিউক্লিয়সের ক্রোমোজোমের সংখ্যা **অর্ধেক** হয়ে যায়। সেইজন্য প্রথম কোষ-বিভাজনকে **বিয়োজন-বিভাজন** (*Reduction division*) বলা হয়। দ্বিতীয় বিভাগে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সঠিক থাকে, তা হ্রাস পায় না। সাধারণ মাইটোসিস প্রথায় এই বিভক্তি ঘটে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের প্রতিটি জীবের জননকোষ এই মেয়োসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট জীবের মধ্যে তাদের কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান রাখে। তাই প্রতিটি জীব আপন-আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেদের গুণাগুণের বিশেষত্ব বজায় রাখে। নিচে মেয়োসিস প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল :

মেয়োসিস (Meiosis) : আগেই বলা হয়েছে, মেয়োসিসে নিউক্লিয়স দু'বার বিভক্ত হয়। প্রথম বিভক্তিকে **প্রথম মেয়োটিক বিভাগ** (*First Meiotic division*) বলা হয়। এই বিভাগকে নিম্নলিখিত ভাগে বা পর্যায়-মাধ্যমে কার্যকরী হতে দেখা যায়—

প্রথম মেয়োটিক বিভাগ (First Meiotic division)	প্রথম প্রোফেজ	1. লেপ্টোটিন
	প্রথম প্রো-মেটাফেজ	2. জাইগোটিন
	প্রথম মেটাফেজ	3. প্যাকিটিন
	প্রথম অ্যানাফেজ	4. ডিপ্লোটিন
	প্রথম টেলোফেজ	5. ডায়াকাইনেসিস

প্রথম মেয়োটিক বিভাগের প্রোফেজ পর্যায়কে তার কার্যকারিতা অনুযায়ী পাঁচ ভাগ ক'রে বোঝানো হয়েছে। পরপৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে তার বিবরণ দেওয়া হ'ল :



চিত্র 34—উদ্ভিদ্-বীজকোষের মেয়োসিসের বিবিধ দশা।
A—E—প্রথম প্রোফেজ ; A—লেপ্‌টোটিন ; B—জাইগোটিন ; C—প্যাকিটিন ; D—ডিপ্লোটিন ; E—ডায়াকাইনেসিস ; F—মেটাফেজ-প্রথম ; G—অ্যানাফেজ-প্রথম ; H—টেলোফেজ-প্রথম ; I—প্রোফেজ-দ্বিতীয় ; J—মেটাফেজ-দ্বিতীয় ; K—অ্যানাফেজ-দ্বিতীয় ; :L—টেলোফেজ-দ্বিতীয়।

ক. প্রথম প্রোফেজ (*First prophase*) :

1. লেপ্‌টোটিন (*Leptotene*) : এই অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলি তাদের প্যাঁচালোভাব লুপ্ত ক'রে জোড়া-জোড়া অবস্থায় নিউক্লিয়সের মধ্যে থাকে। ক্রোমোজোমগুলি স্থূল ও স্পষ্ট হতে দেখা যায়। সেণ্ট্রোমিয়ারগুলি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নিউক্লিয়োলাসও বেশ পরিষ্কার থাকে। সেণ্ট্রোসোমও অবিভক্ত থাকে। দেহকোষের 2n-সংখ্যক ক্রোমোজোমের মতো এখানেও 2n-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

2. জাইগোটিন (*Zygotene*) : স্থূল জোড়া ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর খুব কাছাকাছি এসে লম্বালম্বিভাবে সেণ্ট্রোমিয়ার বিন্দুতে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে ক্রোমোজোমগুলির **জোড়-বাঁধা অবস্থা** (*Synapsis*) বলে। জোড়ের ক্রোমোজোমগুলি গঠনে ও আকারে একই রকমের। জোড়ের দুটি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি মায়ের ধারা বহন করে এবং অপরটি পিতার ধারা বহন করে। প্রতিটি ক্রোমোজোমকে এখনও লম্বালম্বিভাবে চিরে দুটি ক্রোমাটিডে ভাগ হতে দেখা যায় না।

3. প্যাকিটিন (*Pachytene*) : এই পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলি জল-নিষ্কাশনের দ্বারা স্থূল ও খর্ব হয়ে পড়ে। জোড়া ক্রোমোজোমগুলি এই পর্যায়ে পরস্পর সম্পূর্ণ জুড়ে যায় এবং এদের তখন **বাইভালেণ্ট** (*Bivalent*) বলা হয়। জোড়ের রেখা দেখা যায়। অনেক সময় এরা **সর্পিলভাবে** (*Coil*) পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। এখন বাইভালেণ্টের বা জোড়-ক্রোমোজোমের প্রতিটি ক্রোমোজোমকে লম্বালম্বি-ভাবে চিরে যেতে দেখা যায়। অর্থাৎ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে বা একটি বাইভালেণ্টের মধ্যে **চারটি ক্রোমাটিড** (*tetrad*)-এর সৃষ্টি হয়।

4. ডিপ্লোটিন (*Diplotene*) : এই পর্যায়ে জোড় ক্রোমোজোমগুলি পরস্পরের বন্ধন-মুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু বন্ধন-মুক্ত হলেও, বা বেজোড় হলেও, কয়েকটি সংযোগ-স্থানে এদের যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এমনও দেখা গিয়েছে যে, একটি বাইভালেণ্টের মধ্যে বা জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রায় বারোটিরও বেশী **সংযোগ-স্থান** বা **যুক্তস্থান** (*Crossing over point*) থাকে। বাইভালেণ্টের যুক্তস্থানগুলিকে **ক্যায়েস্‌ম্যা** (*Chiasma*) কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। ক্রোমোজোমের ভেতর অসংখ্য রাসায়নিক বিন্দু বা **জিন** (*Gene*) থাকে। ক্যায়েস্‌ম্যা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে বাইভালেণ্টের একটি ক্রোমোজোমের জিন অন্য ক্রোমোজোমে চলে যায়। এইভাবে জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের আদান-প্রদান হয়। এর ফলে ক্রোমোজোমের বংশগত বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন হয়। এই পর্যায়ে বাইভালেণ্টের

দুই ক্রোমোজেমের মধ্যে দুয়ে-দুয়ে চারটি ক্রোমাটিড পরিষ্কার বা স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রোমোজোমের ক্যায়েস্‌ম্যার কেন্দ্রে যুক্ত থাকার বা পরস্পর অতিক্রম করার উপর বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ও বংশপরম্পরার গুণাগুণের অনেক তারতম্য দেখা দেয়।

5. **ডায়াকাইনেসিস** (*Diakinesis*)ঃ এই পর্যায়ে বাইভালেণ্টের জোড় ক্রোমোজোমগুলি আরও স্থূল, লম্বায় ছোট এবং প্যাঁচালো হয়। বাইভালেণ্টের ক্রোমোজোমগুলি নিউক্লিয়সের দু'ধারের দিকে এগিয়ে যায়।

খ. **প্রথম প্রো-মেটাফেজ** (*First Pro-Metaphase stage*)ঃ এই পর্যায়ে নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লিয়োলাসের বিলুপ্তি ঘটে। সেণ্ট্রোসোম দু'ভাগে ভাগ হয়ে **অ্যাস্টার** (*Aster*) তৈরি করে। প্রতিটি ভাগ নিউক্লিয়সের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয় এবং এদের যুক্ত ক'রে রাখে মাকুর মতো নিউক্লীয় তন্তু।

গ. **প্রথম মেটাফেজ** (*First Metaphase stage*)ঃ ক্রোমোজোমগুলি জল-সংকোচনের ফলে আরও লম্বায় ছোট হয়ে যায় এবং এদের মধ্যকার প্যাঁচগুলি খুলে যায়। দুটি মাত্র সেণ্ট্রোমিয়ারের সাহায্যে এরা পরস্পর নিউক্লীয় তন্তুর সঙ্গে আটকে থাকে। ছোট ও সোজা ক্রোমোজোমগুলি এখন নিউক্লীয় তন্তুর বিষুব-অঞ্চলে আটকে থাকে এবং এদের আকার স্পষ্ট ও উজ্জল দেখায়।

ঘ. **প্রথম অ্যানাফেজ** (*First Anaphase stage*)ঃ বাইভালেণ্ট বা জোড়া ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। বাইভালেণ্টের একটি ক'রে ক্রোমোজোম একটি দলে নিউক্লীয় তন্তু ধ'রে উত্তর মেরুর দিকে, আর দ্বিতীয় ক্রোমোজোম দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়ে নিউক্লিয়সের দক্ষিণ মেরুর দিকে ধাবিত হয়। নিউক্লীয় তন্তু লম্বা হয়ে গিয়ে ক্রোমোজোমগুলিকে মেরু অঞ্চলে টেনে নিয়ে যায়। বাইভালেণ্টের ক্রোমোজোমগুলির বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ আগেকার মতো থাকে না, ডিপ্লোটিন পর্যায়ে এদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। যদি কোন নিউক্লিয়সে বারোটি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে ছয়টি বাইভালেণ্ট বা জোড় তৈরি হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাইভালেণ্টের একটি ক'রে মোট ছয়টি ক্রোমোজোম উত্তর মেরুতে এবং সেইভাবে বাকী ছয়টি ক্রোমোজোম দক্ষিণ মেরুতে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ মোট ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুতে এবং বাকী অর্ধেক দক্ষিণ মেরুতে যায়। কোন ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে চিরে দু'ভাগ হয় না। এখানে মোট ক্রোমোজোমের সংখ্যা কমে যায় ব'লে এই ভাগকে **বিয়োজন-বিভাজন** (*Reduction division*) বলা হয়।

ঙ. **প্রথম টেলোফেজ** (*First Telophase stage*)ঃ এই পর্যায়ে উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে জমে-থাকা ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে

নিউক্লীয় জালিকা তৈরি করে। নিউক্লিয়োলাস আবার সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লীয় জালিকাকে নিউক্লীয় পর্দা আবৃত ক'রে রাখে। প্রতিটি নিউক্লিয়সের মাথার উপর বিভক্ত সেণ্ট্রোসোম দেখা যায়।

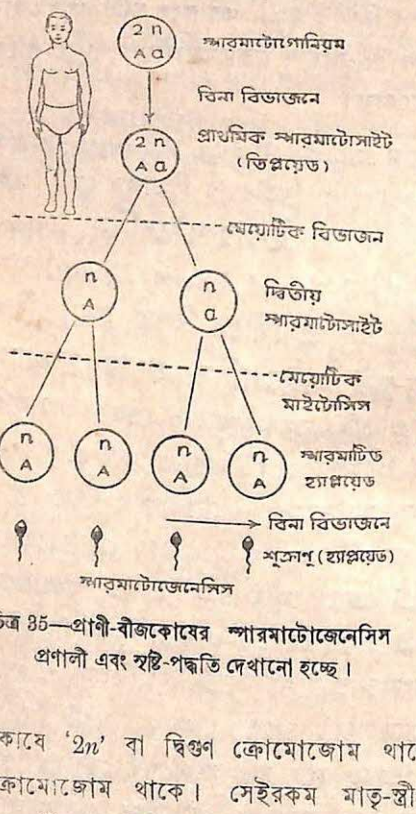
প্রথম সাইটোকাইনেসিস (*First Cytokinesis*)—কোষের মাঝামাঝি দুই দিকে নিউক্লিয়স-দুটিকে রেখে কোষপর্দায় দুটি খাঁজ পড়ে। এই খাঁজ-দুটি ধীরে ধীরে বাড়তে-বাড়তে কোষকে বিভক্ত ক'রে পরস্পর মিলিত হয়। এর ফলে দুটি সম্পূর্ণ কোষ তৈরি হয়। এই কোষের মধ্যে এখন আর $2n$-সংখ্যক ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে না, থাকে তার অর্ধেক বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোম।

দ্বিতীয় মেয়োটিক কোষ-বিভাজন (*Second Meiotic division*)—অর্ধেক বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট অপত্য-কোষগুলি দ্বিতীয়বার বিভাজন হয়। এই বিভাজনকে দ্বিতীয় মেয়োটিক কোষ-বিভাজন বা **ইণ্টারকাইনেসিস** (*Inter-kinesis*) বা **দ্বিতীয় মেয়োটিক মাইটোসিস** (*Second Meiotic Mitosis*) বলা হয়। **দেহকোষ সাধারণভাবে মাইটোসিস প্রণালীতে বিভক্ত হয়। ঠিক সেইভাবে উপরোক্ত অপত্য-কোষ-দুটি মাইটোসিস প্রথায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়।** আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি ক্রোমোজোমের ভেতরে লম্বালম্বি চিড় থাকে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোম এই চিড়ের দ্বারা দুটি লম্বা ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। এই বিভাগেও প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ পর্যায়ে ভাগ হয়। মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলি ক্রোমাটিডে খুলে গিয়ে নতুন ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। প্রতিটি অপত্য-কোষে ছয়টি ক্রোমোজোম এখন আবার বারোটিতে পরিণত হয় এবং এর অর্ধেক অর্থাৎ ছয়টি উত্তর মেরুতে এবং বাকী অর্ধেক দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে জমা হয়। পরে প্রতিটি অপত্য-কোষ আবার দুটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয় এবং প্রতিটি নিউক্লিয়সে ছয়টি ক্রোমোজোম থাকে। এখন কোষটি দ্বিতীয় **সাইটোকাইনেসিস** প্রথায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষের সৃষ্টি করে। একটি বীজকোষ বা যৌনকোষ হতে (যার মধ্যে '$2n$' বা দ্বিগুণ ক্রোমোজোম ছিল) চারটি 'n' বা অর্ধেক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট সক্রিয় কোষের সৃষ্টি হয়।

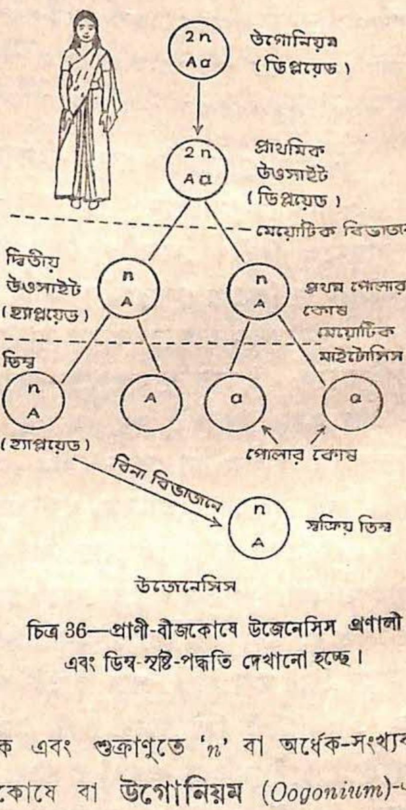
মেয়োসিসের তাৎপর্য :

উদ্ভিদের **মাতৃ-রেণু-কোষ** (*Sperm mother cell*) হতে এই মেয়োসিস-প্রথায় **জনন-নিউক্লিয়স** (*Generative nucleus*) তৈরি হয়। ঠিক একই ভাবে ডিম্বকের মধ্যে **ডিম্বাণু** (*Ovum*) তৈরি হয়। উপরোক্ত দুটি কোষে n-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে

এবং এদের নিষেকে আবার স্বাভাবিক $2n$-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট কোষের সৃষ্টি হয়। এই কোষের ক্রমাগত বিভাজনের ফলে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। প্রাণিজগতে **মাতৃ-শুক্রাণু-কোষ** (*Spermatogonium*) চারটি সক্রিয় n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট শুক্রাণু (*Sperm*)-তে পরিণত হয়। মাতৃ-শুক্রাণু-কোষ থেকে যে পদ্ধতিতে শুক্রাণু তৈরি হয় তাকে **স্পারমাটোজেনেসিস** (*Spermatogenesis*) বলা হয়। স্পারমাটোগোনিয়ম



চিত্র 35—প্রাণী-বীজকোষের স্পারমাটোজেনেসিস প্রণালী এবং সৃষ্টি-পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে।



চিত্র 36—প্রাণী-বীজকোষে উজেনেসিস প্রণালী এবং ডিম্ব-সৃষ্টি-পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে।

কোষে '$2n$' বা দ্বিগুণ ক্রোমোজোম থাকে এবং শুক্রাণুতে 'n' বা অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। সেইরকম মাতৃ-স্ত্রীকোষে বা **উগোনিয়ম** (*Oogonium*)-এ মেয়োসিস-পদ্ধতিতে বিভক্তির ফলে চারটি 'n' বা অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট ডিম্ব তৈরি হয়। এর মধ্যে তিনটি ডিম্ব সক্রিয় বা কার্যকরী হয় না, কেবলমাত্র একটি ডিম্ব সক্রিয় এবং কার্যকরী হয়। উগোনিয়ম-কোষে ডিম্ব-সৃষ্টির পদ্ধতিকে **উজেনেসিস** (*Oogenesis*) বলা হয়। n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট শুক্রাণু n-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট ডিম্বকে নিষেক করে ; ফলে $2n$-সংখ্যক ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট ভ্রূণ (*Embryo*) কোষের সৃষ্টি হয়। ভ্রূণকোষের ক্রমাগত কোষ-বিভাজনে প্রতিটি প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ রূপ

বিকাশলাভ করে। মানুষের এই একই পদ্ধতিতে তার একটি ভ্রূণকোষের বিভাজনের বাস্তব রূপ।

মেয়োসিসে প্রতিটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক থাকে। এই পদ্ধতিতে পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজোমের গঠনে ও গুণাগুণে পরিবর্তন হওয়ায় প্রতিটি **বংশধারায়** (*Generation*) পরিবর্তন আনে। মেয়োসিস-প্রথায় প্রতি বংশধারায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে না। ফলে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সর্বকালের জন্য সাধারণভাবে একই থাকে। শুক্রাণু ও ডিম্বের ভেতরকার ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় এদের মিলনে সৃষ্ট অপত্যে মিশ্র-চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে মেয়োসিসের জন্য মিশ্র বা বিভিন্ন পরিবৃত্তিসম্পন্ন অপত্যের জন্ম হয়। মেয়োসিসে ক্রোমোজোমগুলি খানিকটা স্বাধীনভাবে সঞ্চালন এবং সাথী নির্বাচন করতে পারায় অসংখ্য নতুন বৈশিষ্ট্যের অপত্য-জন্মলাভের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধি ও জনন

(Growth and Reproduction)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি (Growth of Plants) : বৃদ্ধি সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য। সজীব তার ভেতরকার কোষগুলির বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করে। কোষ-বিভাজন কি-ভাবে হয় তা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। ক্রমাগত কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্য। দেহের বিপাকীয় কাজই সজীবকে বৃদ্ধির জন্য শক্তি যোগায়। সালোকসংশ্লেষ ও পরিপাক সজীবের **বৃদ্ধিকারী বিপাকীয় কাজ** (*Anabolic activities of metabolic process*), আবার শ্বসন-পদ্ধতি সজীবের সঞ্চিত খাদ্যকে দগ্ধ ক'রে তা থেকে শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে কোষের বিভাজন হয়। ফলে, দেহের পরিবর্তন আসে ও দেহের পরিপূর্ণতা ফুটে ওঠে। এই শ্বসন-পদ্ধতি সজীবের **ধ্বংসকারী বিপাকীয় কাজ** (*Katabolic activities of metabolic process*) বলা হয়। এতে দেহক্ষয় হয় ও সজীবের ওজনও কমে যায়। বৃদ্ধিকারী এবং ধ্বংসকারী বিপাকীয় কাজ সজীবের দেহের ভেতর সবসময় সম্পাদিত হচ্ছে। সাধারণতঃ সজীবের দেহে ধ্বংসকারী প্রক্রিয়াগুলির চেয়ে বৃদ্ধিকারী প্রক্রিয়াগুলির কাজ বেশী হয়। ফলে, সজীব কোষ-বিভাজনের সাহায্যে শক্তি যোগাতে পারে এবং নতুন নতুন সাইটোপ্লাজম-পূর্ণ কোষের সৃষ্টি হয়। কোষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সজীবের বৃদ্ধি হয় এবং সজীবের গঠন ও আকৃতিতে পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনই সজীবের **বৃদ্ধি** (*Growth*) নামে প্রচলিত। দেহের পুরাতন কোষগুলি কাজ করতে করতে অক্ষম হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোষ-বিভাজনের ফলে নতুন সক্ষম কোষের সৃষ্টি হয়। এরা দেহের কাজ চালিয়ে যায়। তাই সজীবের দেহে প্রতিক্ষণই হাজার হাজার কোষের মৃত্যু হচ্ছে, আবার একই সময়ে হাজার হাজার কোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এই কোষের মৃত্যু ও সৃষ্টির মাধ্যমে সজীব তার সজীবতার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে স্বাভাবিকভাবে জীবন-নির্বাহ করে। এককোষী উদ্ভিদ্ বা প্রাণীগুলির কোষবৃদ্ধিই উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর বৃদ্ধি। একটি কোষের সূচনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি একত্র ক'রে যা দাঁড়ায় সেটি কোষের বৃদ্ধি। বৃদ্ধির তিনটি দশা বা অবস্থা আছে। যথা :

(ক) **কোষ-বিভাগ দশা** (*Phase of cell-division* or *Formative phase*) : এই দশায় কোষগুলির মাইটোসিস-প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিভাগের দ্বারা বহু

নতুন কোষের সূচনা করে। সাধারণতঃ উদ্ভিদের **অজক-কলা অঞ্চলের** (*Meristematic regions*) কোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হয়। উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অগ্রাংশের অজক-কলার কোষগুলির দ্রুত বিভাগ-জনিত বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্ আকারে লম্বা হয়।

(খ) **দীর্ঘকরণ দশা** (*Phase of elongation*)ঃ এই দশায় কোষগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে বড় হয় এবং এর দ্বারা প্রচুর কোষ-গহ্বরের সৃষ্টি হয়। কোষ-প্রাচীরের প্রসারণে যখন এর পরিধি বৃদ্ধি পায়, তখন সমস্ত কোষ-গহ্বরগুলি একত্র হয়।

(গ) **বিভেদ দশা** (*Phase of differentiation* or *Phase of maturation*)ঃ কোষগুলির বৃদ্ধি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ এদের আকার ও গঠনের আর কোন পরিবর্তন যখন হয় না, তখন কোষ-প্রাচীরের নানারকমের বৃদ্ধি দ্বারা বিবিধ কোষ-কলার বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার (*Rate of Growth of plants*)ঃ উদ্ভিদের যে-কোন অঙ্গের বৃদ্ধির হার খুব ধীরে ধীরে হয় এবং সেটি উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারাই কেবল পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কুমড়ো গাছের কর্ষিকা বা বাঁশগাছের আগার বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয় এই ধরনের বৃদ্ধি সব সময়ে সমানভাবে হয় না। বৃদ্ধির হার প্রথমে অতি ধীরে আরম্ভ হয় এবং পরে বৃদ্ধির গতি বাড়তে বাড়তে এর হার সবচেয়ে বেশী হয় এবং শেষে বৃদ্ধি হ্রাস পেতে পেতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে, অর্থাৎ উদ্ভিদের কোনও অঙ্গ পূর্ণতা-প্রাপ্ত হলে, সে অঙ্গের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। বৃদ্ধির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সময়টুকুকে অঙ্গের **মুখ্য বৃদ্ধিকাল** (*General period of growth*) বলা হয়।

উদ্ভিদ্‌কাণ্ডের অগ্রভাগের বৃদ্ধি বেশী হয়। **আর্ক-ইণ্ডিকেটর** বা **অক্সানোমিটার** যন্ত্রের সাহায্যে কাণ্ডের অগ্রভাগের বৃদ্ধি মাপা যায়। প্রমাণিত হয়েছে যে বৃদ্ধি সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়, রাতে ধীরে ধীরে বাড়ে ও ভোরে সবচেয়ে বেশী হয়। প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টায় উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের বৃদ্ধির হারকে দৈনিক বৃদ্ধি (*Daily period of growth*) বলা হয়। সেইরকম উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের বৃদ্ধিও মাপা যায়। এক ইঞ্চি পরিমাণ অঙ্কুরিত মূলের অগ্রভাগকে **স্পেশ-মেকারের** সাহায্যে মিলিমিটার ব্যবধানে কালি দিয়ে দাগ ক'রে সেটি দুই-মুখ-বিশিষ্ট কাঁচের জারের সাহায্যে ঝুলিয়ে রেখে দেখা যায় যে **মূলের ঠিক অগ্রাংশের পিছনের অঞ্চলে বৃদ্ধি বেশী হয়।**

বৃদ্ধির জন্য দরকারঃ

(১) **আলোক** (*Light*)ঃ আলোকের বিভিন্ন রূপ আছে। কখনও আলোক

তীব্র, আবার কখনও এটি বহুক্ষণ স্থিতিলাভ করে। আবার ম্লান আলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অন্যপ্রকার হয়। সুতরাং আলোকের বিবিধ অবস্থা উদ্ভিদের বৃদ্ধি-পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে ; যথা—(i) **আলোকের উগ্রতা** (*Intensity of light*)—আলোকের উগ্রতা সামান্য বাড়লে কোষ-বিভাজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি-হার দ্রুত হয়। (ii) **আলোকের প্রকারভেদ** (*Quality of light*)—আলোকের সাতটি রঙের মধ্যে লাল ও নীল রঙে উদ্ভিদের কোষ-বিভাজনের হার বৃদ্ধি পায়, অথচ কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় না। কেবলমাত্র আলোকের লাল রঙ উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করলে, তার কোষের আয়তনের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। (iii) **আলোকের স্থিতিকাল** (*Duration of light*)—উদ্ভিদের ফুল-ধারণের সময় নির্ভর করে আলোকের স্থিতির উপর এবং প্রতিটি উদ্ভিদে এইরূপ স্থিতিকালের পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের উপর আলোকের স্থিতিকালের প্রতিক্রিয়াকে **ফোটোপিরিওডিজ্‌ম** (*Photoperiodism*) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোকের মধ্যে লম্বা-লম্বা লাল রঙের রশ্মি দ্বারাই পাতার মধ্যে **ফ্লোরিজেন** (*Florigen*) নামে একরকমের হরমোনের সৃষ্টি হয়। এই হরমোন কাণ্ডের শীর্ষাগ্রে বা কক্ষে ফুল প্রস্ফুটিত করার জন্য নতুন নতুন কোষের সূচনা করে। (iv) **আলোকের গতি** (*Direction of light*)—আলোকের দিকে উদ্ভিদের বিটপ অংশ ধাবিত হয় এবং মূলের অংশ আলোকের গতির বিপরীত দিকে বা অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। আলোক ক্লোরোফিল বা সবুজকণা বৃদ্ধি করে ও সালোকসংশ্লেষে সহায়তা করে। আলোকের অভাবে উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও লম্বা হয়ে যায় এবং পাতাগুলি **পাণ্ডুর** (*Etiolated*) হয়ে যায়।

(২) **তাপ** (*Heat*) ঃ তাপ উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ 4°C হতে 40°C পর্যন্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা 25°C হতে 30°C এবং দুটি তাপমাত্রার হারের মধ্যেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণিত হয়েছে যে, 29°C তাপে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশী হয়।

(৩) **অক্সিজেন** (*Oxygen*) ঃ শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যগুলি অক্সিজেন দ্বারা দহিত হয়। দহনের ফলে শক্তি নির্গত হয় এবং এই শক্তিই বৃদ্ধির উৎস।

(৪) **জল** (*Water*) ঃ জলই জীবের জীবন, যৌবন। প্রতিটি শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য জল অত্যাবশ্যক। বাষ্পমোচন, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াগুলি জলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পরোক্ষভাবে প্রক্রিয়াগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে সহায়তা করে। মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতা উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) **উদ্দীপক বা হরমোন** (*Hormone*) : উদ্ভিদের যে-সব স্থানের বৃদ্ধির দরকার বা প্রয়োজন হয়, সে-সব স্থানের সাইটোপ্লাজম হতে একরকমের জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ নির্গত হয়। এদের **বৃদ্ধি-উদ্বোধক** (*Growth hormone*) বা **অক্সিন** (*Auxin*) বলা হয়। অক্সিন ও অন্যান্য উদ্ভিদ্-হরমোনের বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) **উৎসেচক** (*Enzyme*) : বিবিধ উৎসেচকও কোষের সাইটোপ্লাজম হতে নির্গত হয়। এরা প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না ; পরোক্ষভাবে হরমোনকে প্রভাবিত ক'রে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

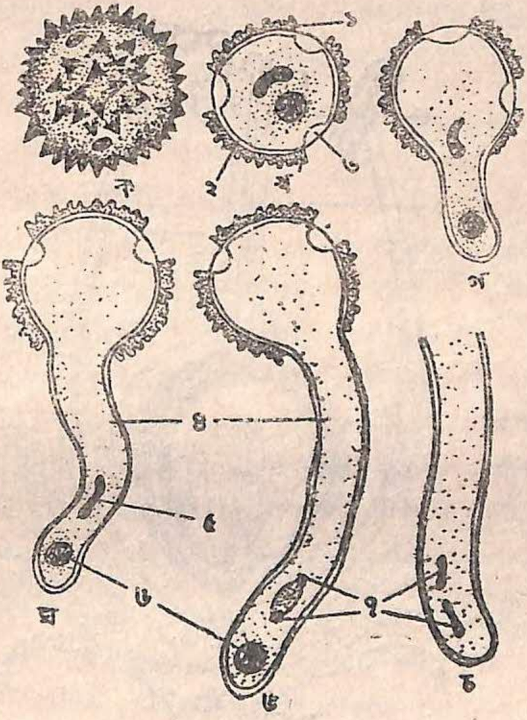
উদ্ভিদের জনন (Reproduction of Plants) : ফুলই উদ্ভিদের জনন-অঙ্গ। পুংকেশর ও গর্ভপত্রে যথাক্রমে রেণু ও ডিম্বাণু থাকে। এই দুটির সংযোগে বীজের উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি, পিঁপড়ে, বায়ু, মৌমাছি প্রভৃতি পুংকেশরের রেণু বহন ক'রে সেটিকে ফুলের গর্ভপত্রের ভিতর প্রবেশ করায়। এর ফলে ডিম্বাণুর **নিষেক** (*Fertilization*) হয়। প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি প্রাণীরা পরাগ-সংযোগ করায় ডিম্বাণুর নিষেক হয় এবং নিষেক পূর্ণতালাভ করলে, প্রতিটি ডিম্বক বীজে রূপান্তরিত হয়। বীজ পরিপক্ব হলে, সেটি মাটিতে পড়ে যায় এবং তা থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বংশ-বৃদ্ধি ফুলের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। একে **যৌন-জনন-প্রণালী** (*Sexual reproduction*) বলা হয়। অনেক একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বংশ-বৃদ্ধি যৌন-জনন-প্রণালী ছাড়াও সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা বা মূল থেকেও নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। জবা, করবী, জংলী গোলাপ ইত্যাদি গাছের শাখা কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে, শাখার শেষাগ্র থেকে মূল বের হয় ও শাখাটি একটি নতুন গাছে পরিণত হয়। আদা বা আলু কেটে-কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে, যথাক্রমে নতুন আদা বা আলু গাছের উৎপত্তি হয়। পাথরকুচি ও ফণিমনসা গাছের পাতা মাটিতে পুঁতে দিলে, সেই পাতা থেকে অনেকগুলি পাথরকুচি ও ফণিমনসা গাছের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের উদ্ভিদের বংশ-বৃদ্ধির মধ্যে যৌন অঙ্গের বা ফুলের কোন যোগ নেই, তাই উপরোক্ত প্রণালীর দ্বারা বংশ-বৃদ্ধিকে **অযৌন-জনন-প্রণালীর** (*Asexual*) দ্বারা বংশ-বৃদ্ধি বলা হয়। উদ্ভিদের দেহ থেকে বা দেহের বিবিধ অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় ব'লে এদের **অঙ্গজ-জনন** (*Vegetative reproduction*) প্রথা অনুযায়ী বংশ-বৃদ্ধি বলা হয়।

অঙ্গজ-জনন-প্রণালী ঃ

(1) ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে আদা, আলু, পেঁয়াজ, ওল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ নতুন গাছের উৎপত্তি করে। আদার রাইজোম, আলুর টিউবার, পেঁয়াজের বাল্‌ব ও ওলের করমের সাহায্যে নতুন বিটপ মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে নতুন গাছের সৃষ্টি করে। ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের মুকুলের সাহায্যে এটি কার্যকরী হয়। (2) ডালিয়া, শতমূলী ও রাঙা-আলুর **রসাল মূলের** সাহায্যে মূল হতে নতুন উদ্ভিদ্ জন্মে। (3) অস্থানিক মুকুলের সাহায্যে মূল হতে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। পাথরকুচির **পত্রাশয়ী** মুকুল, পটলের মূলজ মুকুল, গোলাপ বা জবা গাছের কাণ্ডজ মুকুল হতেও নতুন উদ্ভিদ্ সৃষ্টি হয়। পাথরকুচির পাতা, পটলের মূল এবং গোলাপের ডাল কেটে মাটিতে বসালে, নতুন উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। (4) **অর্ধ-বায়ব-কাণ্ড**-বিশিষ্ট দুর্ব্বল লতানে উদ্ভিদের পর্বের উপর থেকে পাতা এবং নিচ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। এদের পর্বমধ্যগুলি নষ্ট হয়ে গেলে, প্রতিটি পর্বই একটি ক'রে নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়। আমরুল, সুষ্‌নি, কলমী প্রভৃতি ধাবক, চন্দ্রমল্লিকার ঊর্ধ্বধাবক এবং কচুরিপানা ও বড় পানার প্ররোহের সাহায্যে নতুন গাছ জন্মায়। (5) এককোষী ঈস্ট উদ্ভিদ্ কোরকোদ্গমের সাহায্যে নতুন কোষের সৃষ্টির দ্বারা নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। (6) **কৃত্রিম** উপায়ে **কাটিং**-এর সাহায্যে এবং নানাপ্রকার **কলমের** সাহায্যে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। গাঁদা, জবা, গোলাপ প্রভৃতি উদ্ভিদের শাখা কেটে মাটিতে বসিয়ে দিলে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। **দাবা-কলম, শাখা-কলম** ও **জোড়-কলম**—এই তিন-প্রকার কলমের সাহায্যে প্রচুর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। গাছের শাখা মাটিতে ঢুকিয়ে সেটি ভারী জিনিস দিয়ে চেপে রেখে দিলে, কয়েক মাসের মধ্যে শাখার মাটির ভিতরকার অংশ হতে মূল বের হয়। মূল-সমেত শাখাটি কেটে নিলে একটি নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। একে **দাবা-কলম** বলে। গাছের ডাল থেকে ছাল বের ক'রে তাতে সারমাটি দিয়ে বেঁধে দিলে, ঐ অংশ থেকে মূল বের হয়। এটি **শাখা-কলম**।

ফুলের গর্ভাধান বা **নিষেক** (*Fertilization*)ঃ আমরা জানি, ডিম্বকের মধ্যে ডিম্বাণু বা স্ত্রী-জনন-কোষ থাকে এবং পরাগরেণুর ভিতর পুং-জনন-কোষ থাকে। এই দুটি বিসদৃশ জনন-কোষের সংযোগকে গর্ভাধান বা নিষেক বলা হয়। গর্ভাধানের ডিম্বাণুটি বীজে পরিণত হয়। পরাগরেণুগুলি গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হবার পরে এগুলি গর্ভমুণ্ড হতে নির্গত রসে আটকে যায়। গর্ভমুণ্ডের রসের উৎসেচকই পরাগরেণু-গুলিকে অঙ্কুরোদ্গম করতে প্রেরণা দেয়। পরাগরেণুর বাইরের স্থূল, কর্কশ আবরণটিকে

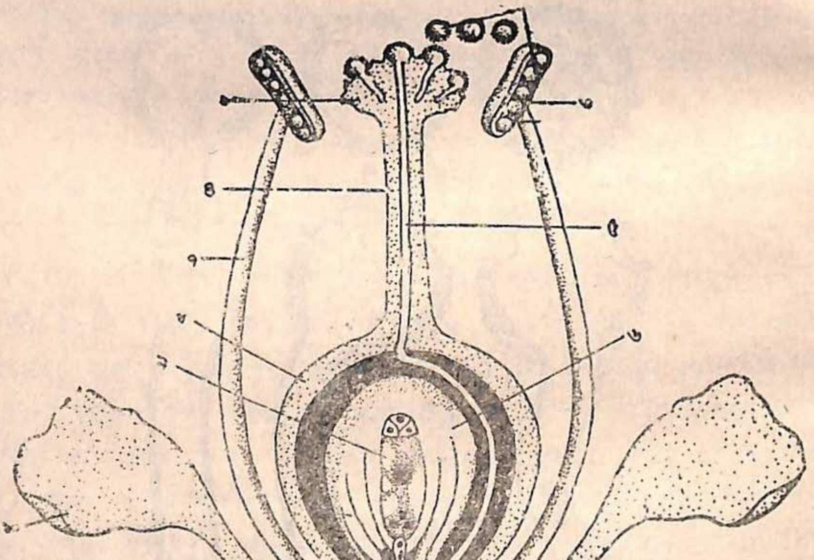
রেণু-বহিস্ত্বক্ (*Extine*) এবং ভিতরের সূক্ষ্ম আবরণটিকে **রেণু-অন্তস্ত্বক** (*Intine*) বলা হয়। রেণু-বহিস্ত্বক্ পরাগরেণুকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত করে না। কতকগুলি বৃত্তাকার অংশ পাতলাই থেকে যায়। এই পাতলা অংশগুলিকে **রেণু-রন্ধ্র** (*Germpore*) বলে। রেণু প্রথমতঃ গর্ভমুণ্ডের রসে ফুলে ওঠে এবং এর যে-কোন একটি রেণু-রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে একটি ছোট নল ধীরে ধীরে বের হয়ে আসে। এই নলটিকে **পরাগ-**



চিত্র 37—পরাগরেণু হতে পুং-জনন-কোষ কি-ভাবে হয়, তা দেখানো হয়েছে। ক. পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণু ; খ. পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণুর লম্বচ্ছেদ ; গ. পরাগরেণু হতে পরাগ-নালিকার ক্রমবিকাশ ; ঘ—চ. পরাগ-নালিকার বিবিধ অবস্থা। ১. রেণু-বহিস্ত্বক্ ; ২. রেণু-অন্তস্ত্বক্ ; ৩. রেণু-রন্ধ্র ; ৪. পরাগ-নালিকা ; ৫. জনন-নিউক্লিয়স ; ৬. বৃদ্ধি-নিউক্লিয়স ; ৭. কোষ-বিভক্তি দ্বারা জনন-নিউক্লিয়সের পুং-জনন-নিউক্লিয়সে পরিণতি।

নালিকা (*Pollen tube*) বলা হয়। রেণুর ভেতরে **রেণু-মাতৃকোষ** (*Sperm mother cell*) থাকে। এই কোষটি মেয়োসিস কোষ-বিভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী দুই নিউক্লিয়সে

বিভক্ত হয়। অপত্য-নিউক্লিয়স-ছুটি আকারে অসমান। বড় নিউক্লিয়সটিকে **নালিকা-নিউক্লিয়স** বা **বৃদ্ধি-নিউক্লিয়স** (*Tube-nucleus* or *Vegetative nucleus*) বলা হয়, অপর ক্ষুদ্র ও বক্র নিউক্লিয়সকে **জনন-নিউক্লিয়স** (*Generative nucleus*) বলা হয়। পরাগ-নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে ভ্রূণ-পোষকে পৌঁছায়। ভ্রূণ-পোষকে পৌঁছবার পরে এর অগ্রভাগ ফেটে যায় এবং নালিকা-নিউক্লিয়সটি ভ্রূণস্থলীর সংস্পর্শে



চিত্র ৩৪—রেখাচিত্রের দ্বারা গর্ভাধান-পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।
১. পরাগরেণু; ২. গর্ভমুণ্ড; ৩. পরাগধানী; ৪. গর্ভদণ্ড; ৫. পরাগ-নালিকা; ৬. ভ্রূণ-পোষক; ৭. পুংদণ্ড; ৮. গর্ভাশয়; ৯. গর্ভস্থলী; ১০. পাপড়ি; ১১. বৃত্যংশ; ১২. পুষ্পাক্ষ।

এসে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই সময়ে জনন-নিউক্লিয়সটি ছুটি **পুং-জনন-নিউক্লিয়সে** বিভক্ত হয়। **পুং-জনন-নিউক্লিয়স** (*Male pronucleus*)-ছুটি ডিম্বকের ভ্রূণস্থলীর ভেতর প্রবেশ করে। এই সময় ভ্রূণস্থলীর ভিতরকার সহবাসী ও **প্রতিবাদ-কোষ-সমষ্টিগুলি** (*Synergids and antipodal cells*) দ্রবীভূত হয়ে যায়। কেবলমাত্র

ডিম্বাণু (*Oosphore*) ও **ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়স** (*Definitive nucleus* or *Secondary nucleus*) ভ্রূণস্থলীর ভেতর থাকে। দুটি নিউক্লিয়সের মধ্যে একটি ডিম্বাণু বা স্ত্রী-জনন-নিউক্লিয়সের সঙ্গে মিলিত হয় এবং অপরটি ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের সঙ্গে মিলিত হয়। পুং-জনন-নিউক্লিয়সের সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনে বীজের সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় পুং-জনন নিউক্লিয়সের সহিত ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের মিলনের ফলে **সস্য-নিউক্লিয়স** (*Endosperm*)-এর উৎপত্তি করে। বীজ হতেই নতুন উদ্ভিদের শুরু।

থ্যালোফাইটার শ্যাওলা বা অ্যালজী ও ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদের জনন নানা পদ্ধতিতে হয়। **স্পাইরোগাইরা অঙ্গজ-জনন-প্রণালীর** দ্বারা সাধারণতঃ বংশবৃদ্ধি

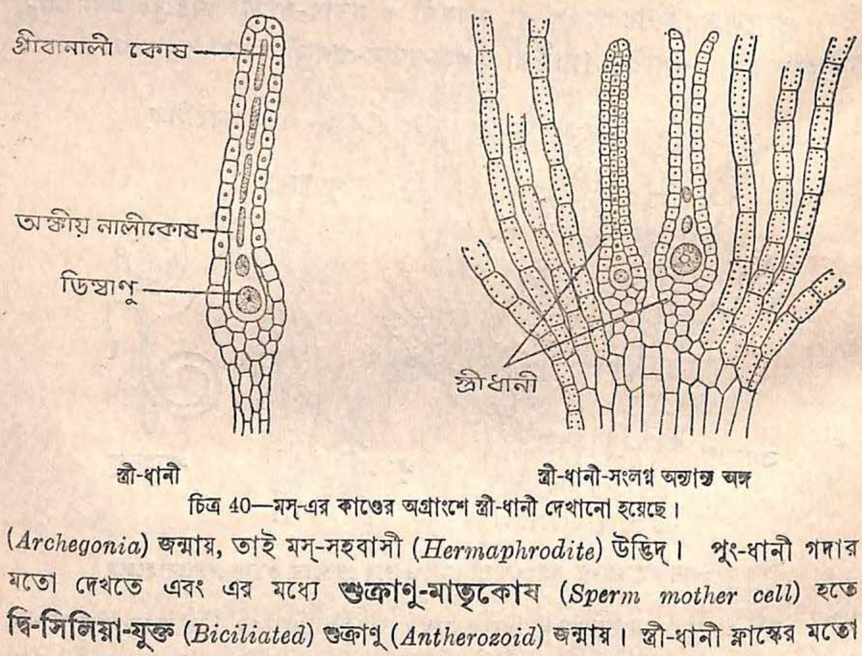


চিত্র 39—মস্-এর কাণ্ডের অগ্রাংশে পুং-ধানী ও তার ভেতরের শুক্রাণু দেখানো হয়েছে।

করে। দুটি কোষের মাঝের পর্দা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কোষের নিউক্লিয়স-বিভাজনের দ্বারা অনেকগুলি নতুন কোষের সৃষ্টি করে। কোষগুলি আলাদা হয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। স্পাইরোগাইরা **যৌন প্রক্রিয়ায়ও** (*Sexual reproduction*) বংশবৃদ্ধি করে। দুটি স্পাইরোগাইরা লম্বালম্বিভাবে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি **সংশ্লেষ-নালীর** (*Conjugation tube*) দ্বারা যুক্ত হয়। একটি স্পাইরোগাইরার প্রতি কোষের সাইটোপ্লাজম অপর স্পাইরোগাইরার সম্মুখ-কোষের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে মিলিত হয় এবং **জাইগোস্পোর** (*Zygospore*) তৈরি করে। জাইগোস্পোর থেকে নতুন স্পাইরোগাইরার উৎপত্তি হয়। যৌন-জননে বিফল হলে, স্পাইরোগাইরার প্রতিটি কোষ আপনা হতেই এক-একটি গ্যামেটে পরিণত হয় এবং গ্যামেটগুলিকে **অ্যাজাইগোস্পোর** (*Azygospore*) বলে। অ্যাজাইগো-

স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমে নতুন স্পাইরোগাইরা উৎপন্ন হয়। এই ধরনের জননকে **অপুংযোনি** (*Parthenogenesis*) জনন-প্রণালী বলা হয়।

ব্রাওফাইটা-শ্রেণীভুক্ত **মস্**-উদ্ভিদে জনন-প্রণালী **যৌন-জনন-প্রক্রিয়া**র দ্বারা সম্পাদিত হয়। এদের শাখার কক্ষে ও পাতার ভেতরে যৌন-জনন-অঙ্গ জন্মায়। পূর্ণাঙ্গ মস্-উদ্ভিদ্ যৌন-জনন-অঙ্গ ধারণ করে, তাই একে **গ্যামেট-ধারী** (*Gametophyte*) উদ্ভিদ্ বলা হয়। একই মস্-উদ্ভিদে **পুং-ধানী** (*Antheridia*) এবং **স্ত্রী-ধানী**



স্ত্রী-ধানী   স্ত্রী-ধানী-সংলগ্ন অন্যান্য অঙ্গ

চিত্র 40—মস্-এর কাণ্ডের অগ্রাংশে স্ত্রী-ধানী দেখানো হয়েছে।

(*Archegonia*) জন্মায়, তাই মস্-সহবাসী (*Hermaphrodite*) উদ্ভিদ্। পুং-ধানী গদার মতো দেখতে এবং এর মধ্যে **শুক্রাণু-মাতৃকোষ** (*Sperm mother cell*) হতে **দ্বি-সিলিয়া-যুক্ত** (*Biciliated*) শুক্রাণু (*Antherozoid*) জন্মায়। স্ত্রী-ধানী ফ্লাস্কের মতো দেখতে এবং এর নিচের ফোলা অঞ্চলে **ডিম্বাণু** (*Ovum*) থাকে। শুক্রাণু সাঁতার কেটে স্ত্রী-ধানীর ভেতর ঢুকে প'ড়ে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। এর ফলে **উস্পোর** (*Oospore*) উৎপন্ন হয়। উস্পোরের কোষ-বিভাজনের ফলে লম্বা স্পোরোগোনিয়মের সৃষ্টি হয়। **স্পোরোগোনিয়মের** (*Sporogonium*) মাথায় একটি থলির মতো **ক্যাপসিউলের** (*Capsule*) উৎপত্তি হয়। এই ক্যাপসিউলের ভেতর **রেণু-ধারণ কলা** (*Sporogenous tissue*) জন্মায়। মেয়োসিস কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা



চিত্র 41—ফার্ন উদ্ভিদের সোরাস।

প্রতিটি মাতৃ-রেণু-কোষ থেকে চারটি রেণু উৎপন্ন হয়। রেণুর অঙ্কুরোদ্গমে একটি বহু-শাখাবিশিষ্ট সবুজ **প্রোটোনিমা** (*Protonema*) নামে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। প্রোটোনিমার পার্শ্বীয় মুকুল হতে এক-একটি পূর্ণাঙ্গ মস্-উদ্ভিদ্ জন্মায়।

টেরিডোফাইটা-শ্রেণীভুক্ত **ফার্ন** একটি স্পোর-বিশিষ্ট স্পোরোফাইট উদ্ভিদ্। এদের যৌগিক পাতার পেছনদিকে শিরার উপরে হলদে রঙের **সোরাই** (*Sori*) জন্মায়। সোরাই-যুক্ত পত্রককে **রেণু-পত্র** (*Sporophylls*) বলা হয়। সোরাসের মধ্যে



চিত্র 42—ফার্ন উদ্ভিদের পুং-ধানী, শুক্রাণু এবং স্ত্রী-ধানী ও ডিম্বাণু দেখানো হয়েছে।

অনেকগুলি **রেণুস্থলী** (*Sporangia*) থাকে। রেণুস্থলীর ভেতর অনেকগুলি রেণু-মাতৃকোষ থাকে। প্রতিটি রেণু-মাতৃকোষ মেয়োসিস কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়া দ্বারা চারটি রেণুতে পরিণত হয়। রেণু মাটিতে প'ড়ে চ্যাপটা, সবুজবর্ণের তাম্বুলাকার (Heart-shaped) **প্রোথ্যালাসের** (*Prothallus*) উৎপত্তি করে। প্রোথ্যালাসে দুইরকমের জনন-অঙ্গ জন্মায়। পুং-জনন-অঙ্গগুলিকে **পুং-ধানী** (*Artheridia*) বলা হয়। স্ত্রী-জনন-অঙ্গগুলিকে **স্ত্রী-ধানী** (*Archegonia*) বলা হয় ও সেটি প্রোথ্যালাসের খাঁজের ঠিক তলদেশে জন্মায়। পুং-ধানীর সিলিয়া-যুক্ত শুক্রাণু স্ত্রী-ধানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে **উস্পোরের** (*Oospore*) উৎপত্তি করে। প্রোথ্যালাসের ভেতর থেকেই উস্পোরের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এর ফলে ফার্নের **রেণুধর উদ্ভিদ্** (*Sporophytic plant*) জন্মায়। মস্ ও ফার্নের গ্যামেটোফাইট অধ্যায় **যৌন-জনন** এবং স্পোরোফাইট অধ্যায় **অযৌন-জনন**।

প্রাণীর বৃদ্ধি ও জননের গোড়ার কথা: প্রাণীদের বৃদ্ধি সারা দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সমান কার্যকরী হয়। এদের বৃদ্ধি জন্মাবস্থা থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ণাঙ্গের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয় এবং পরে আর বৃদ্ধি হয় না। **বৃদ্ধির হার** জন্মের অব্যবহিত পরে দ্রুতহারে হয়। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হারও কমতে থাকে।

শিশুর দেহ ভূমিষ্ঠ হবার তিন বছর পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরে উচ্চতার বৃদ্ধি কিছুটা কমে যায় কিন্তু অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি চলে। বারো থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি আবার দ্রুত হয় এবং পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি স্থায়ী হয়। অমেরুদণ্ডী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের **পুনরুৎপাদন ক্ষমতা** থাকে। দেহের কোন অংশ বা অঙ্গ বিনষ্ট হলে সেটি আবার গঠিত হয়। নষ্ট অঙ্গ আবার নতুন ক'রে তৈরি করার ক্ষমতাকে **পুনরুৎপাদন ক্ষমতা** বলে। হাইড্রার দেহকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে রাখলে, দেখা যায় যে, প্রতিটি টুকরো এক-একটি নতুন হাইড্রায় পরিণত হয়েছে। তেমনি **কেঁচোকে** দুই টুকরো ক'রে দিলে প্রতিটি টুকরো হতে নতুন কেঁচোর সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে, **তারা মাছের** যে-কোন বাহু ছিন্ন হয়ে গেলে, তা-থেকে আবার পাঁচ-বাহুবিশিষ্ট তারামাছের সৃষ্টি হয়।

জননঃ জীবের নানা ধর্মের মধ্যে জনন একটি প্রধান ধর্ম। জীবের মৃত্যু অনিবার্য। তাই জীব বংশ-বৃদ্ধির জন্য তাদেরই মতো নতুন জীবের জন্মদান করে। নতুন জীবের জন্ম দিয়ে জীব নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং পৃথিবীতে স্থায়িভাবে নিজ নিজ স্থান দখল ক'রে রাখে। জীব পূর্ণাঙ্গ হলে জনন-প্রণালীর মাধ্যমে জনন-কার্য সম্পন্ন করে।

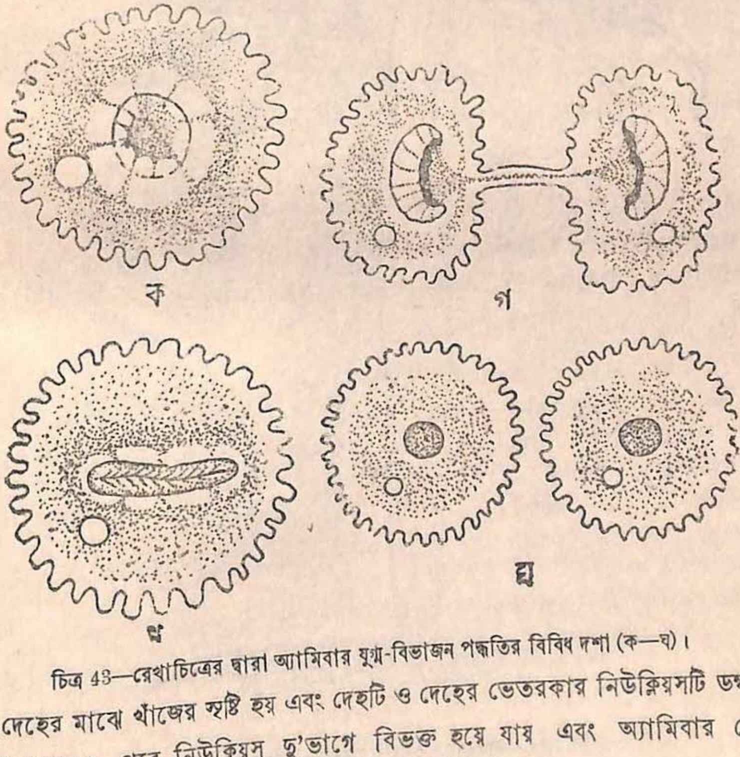
অযৌন-জননঃ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অযৌন-জনন প্রথা দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে জনন-কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টি হয় না। মাইটোসিস প্রথায় কোষ-বিভাজনের দ্বারা এরা বংশবিস্তার করে।

যৌন-জননঃ উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা এই পদ্ধতিতে জনন-কার্য সম্পন্ন করে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা জনন-কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টি করে। **শুক্রাশয়** হতে **শুক্রাণু** সৃষ্টি হয় এবং **ডিম্বাশয়** থেকে **ডিম্ব** বা **ডিম্বাণু** সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও একই প্রাণীর দেহে শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় দেখা যায়। সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে পুরুষে শুক্রাশয় এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্ব ও শুক্রাণু মেয়োসিস-কোষ-বিভাজন প্রথায় সৃষ্টি হয়। এদেরই **গ্যামেট** বলে। গ্যামেট-দুটির মিলনে **জাইগোট** বা **ভ্রূণের** সৃষ্টি হয়। জাইগোট বা ভ্রূণ হতেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়।

জনন-কোষঃ শুক্রাশয়ের মাতৃকোষ বা স্পারমাটোগোনিয়ম স্পারমাটো-জেনেসিস পদ্ধতিতে শুক্রাণু সৃষ্টি করে। তেমনি ডিম্বাশয়ের মাতৃকোষ বা উগোনিয়ম উজেনেসিস পদ্ধতিতে ডিম্ব বা ডিম্বাণু সৃষ্টি করে। শুক্রাণু খুব ছোট, তাই খালি-চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ডিম্ব খালি-চোখে দেখা যায়। শুক্রাণু-দেহ মাথা, গলা ও একটি

লেজের সমন্বয়ে গঠিত। ডিম্ব গোলাকার এবং এর মধ্যে একটি বড় নিউক্লিয়স ও সাইটোপ্লাজম থাকে। ডিম্বের মধ্যে কুসুম (*Yolk*) থাকে। কুসুম নিষিক্ত ডিম্বকে পুষ্ট করে। শুক্রাণু ডিম্বের ভিতর যখন প্রবেশ করে, তখন এর লেজ খসে পড়ে। একেই **নিষেক** বলে। শুক্রাণু ডিম্বের নিউক্লিয়সের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি নিউক্লিয়স তৈরি করে। জাইগোটের এই নিউক্লিয়স হতে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তাই যে প্রণালীর দ্বারা জীব হতে জীবের সৃষ্টি, পুরোনো বংশ হতে নতুন বংশের আবির্ভাব ঘটে, তাকে **জনন-প্রণালী** বলা হয়।

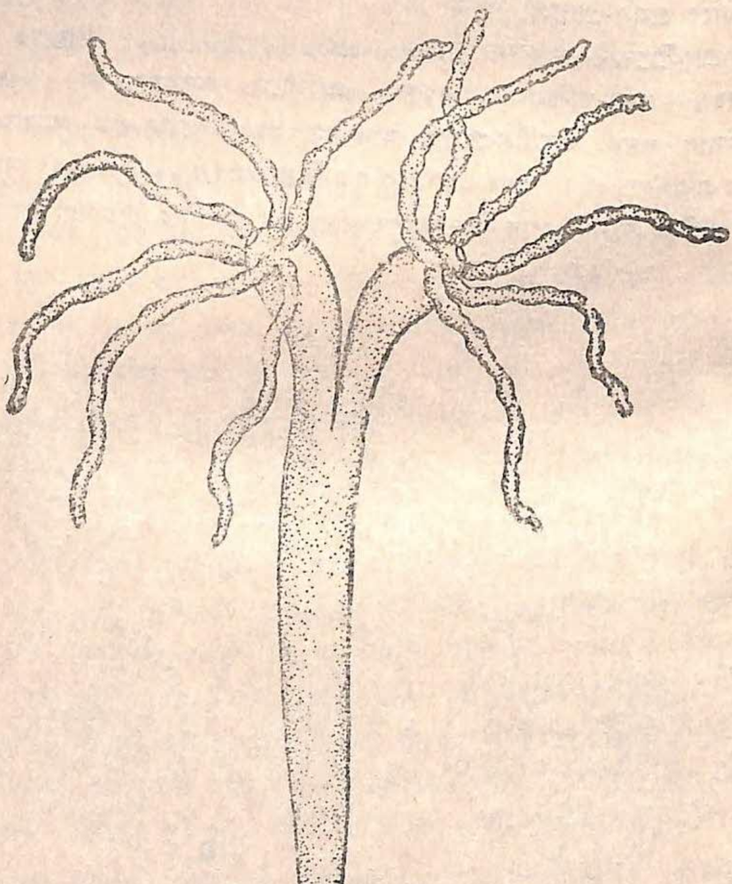
প্রাণীদের জনন (*Reproduction in Animals*): উদ্ভিদের মতো প্রাণীদেরও জনন-প্রক্রিয়া নানারকম প্রণালীতে কার্যকরী হয়। আদ্যপ্রাণী **অ্যামিবার** জনন **অযৌন-প্রথায়** সম্পাদিত হয়। অযৌন-প্রথা আবার দুই রকমের প্রণালীতে হয়। প্রথম প্রণালীকে **যুগ্ম-বিভাজন** (*Binary fission*) বলা হয়। এই প্রণালীতে অ্যামিবা তার সমস্ত ক্ষণপদ গুটিয়ে নেয় এবং ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যায়।



চিত্র 43—রেখাচিত্রের দ্বারা অ্যামিবার যুগ্ম-বিভাজন পদ্ধতির বিবিধ দশা (ক—ঘ)।

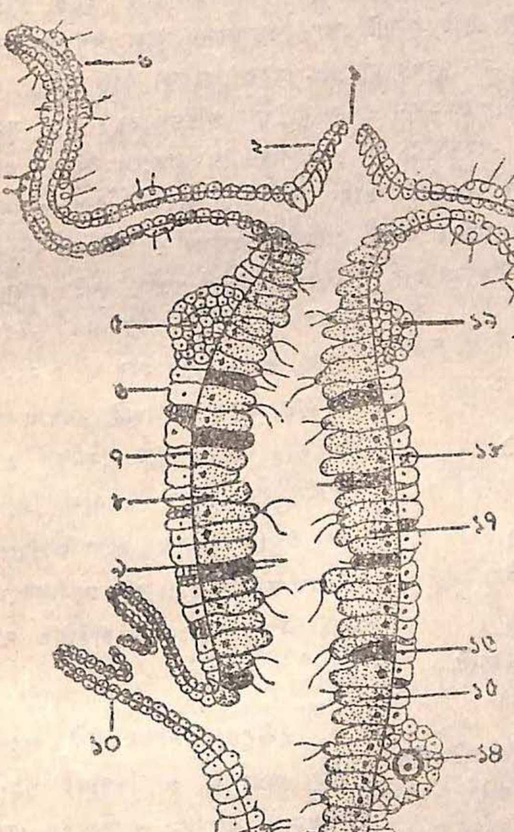
মরে দেহের মাঝে খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং দেহটি ও দেহের ভেতরকার নিউক্লিয়সটি ডম্বরু-র মতো দেখায়। পরে নিউক্লিয়স দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং অ্যামিবার দেহও

দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য-স্বাধীন অ্যামিবার সৃষ্টি করে। অপত্য-অ্যামিবা পূর্ণাঙ্গ হয়ে এই একই প্রথায় আবার বংশবৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় **অযৌন-প্রথাকে বহু-বিভাজন** (*Multiple fission*) প্রণালী বলা হয়। অ্যামিবা এই প্রথায় প্রথমে তার ক্ষণপদ গুটিয়ে নেয় এবং দেহের উপর তিনটি আবরণ দিয়ে নিজের দেহকে ঢেকে রাখে। এদিকে দেহের ভেতরে-থাকা নিউক্লিয়সটি খণ্ড-খণ্ড হয়ে, অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হয়ে



চিত্র 44—হাইড্রার লম্বালম্বি বিভাজন দেখানো হচ্ছে।

যায়। নিউক্লিয়সের প্রতিটি খণ্ড কিছু প্রোটোপ্লাজম নিয়ে এক-একটি ছোট ছোট কোষ সৃষ্টি করে। বর্ষার আরম্ভে অ্যামিবার দেহের **আবরণটি** (*Cyst*) ফুলে ফেটে

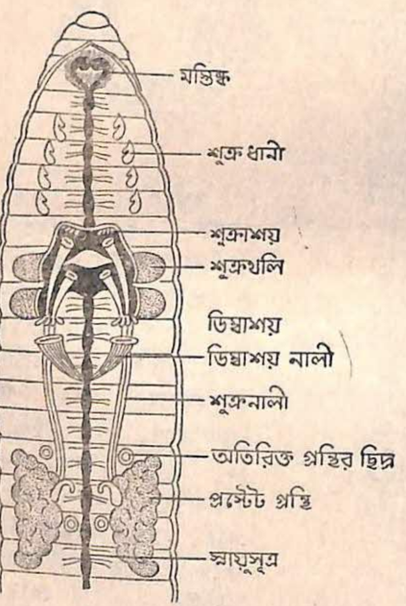


১. মুখছিদ্র; ২. হাইপোস্টম; ৩. কর্ষিকা; ৪. নিমাটোসিস্টের ব্যাটারি; ৫. শুক্রাশয়; ৬. এক্টোডার্ম; ৭. মেসোগ্লিয়া; ৮. এণ্ডোডার্ম; ৯. গ্যাস্ট্রোভাস্‌কিউলার গহ্বর বা সিলেন্‌টেরন; ১০. কুঁড়ি; ১১. বেসাল ডিস্ক; ১২. বাতাস-বুদ্‌বুদ; ১৩. গ্রন্থি-কোষ; ১৪. ডিম্বাশয়; ১৫. ফ্ল্যাজিলা-যুক্ত মাসকিউলো-নিউট্রিটিভ কোষ; ১৬. সংবেদনশীল কোষ; ১৭. এপিথিলিও মাসকিউলার কোষ; ১৮. নার্ভ-কোষ; ১৯. শুক্রাশয়।

চিত্র 45—হাইড্রার লম্বচ্ছেদের দ্বারা বিবিধ কোষস্তরগুলি দেখানো হয়েছে।

যায় এবং তার ভিতর থেকে অসংখ্য 'ক্ষুদে' অ্যামিবা বের হয়ে এসে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করে।

হাইড্রার অযৌন-জনন দু'রকমের। (i) হাইড্রার দেহ হতে **কুঁড়ি** বের হয়। দেহের পাশ থেকে ছোট কুঁড়িটি কোষ-বিভাজনের ফলে বেশ বড় হয়। তখন এর অগ্রভাগ থেকে মুখ এবং মুখের চারপাশ থেকে কর্ষিকা বের হয়। এটি হাইড্রার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পরে নতুন পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়। (ii) **যুগ্ম-বিভাজন** প্রক্রিয়ায় হাইড্রা প্রস্থভাবে বা লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পুনরুৎপাদন ক্ষমতায় হাইড্রার প্রতিটি ভাগ পূর্ণতালাভ ক'রে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়। হাইড্রার **যৌন-জননে** একই হাইড্রায় শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থাকে। কিন্তু অঙ্গগুলি একই সময়ে পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায়, একই হাইড্রার শুক্রাণু সেই হাইড্রার ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয় না। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু বের হয়ে জলে সাঁতার কাটতে থাকে এবং এই অবস্থায় অন্য হাইড্রার ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বের মিলনকে নিষেক বলা হয়। নিষেকের ফলে জাইগোট ও পরে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ভ্রূণে নানারকমের পরিবর্তনের পরে নতুন হাইড্রার সৃষ্টি হয়।

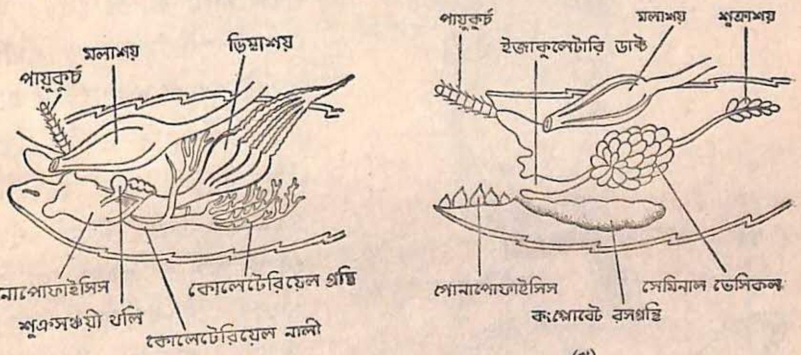


চিত্র 46—কেঁচোর জনন-তন্ত্র।

কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী। এদের দেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় দুই-ই বিদ্যমান। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় একই সময়ে পুষ্ট না হওয়ায়, একই কেঁচোর মধ্যে জনন-ক্রিয়া হয় না, দ্বিতীয় কেঁচোর দরকার হয়। কেঁচোর দেহে দুইজোড়া শুক্রাশয়, দুইজোড়া শুক্রনালী, একজোড়া পুং-জনন ছিদ্র, একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বাশয় নালী, চারজোড়া শুক্রধানী এবং একটি স্ত্রী-জনন-ছিদ্র থাকে। কেঁচোর পর-নিষেকের সময়ে সঙ্গমকালে দুটি কেঁচো পরস্পর অগ্রপশ্চাৎ অবস্থায় এমনিভাবে মিলিত হয় যে, একটি কেঁচোর শুক্র-সঞ্চয়-থলির ছিদ্রগুলি অপর কেঁচোর

পুং-জনন-ছিদ্রের মুখোমুখী হয়। ফলে, দুটি কেঁচোর মধ্যে শুক্রাণুর বিনিময় হয় এবং তা শুক্র-সঞ্চয়-থলিতে জমা হয়। কেঁচোর ক্লাইটেলাম অঞ্চলের আবরণটি মুখের দিকে আসার সময়ে প্রথমে ডিম্ব ও পরে শুক্রাণু সংগ্রহ করে। ক্লাইটেলামের ভেতর নিষেক সম্পন্ন হয়। আবরণটি দেহ থেকে মুক্ত হবার পরে এর দুই দিক বন্ধ হয়ে একটি গোলাকার গুটিতে পরিণত হয়। নিষেকের পরে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়, পরে গুটি ফেটে বাচ্চা কেঁচো বের হয়।

আরশোলা পতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত একলিঙ্গ প্রাণী হওয়ায়, এদের স্ত্রী-পুরুষের ভেদ দেখা যায়। স্ত্রী-আরশোলার একজোড়া ডিম্বাশয় এবং একটি একত্রিত ডিম্বাশয় নালী থাকে। পুরুষ-আরশোলায় একজোড়া শুক্রাশয় এবং একজোড়া শুক্রনালী থাকে। সঙ্গমের সময়ে শুক্রাণুগুলি শুক্রনালীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে স্ত্রী-আরশোলার জনন-ছিদ্রের ভিতরে প্রবেশ করে। জনন-ছিদ্র থেকে ডিম্বাশয়-নালীর ভেতর দিয়ে



(ক) (খ)

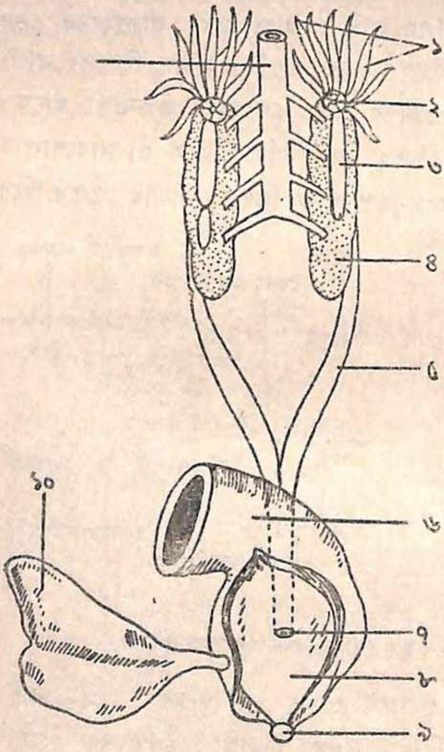
চিত্র 47—আরশোলার (ক) পুং-জনন-তন্ত্র ও (খ) স্ত্রী-জনন-তন্ত্র দেখানো হয়েছে।

শুক্রাণুগুলি ডিম্বাশয়ে পৌছায় এবং সেখানে শুক্রাণু ও ডিম্বের মিলন ঘটে। ডিম্বাশয়-নালী-নিঃসৃত একপ্রকার রস নিষিক্ত ডিম্বের চারপাশে একটি শক্ত খোলার মতো আবরণী তৈরি করে। ডিমের ভেতরে ভ্রূণের বৃদ্ধি হতে থাকে। ডিম থেকে সরাসরি বাচ্চা বের হয়ে আসে। অন্যান্য পতঙ্গের ডিম থেকে বাচ্চা সরাসরি বের হয় না। রূপান্তরের মাধ্যমে ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ—এই চার দশা অতিক্রম ক'রে বাচ্চা বের হয়।

মাছ ও ব্যাঙের ডিম্ব ও শুক্রাণু দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। পুরুষ মাছ বা ব্যাঙ জলে শুক্রাণু ছেড়ে দেয় এবং একই সময়ে স্ত্রী মাছ বা ব্যাঙ জলেতে ডিম

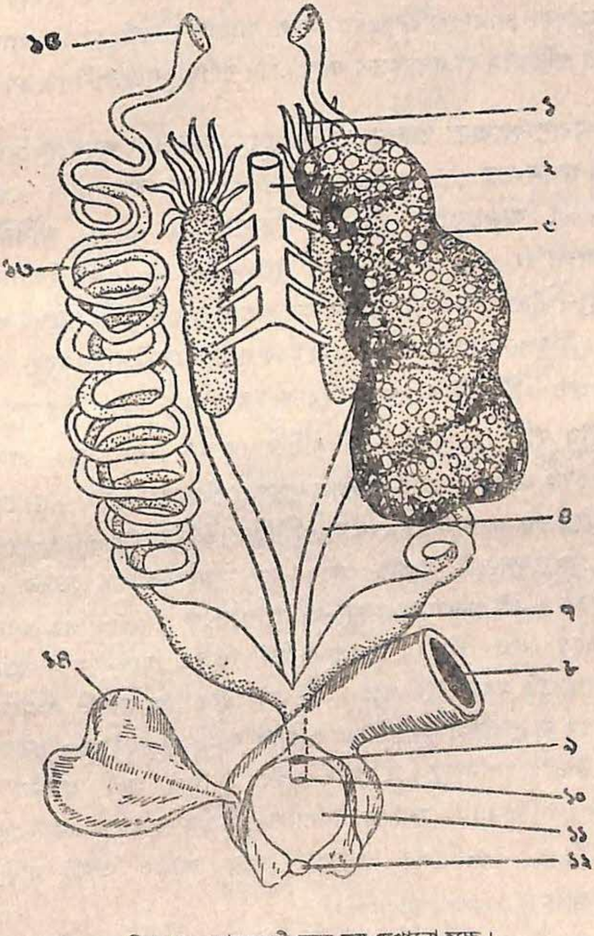
ছাড়ে। জলের পরিবেশে শুক্রাণু ও ডিম্বের মিলন হয় ও নিষিক্ত ডিম্ব হতে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মাছ ও ব্যাঙের ক্ষেত্রে নিষেক-ক্রিয়া দেহের বাহিরে জলে হওয়ায়, এইপ্রকার নিষেককে **বহিঃনিষেক** বলা হয়।

পুরুষ-ব্যাঙে একজোড়া শুক্রাশয় একটি ক'রে প্রতি বৃক্কের অঙ্কদেশে বিদ্যমান। শুক্রাশয় সাদা ও লম্বা এবং পাতলা পর্দা দিয়ে বৃক্কের সঙ্গে যুক্ত। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু বের হয়ে বৃক্কের ভেতর দিয়ে গবিনীর ভেতর প্রবেশ করে। গবিনী মূত্রসহ শুক্রাণু রেচন-জনন-নালী নামে দুই পাশের একটি ক'রে নালী ব্যাঙের নিচের দিকে নেমে পরস্পর মিলিত হয়। মিলিত নালীটি ব্যাঙের অবসারণীতে প্রবেশ করে। অবসারণী একটি ছিদ্রের দ্বারা বাহিরে মুক্ত হয়। এই রেচন-জনন-ছিদ্র দিয়ে পুরুষ-ব্যাঙের মূত্র ও শুক্রাণু বের হয়ে আসে। **স্ত্রী-ব্যাঙে** একজোড়া ডিম্বাশয় বিদ্যমান। এইগুলি বৃক্কের সঙ্গে পাতলা পর্দা দিয়ে যুক্ত থাকে। প্রজনন ঋতুতে ডিম্বাশয়-দুটি আকারে বেশ বড় হয় এবং প্রচুর গোলাকার ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। বৃক্কের দু'পাশে দুটি সাদা, লম্বা ও প্যাঁচানো ডিম্বনালী থাকে। এর ফানেলের মতো মুখটি ফুস্‌ফুসের তলায় বিদ্যমান। এর শেষ অংশটি পাতলা-প্রাচীর-যুক্ত থাকে। এটি প্যাঁচানো, চওড়া ও ফোলা। এটি স্ত্রী-ব্যাঙের জরায়ু। দু'দিকের জরায়ু-দুটি একত্র হয়ে একটি সাধারণ নালী গঠন ক'রে অবসারণীতে যুক্ত হয়। অবসারণী স্ত্রী-জনন-ছিদ্রের দ্বারা



চিত্র 48—ব্যাঙের পুং-রেচন-জননতন্ত্র দেখানো হয়েছে। ১. স্নেহ-পদার্থের ফিতা ; ২. বিডার্স যন্ত্র ; ৩. শুক্রাশয় ; ৪. বৃক্ক ; ৫. গবিনী বা উল্‌ফিয়ান নালী ; ৬. মলাশয়ের শেষ অংশ ; ৭. রেচন-ছিদ্র বা গবিনী ; ৮. অবসারণী ; ৯. অবসারণী-ছিদ্র।

ডিম্বগুলিকে বাহিরে বের ক'রে দেয়। স্ত্রী-ব্যাঙে একটি গবিনী-ছিদ্র আলাদা থাকে। বর্ষাকাল ব্যাঙের প্রজনন ঋতু। পুষ্ট ডিম্বাশয়ের প্রাচীর ফেটে গিয়ে ডিম্বগুলিকে দেহরসে ভাসিয়ে দেয়। ডিম্বগুলি ডিম্বাশয়-নালীর মুখের ভেতর দিয়ে জরায়ুতে এসে জমে এবং পরে স্ত্রী-জনন-ছিদ্র দিয়ে জলে নিক্ষিপ্ত হয়।



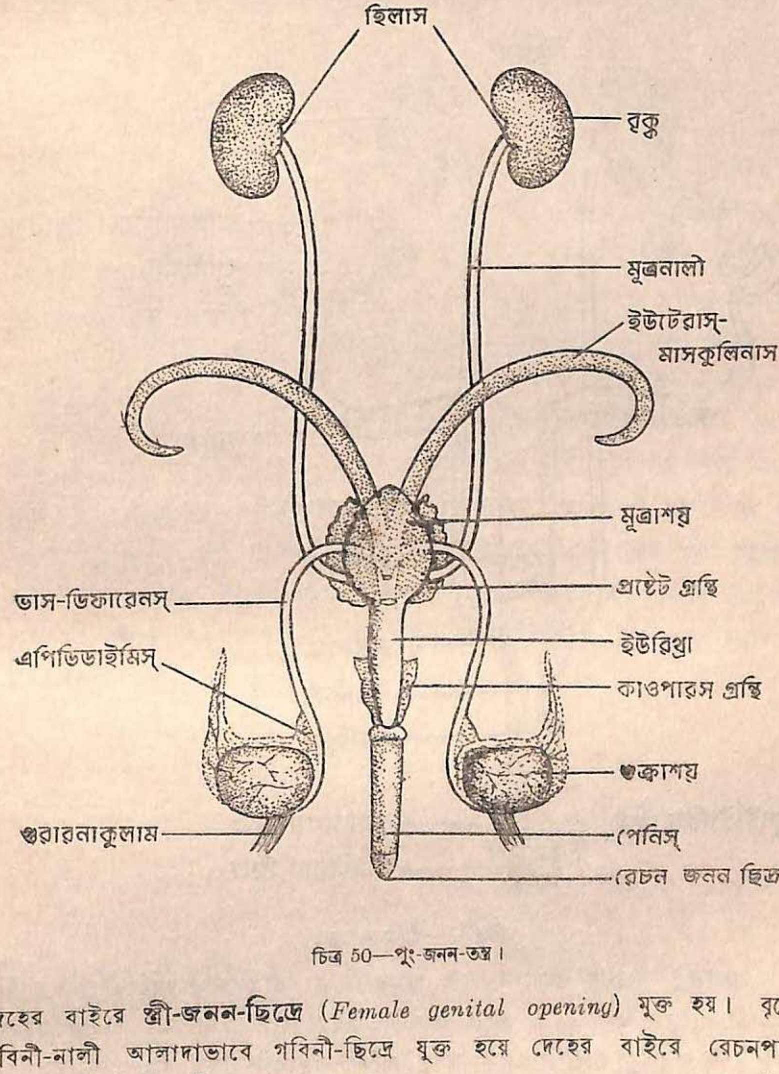
চিত্র 49—ব্যাঙের স্ত্রী-জনন-তন্ত্র দেখানো হচ্ছে।
১. স্নেহ-পদার্থের ফিতা; ২. পশ্চাদ্ভাগের মহাশিরা; ৩. ডিম্বাশয়; ৪. গবিনী; ৭. ইউটেরাস; ৮. মলাশয়ের শেষ অঞ্চল; ৯. ডিম্বাশয়-নালীর একত্রিত ছিদ্র; ১০. গবিনী-ছিদ্র; ১১. অবসারণী; ১২. অবসারণী-ছিদ্র; ১৩. ডিম্বাশয়-নালী; ১৪. মূত্রথলি; ১৫. ডিম্বাশয়-নালীর ফানেলের মতো মুখ।

ঋতুকালে পুরুষ-ব্যাঙের ডাকে স্ত্রী-ব্যাঙ জলের ধারে চলে আসে এবং সঙ্গমে লিপ্ত হয়। তখন একই সময়ে ডিম্ব ও শুক্রাণু দেহ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। ডিমগুলি পরস্পর জেলির মতো পদার্থ দিয়ে যুক্ত থাকায়, একত্রে এদের ফিতার মতো দেখায়। শুক্রাণুগুলি জলে সাঁতার কাটে এবং একটি শুক্রাণু একটি ডিমের ভেতর প্রবেশ ক'রে জাইগোট সৃষ্টি করে। কোষ-বিভাজনের ফলে জাইগোট ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ভ্রূণের নানা পরিবর্তনের ফলে ব্যাঙাচির সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচির ভেতর নানারকমের পরিবর্তন বা রূপান্তরের ফলে সেটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

মানবদেহের জনন: মানুষের রেচন এবং জনন পুরুষের ক্ষেত্রে একত্র হয়ে **রেচন-জনন-তন্ত্র** (*Urinogenital system*) রূপে দেখা যায়। রেচন-জনন-তন্ত্র **বৃক্ক** (*Kidney*), **অণ্ডকোষ** (*Testes*), **ডিম্বাশয়** (*Ovary*), **গবিনী** (*Ureter*), **ডিম্বাশয়-নালী** (*Oviduct*), **মূত্রথলি** (*Urinary bladder*) ইত্যাদি অঙ্গ নিয়ে গঠিত। **পুং-গিনিপিগ**-এর বা **মানুষ**-এর অণ্ডকোষ-দুটি বৃক্কের পাশেই থাকে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হলে দুটি অণ্ডকোষ নিচের দিকে নেমে এসে এক-একটি থলির মধ্যে অবস্থান করে। পুরুষ-গিনিপিগে এটি বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই **অণ্ডকোষপূর্ণ থলি** (*Scrotum*)-দুটি বাইরে থেকেই দেখা যায়। প্রতি অণ্ডকোষ থেকে একটি ক'রে অণ্ডকোষ-নালী বা **ভাস-ডেফারেন্স** (*Vas-deferens*) বের হয়। এর প্রথম অংশটি খুব সরু ও প্যাঁচানো, একে **এপিডিডাইমিস** (*Epididymis*) অঞ্চল বলা হয়। ভাস-ডেফারেন্স-দুটি দু'পাশ থেকে এসে মূত্রাশয়-থলির ভেতর প্রবেশ ক'রে পরস্পর যুক্ত হয় ও এই অঞ্চল হতে **পুং-ইউটেরাস**কে (*Uterus-masculinus*) বিভক্ত হয়ে বের হতে দেখা যায়। মূত্রাশয়-থলির ভিতর গবিনী-নালী-দুটি ও ভাস-ডেফারেন্স নালী-দুটি যুক্ত হবার পরে মূত্রাশয়-থলির গলার অংশটি লম্বা নলে পরিণত হয়ে পুরুষ-লিঙ্গে বা **পেনিস** (*Penis*)-এ পরিণত হয়। অণ্ডকোষের শুক্রকীট ও বৃক্কের রেচনপদার্থ উভয়ই পেনিসের ছিদ্রপথে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। পেনিস মানবদেহের বহিরাকৃতিতে দেখা যায়। মূত্রথলির চারপাশে বেষ্টন ক'রে থাকে একটি **প্রস্টেট-গ্রন্থি** (*Prostate-gland*)। পেনিসের গোড়ায় থাকে আরও একটি গ্রন্থি, যার নাম **কাউপারস্-গ্রন্থি** (*Cowper's gland*)।

মানুষের স্ত্রী-জনন-তন্ত্রে ডিম্বাশয়-দুটি বৃক্কের নিচে থাকে। ডিম্বাশয় (*Ovary*) হতে দুটি ডিম্বাশয়-নালী (*Oviduct*) বের হয় ও এর প্রথমভাগের অঞ্চল সরু ও প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। এই অঞ্চলকে **ফ্যালোপিয়ান টিউব** (*Fallopian*

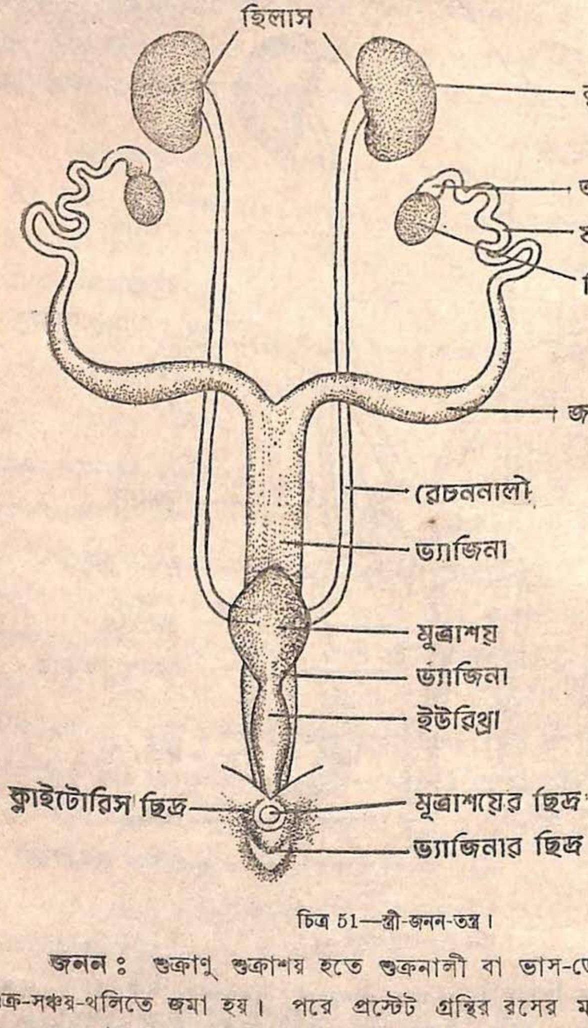
tube) বলা হয়। দু'পাশের ফ্যালোপিয়ান টিউব ধীরে ধীরে স্থূল হয়ে **ইউটেরাসে** (*Uterus*) পরিণত হয় এবং পরে দু'দিকের ইউটেরাস-দুটি যুক্ত হয়ে **ভ্যাজিনায়** (*Vagina*) পরিণত হয়। ভ্যাজিনায় মূত্রাশয়-থলির তলা দিয়ে নিচের দিকে এগিয়ে গিয়ে



চিত্র 50—পুং-জনন-তন্ত্র।

দেহের বাইরে **স্ত্রী-জনন-ছিদ্রে** (*Female genital opening*) মুক্ত হয়। বৃক্কের গবিনী-নালী আলাদাভাবে গবিনী-ছিদ্রে যুক্ত হয়ে দেহের বাইরে রেচনপদার্থ নিক্ষিপ্ত করে। **স্ত্রী-বহিঃ-জনন-অঙ্গে** (*Female external genitalia*) প্রথমে গবিনী-

ছিদ্র, মধ্যে জনন-ছিদ্র ও শেষে পায়ুছিদ্র দেখা যায়। গবিনী ও জনন-ছিদ্রের দু'পাশে স্থূল দুই-স্তর-বিশিষ্ট মাংসপেশী থাকে। মানবদেহের বহিঃ-জনন-অঙ্গ দেখে মানুষ কোন্‌টি স্ত্রী বা কোন্‌টি পুরুষ তা খুব সহজেই জানা যায়। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের ডিম্বাশয়ের নিষেক দেহের ভিতর হয়ে থাকে।



চিত্র 51—স্ত্রী-জনন-তন্ত্র।

জনন : শুক্রাণু শুক্রাশয় হতে শুক্রনালী বা ভাস-ডেফারেন্‌সের ভেতর দিয়ে শুক্র-সঞ্চয়-থলিতে জমা হয়। পরে প্রস্টেট গ্রন্থির রসের মাধ্যমে ইউরিথ্রা ভেতরে প্রবেশ ক'রে ইউরিথ্রা নালীর অগ্রভাগে বা পেনিসের মুখে অবস্থিত মূত্র জনন-ছিদ্র দিয়ে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। ডিম্বাশয় হতে ডিম্বাণু ডিম্ব-নালীর ফানেলাকৃতি মুখের ভেতর

প্রবেশ করে। পরে ডিম্বাণু বা পুষ্ট ডিম্ব ফ্যালোপিয়ান নালীর ভেতর অস্থায়ীভাবে জমা থাকে। সঙ্গমের সময় শুক্রাণু স্ত্রী-জনন-ছিদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভ্যাজিনার মাধ্যমে জরায়ুর ভেতর দিয়ে ফ্যালোপিয়ান নালীতে এসে উপস্থিত হয়। তখন শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন হয়। এই অঞ্চলেই ডিম্বের বা ডিম্বাণুর নিষেক হয়।

ভ্রূণের বৃদ্ধিঃ প্রজেস্টেরন নামে একপ্রকার হরমোন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে নিঃসৃত হয়। এর ফলে নিষিক্ত ডিম্বে জটিল কোষ-বিভাজন সুরু হয়। পরে নিষিক্ত ডিম্ব ভ্রূণে পরিণত হয়। ফ্যালোপিয়ান নালী থেকে ভ্রূণ নেমে এসে জরায়ুর প্রাচীরে আটকে থাকে। জরায়ুতে ভ্রূণের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। জরায়ুর প্রাচীর থেকে প্লাসেণ্টা বা ফুল নামে কলাপুঞ্জের সৃষ্টি হয় এবং এর সাহায্যে ভ্রূণ ভালোভাবে জরায়ুর প্রাচীরে আটকে থাকে ও এরই সাহায্যে মায়ের শরীর থেকে তরল খাদ্য ও অক্সিজেন পায়। ভ্রূণের রেচন পদার্থও প্লাসেণ্টা দূরীভূত করে। এর পর ভ্রূণের চারপাশে কোরিয়ান ও অ্যাম্নিওন নামে দুটি পর্দার সৃষ্টি হয়। অ্যাম্নিওন ভ্রূণকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। প্লাসেণ্টা থেকে অ্যাম্বিলিকাল নালী বের হয়ে ভ্রূণের সঙ্গে যুক্ত হয়। মায়ের রক্তজালিকা প্লাসেণ্টা ও অ্যাম্বিলিকাল নালীতে প্রচণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করে। ফলে মায়ের রক্তের মাধ্যমে ভ্রূণের সমগ্র বিপাকীয় কাজ চলে। জরায়ুর মাধ্যমে ভ্রূণের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ডিম্বের নিষেকের পর ভ্রূণের ভূমিষ্ঠকাল পর্যন্ত—এই সময়কে গর্ভাবস্থার সময় বলা হয়। এই সময় খরগোসের ক্ষেত্রে পাঁচ সপ্তাহ, ইঁদুরের ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ, গিনিপিগের ক্ষেত্রে নয় সপ্তাহ, মানুষের ক্ষেত্রে নয় মাস এবং হাতীর মতন বিরাট প্রাণীর ক্ষেত্রে বাইশ মাস দরকার হয়।

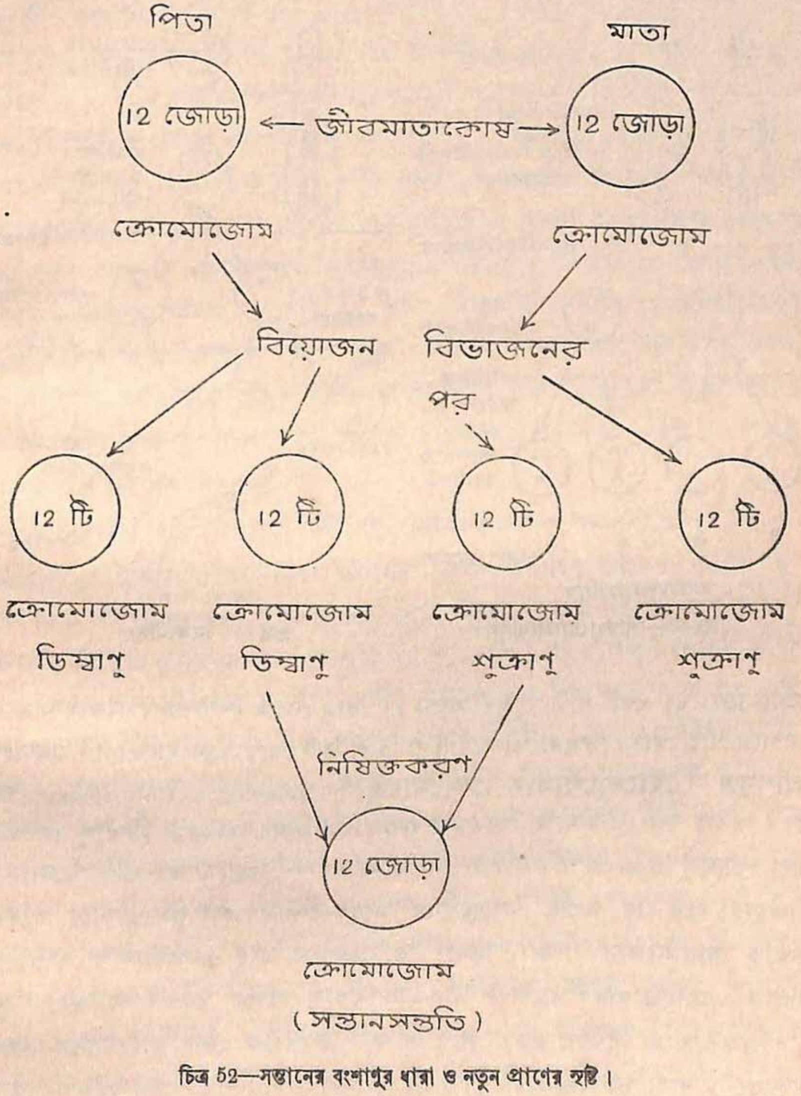
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বংশগতি (Heredity)

কোটি কোটি বছর আগে কতকগুলি জৈবনিক পদার্থের আকস্মিক মিলন ঘটেছিল আদি-প্রাণের প্রথম প্রকাশ। সেই আদি-প্রাণী সময় ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করেছে। প্রাণের সৃষ্টি একবারই হয়েছে এবং যুগ-যুগ এই প্রাণপ্রবাহ দুর্বারস্রোতে এগিয়ে চলেছে। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে এই প্রাণপ্রবাহের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন বা রূপান্তর এসেছে এবং এসেছে নানারকমের বিচিত্রধারার উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। সৃষ্টির বিনাশ নেই—আছে পরিবর্তন, আছে রূপান্তর। এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যেও বংশগতির ধারা ও তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সঠিক তথ্যও জানা গিয়েছে। একই প্রজাতির সমস্ত জীব হুবহু এক হয় না; এরা কিছুটা পরস্পর হতে ভিন্ন। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে : 'ছেলেটি দেখতে তার বাবার মতো'। এতেই বোঝা যায়, পিতামাতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ তার সন্তান-সন্ততিতে পরিবাহিত হয়। কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পেলেও, সন্তান-সন্ততি দেখতে পুরোপুরি পিতামাতার মতো হয় না। সুতরাং এটি বাস্তব সত্য যে, **বংশানুক্রমিক** (*Successive generations*) লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

জীবকোষের ভেতরকার নিউক্লিয়াসে থাকে জীব অনুযায়ী নির্দিষ্ট-সংখ্যক ক্রোমোজোম। এই **ক্রোমোজোম** (*Chromosome*) বা **প্রাণসূত্রের** মধ্যে থাকে অসংখ্য **ক্রোমাটিন কণা** (*Chromatin granule*)। এক-একটি প্রজাতির ক্রোমোজোম বা প্রাণসূত্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট ; যেমন—মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা 48, মুরগীর 32, ব্যাঙের 24, ইত্যাদি। ক্রোমোজোমগুলি আবার জোড়া-জোড়া অবস্থায় বা **দুই প্রস্থ** (*Double set*) অবস্থায় থাকে। জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি বংশপরম্পরা আসে মায়ের দিক থেকে, আর দ্বিতীয়টি আসে বংশপরম্পরায় বাপের দিক থেকে। ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিন কণার মধ্যে থাকে জীবের অসংখ্য **প্রাণবিন্দু** বা **জিন** (*Gene*) বা **বংশাণু**। কোষ-বিভাজন-এর ক্রোমোজোম-বিভাজনের সময়ে জিনও লম্বালম্বি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। জিন একপ্রকার রাসায়নিক কণা এবং একটি কণায় তিনটি **অণু** (*DNA*) থাকে। এই জিনের মধ্যে বংশধারার বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত থাকে। এরাই

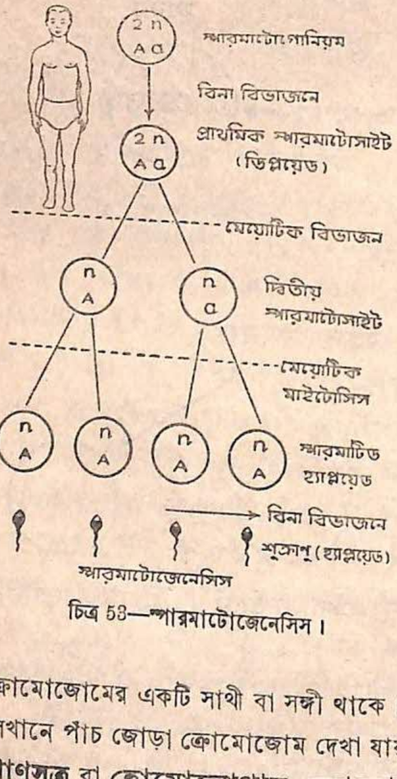
জীবগত বৈশিষ্ট্যগুলি এক পুরুষ হতে পরবর্তী পুরুষে অদৃশ্যভাবে বহন করে। তাই জিনকে বংশধারার বৈশিষ্ট্যের বাহক বলা হয়।



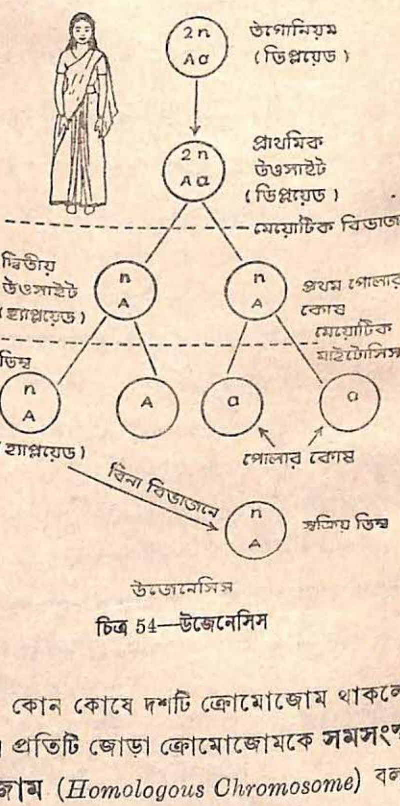
চিত্র 52—সন্তানের বংশাণুর ধারা ও নতুন প্রাণের সৃষ্টি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মেওসিস বা **বিয়োজন-বিভাজন-পদ্ধতি** (*Reduction-division*) বীজকোষে কি-ভাবে হয়, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। **জীব-মাতা-কোষে**

(*Germ mother cell*) $2n$-সংখ্যক বা ডিপ্লয়েড-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। এই ক্রোমোজোম বা প্রাণসূত্রগুলি জোড়া-জোড়া অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ প্রতিটি



চিত্র 53—স্পারমাটোজেনেসিস।



চিত্র 54—উজেনেসিস

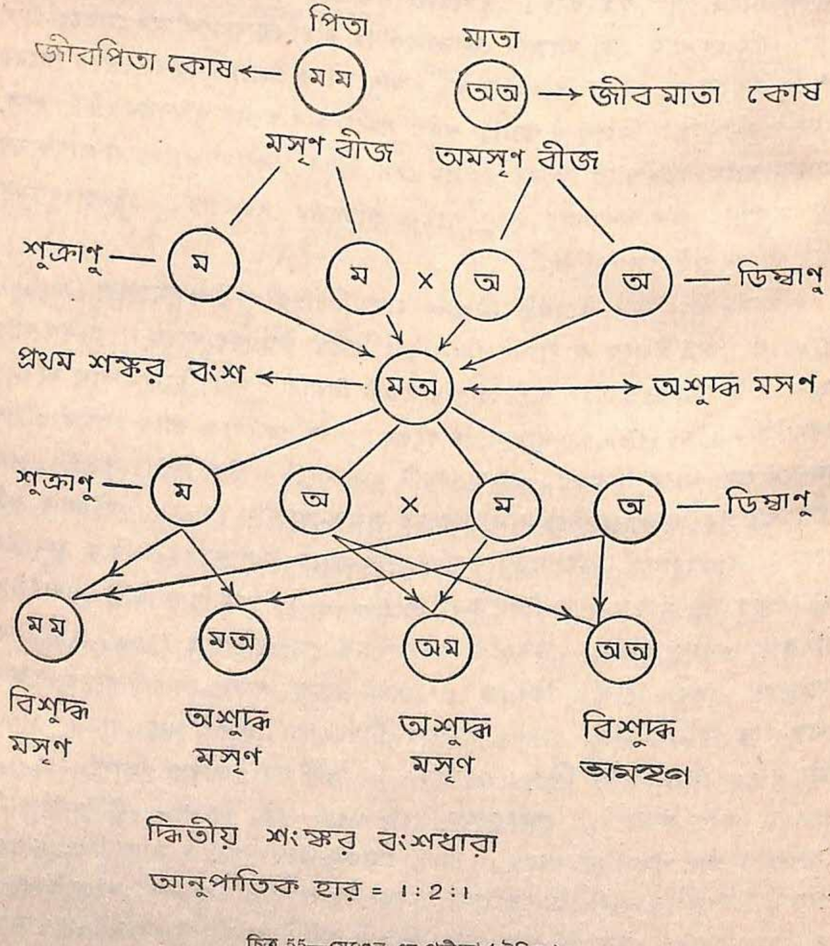
ক্রোমোজোমের একটি সাথী বা সঙ্গী থাকে। কোন কোষে দশটি ক্রোমোজোম থাকলে, সেখানে পাঁচ জোড়া ক্রোমোজোম দেখা যায়। প্রতিটি জোড়া ক্রোমোজোমকে **সমসংস্থ প্রাণসূত্র** বা **হোমোলোগাস ক্রোমোজোম** (*Homologous Chromosome*) বলা হয়। কিন্তু যখন জীব-মাতা-কোষ বিয়োজন-বিভাজনের মাধ্যমে **ডিম্বাণু** (*Ovum*) এবং **শুক্রাণু** (*Sperm*) সৃষ্টি করে, তখন জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি বেজোড় বা সাথীহারা হয়ে যায়, অর্থাৎ ডিম্বাণুকোষে অর্ধেক-সংখ্যক এবং শুক্রাণুকোষে অর্ধেক-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুতে তাই n-সংখ্যক বা হ্যাপ্লয়েড-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। জীব-মাতা-কোষ প্রথমে মেওসিসের দ্বারা দুটি n-সংখ্যক কোষে পরিণত হয়। পরে প্রতিটি n-সংখ্যক কোষ মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের দ্বারা দুটি কোষে পরিণত হয়। অর্থাৎ জীব-মাতা-কোষ দুইবার কোষ-বিভাজনের দ্বারা চারটি কোষে পরিণত হয় এবং প্রতিটি কোষে n-সংখ্যক বা হ্যাপ্লয়েড-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। **পুং-জীব-মাতা-কোষের** (*Sperm mother cell*)

বিভাজনে চারটি **শুক্রাণু** (*Sperm*)-এর সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি সক্রিয়। কিন্তু স্ত্রী-জীব-মাতা-কোষের বিভাজনে যে চারটি কোষ সৃষ্টি হয়, তার একটিমাত্র সক্রিয় ডিম্বাণু, বাকী তিনটিকে **পোলার বডি** (*Polar body*) বলা হয়। সেগুলি পরে দ্রবীভূত হয়ে যায়। সাথীহারা ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট শুক্রাণু যখন সাথীহারা ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট ডিম্বাণুকে নিষেক করে, তখন ক্রোমোজোমগুলি আবার সাথী পায় এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুতে আবার '$2n$' বা ডিপ্লয়েড-সংখ্যক ক্রোমোজোম দেখা যায়। ক্রোমোজোমগুলি আবার সমসংস্থ ক্রোমোজোম-রূপে অবস্থান করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু মাইটোসিস কোষ-বিভাজনের দ্বারা অপত্য-প্রাণীর প্রাণ সৃষ্টি করে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে জোড়া ক্রোমোজোম বেজোড় হওয়া এবং বেজোড় ক্রোমোজোম জোড়া হওয়ার মধ্যে ক্রোমোজোমের ভেতরে-থাকা জিনের অবস্থানের অনেক পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ আগে ক্রোমোজোমের ভেতর জিনের যেমন অবস্থান ছিল, ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সৃষ্টির সময়ে তার অনেক পরিবর্তন হয়। ফলে, ক্রোমোজোমে নতুনভাবে জিনের অবস্থান দেখা যায়। ক্রোমোজোমের বা প্রাণসূত্রের এই নবসজ্জার জন্য অপত্যের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনই নতুন প্রাণের সৃষ্টি সম্ভবপর করে।

বংশগতির ধারা কয়েকটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **জন মেণ্ডেল** (*Johann Mendel*) 1822 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সিলেসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রে ব্রানের একটি গির্জায় পাদরী হিসেবে কাজ করেন। তখন তিনি গ্রীগর (*Gregor*) নাম গ্রহণ করেন। এর পর থেকে তাঁকে লোকে গ্রীগর জন মেণ্ডেল নামে চিনতো। তাঁর একটি বাগান ছিল ঠিক গির্জার পাশে। এই বাগানে তিনি মটরগাছ নিয়ে নানা রকমের **সঙ্কর-জাতীয়** (*Hybrid*) মটরগাছ সৃষ্টি করেন। বংশপরম্পরা মটরগাছের বৈশিষ্ট্য কি-ভাবে বংশানুক্রমে এগিয়ে যায়, সে বিষয় প্রচুর তত্ত্ব মেণ্ডেল 1865 খ্রীষ্টাব্দে **ব্রান** (*Brunn*)-এর 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তত্ত্বগুলি এক কথায় **মেণ্ডেলিজম** (*Mendelism*) বা মেণ্ডেলের তত্ত্ব হিসেবে বিখ্যাত। 1900 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেণ্ডেলিজমের কোন খোঁজ-খবর কেউ নেয়নি। 1884 খ্রীষ্টাব্দে গ্রীগর জন মেণ্ডেল মারা যান। 1900 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের **ডি ভ্রিস্** (*De Vries*), অস্ট্রিয়ার **স্টার মার্ক** (*Tscher Marck*) এবং জার্মানির **কোরেন্স** (*Correns*)—এই তিনজন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের তত্ত্ব পুনরুদ্ধার করেন। তখন মেণ্ডেল-তত্ত্বের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বংশগতির ধারা যে কয়েকটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা মেণ্ডেলই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর এই নিয়মগুলি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয় জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সন্ন্যাসী-বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে এই নিয়মগুলিকে **সূত্রের** (*Laws*) আকারে প্রকাশ করেন। নিচে মেণ্ডেলের পরীক্ষা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল :

মটরগাছ নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। কোন কোন প্রজাতি বেশ লম্বা হয়, আবার কোন কোন প্রজাতি বেশ বেঁটে হয়। কোন মটরগাছের ফুল সব সময়ে সাদা হয়, আবার কোন মটরগাছের ফুল বেগুনী রঙের হয়। কোন মটরগাছের বীজ **মসৃণ** (*Round*) হয়, আবার কোন মটরগাছের বীজ **অমসৃণ** (*Wrinkled*) হয়। মেণ্ডেল-



চিত্র 55—মেণ্ডেল-এর পরীক্ষা (উদ্ভিদ)।

সাহেব প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে এক-একটি **গুণগত বৈশিষ্ট্য** (*Unit character*) রূপে গণ্য করেন। তিনি **পরীক্ষা** করে দেখেন যে, অমসৃণ বীজবিশিষ্ট মটরগাছ বংশপরম্পরায় অমসৃণ বীজ সৃষ্টি করে, আবার মসৃণ বীজবিশিষ্ট মটরগাছ বংশপরম্পরায় মসৃণ বীজ সৃষ্টি করে। মেণ্ডেল এই দুটি গুণগত বৈশিষ্ট্যকে বিশুদ্ধ আখ্যা দেন। অমসৃণ ও মসৃণ বীজ প্রদানকারী বিশুদ্ধ (Pure) মটরগাছগুলি নিয়ে মেণ্ডেল আরও পরীক্ষা করেন। মেণ্ডেল মটর-ফুলের মধ্যে **স্ব-পরাগসংযোগ** (*Cross-pollination*) পদ্ধতি কাজে লাগান। এর ফলে গাছের গুণগত বিশুদ্ধতা জানা যায়।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি মসৃণ বীজপ্রদানকারী মটরগাছের **পরাগ-রেণু** (*Pollen grain*)-এর সঙ্গে অমসৃণ বীজপ্রদানকারী মটরগাছের **ডিম্বাণু** (*Ovum*)-এর পরীক্ষামূলকভাবে মিলন ঘটান। এই পরাগ-সংযোগের ফলে যে বীজ উৎপন্ন হ'ল, দেখা গেল সেগুলি সবই মসৃণ। এই মসৃণ বীজবিশিষ্ট মটরগাছকে মেণ্ডেল বললেন **প্রথম সঙ্কর বংশ** (*First filial generation*)। মসৃণ বীজবিশিষ্ট প্রথম সঙ্কর বংশের মটরগাছের মধ্যে অমসৃণ ও মসৃণ এই দুটি গুণ নিশ্চয় নিহিত আছে, কিন্তু বীজের বহিরাকৃতিতে অমসৃণ গুণটি চাপা প'ড়ে গিয়ে মসৃণ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। মেণ্ডেল এবার **তৃতীয় পরীক্ষায়** প্রথম সঙ্কর বংশের বীজগুলি হতে গাছ উৎপাদন করলেন। এই গাছগুলির মধ্যে ফুলে-ফুলে পরাগ-সংযোগ ঘটালেন। পরাগ-সংযোগের পর ফুলে বীজ এলো। দেখা গেল, মসৃণ বীজ তো পাওয়া গেলই, কিন্তু কিছু কিছু অমসৃণ বীজও পাওয়া গেল। এদেরকে মেণ্ডেল বললেন **দ্বিতীয় সঙ্কর বংশ** (*Second filial generation*)। বীজের মসৃণ-অমসৃণ গুণ দেখে একটা নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার মেণ্ডেল পেলেন। তিনি দেখলেন চারটি মটরগাছের মধ্যে তিনটি গাছ মসৃণ বীজ প্রদানকারী, আর একটি অমসৃণ বীজ প্রদানকারী মটর গাছ। আনুপাতিক হারটি হ'ল 3 : 1।

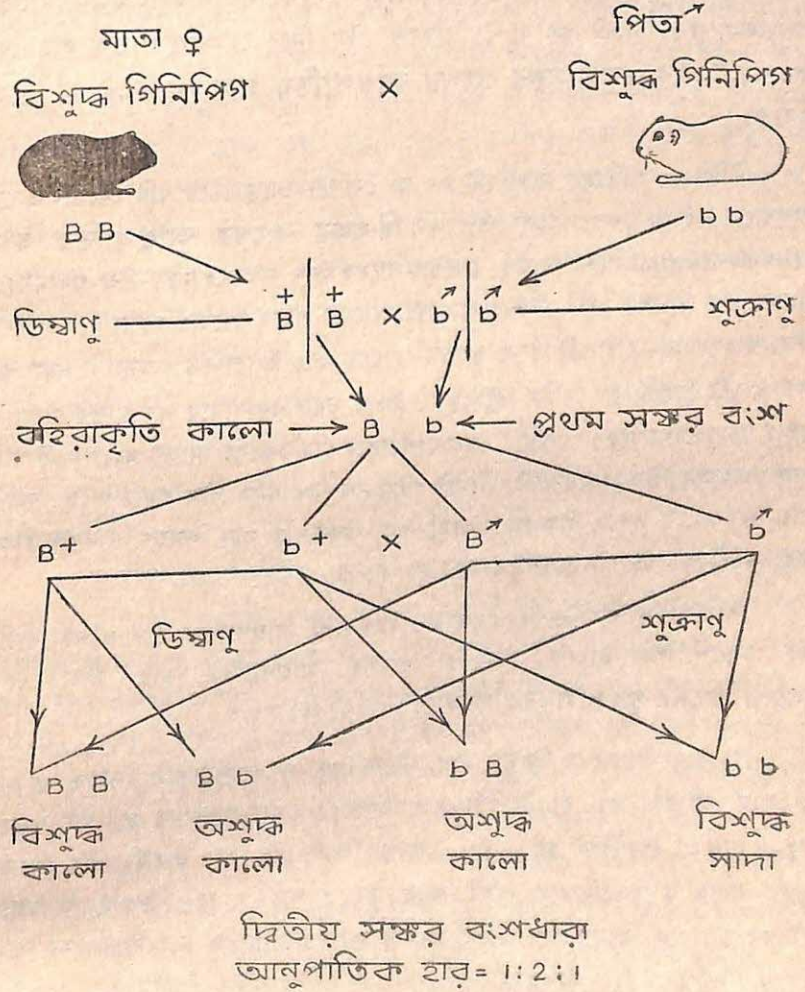
মেণ্ডেল **চতুর্থ পরীক্ষা** ক'রে দেখলেন যে, মসৃণ বীজ প্রদানকারী মটরগাছগুলির ফুলের মধ্যে আবার যদি পরাগ-সংযোগ ঘটানো যায়, তাহলে আরও পরিষ্কার বংশগতির ধারা বোঝা যায়। উপরোক্ত কয়েকটি গাছ আবার মসৃণ বীজ ধারণ করেছে এবং বাকী কয়েকটি গাছের বীজের মধ্যে কিছু অমসৃণ বীজ সৃষ্টি হয়েছে। মসৃণ বীজ প্রদানকারী মটরগাছে কিছু অমসৃণ বীজ-প্রদেয় গুণও রয়ে গিয়েছে। তিনটি মসৃণ হারের মধ্যে দেখা গেল একটিমাত্র বিশুদ্ধ মসৃণ প্রদেয় বীজ গাছ, আর বাকী-দুটি বীজের গুণ মসৃণতা প্রকট হলেও, এরা দ্বিতীয় সঙ্কর বংশের বীজের ধারা বহন করে। মোটের উপর তিনটির মধ্যে বিশুদ্ধ মসৃণ একটি আর অশুদ্ধ মসৃণ দুটি। সুতরাং দ্বিতীয়

সঙ্কর বংশের বীজের গাছে একটি বিশুদ্ধ মসৃণ, দুটি অশুদ্ধ মসৃণ এবং একটি বিশুদ্ধ অমসৃণ। এগুলির আনুপাতিক হার 1 : 2 : 1.

ব্যাখ্যা ঃ জিন বা বংশাণুগুলির সমন্বয়ে প্রাণসূত্র বা ক্রোমোজোমের আকার সৃষ্টি হয়, এবং এই জিনগুলিই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আধার, ধারক ও বাহক। বিয়োজন-বিভাজনের সময় জোড়া বা দুই প্রস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোমগুলি সাথীহারা অবস্থায় থাকে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে আবার জোড়া ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়। প্রথম সঙ্কর বংশের গাছ পিতা-মাতার কাছ থেকে যে দুটি ক্রোমোজোম পায়, তার একটিতে থাকে মসৃণ বীজের গুণ (ম) ও অন্যটিতে থাকে অমসৃণ বীজের গুণ (অ)। দেখা গেছে, প্রথম সঙ্কর বংশের প্রত্যেকটি বীজ মসৃণ। এর কারণ, পিতামাতার যে-সব গুণ বা লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়, তাদের মধ্যে কতকগুলি **প্রকট** (*Dominant*) এবং কতকগুলি **প্রচ্ছন্ন** (*Recessive*) অবস্থায় থাকে। প্রথম সঙ্কর বংশে মসৃণতা গুণটি অমসৃণতা গুণের অপেক্ষা প্রকট হওয়ায় বীজগুলি সব মসৃণ হতে দেখা যায়। আবার প্রথম সঙ্কর বংশ অশুদ্ধ, কারণ এতে মসৃণতা ও অমসৃণতা এই দুইটি বিপরীত গুণ বিদ্যমান—একটি প্রকট এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন। বংশাণু বা জিন, যার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিহিত থাকে, তার সত্তা সবসময় স্বাধীন অবস্থায় থাকে। যখন ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা বংশাণুগুলির বিচ্ছেদ ঘটে তখন একটি বংশাণু সহসংস্থ বংশাণু ছেড়ে শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে চলে যায়। তাই দ্বিতীয় সঙ্কর বংশে দু'রকমের গাছ পেলেও, প্রাণসূত্রের নতুন বিন্যাস অনুযায়ী তিন রকমের বীজ-প্রদানকারী মটরগাছ দেখা যায়। তখন জিনের মধ্যে থাকা স্বাধীন গুণগুলি দ্বিতীয় সঙ্কর বংশে প্রকট হয়ে ওঠে।

জীব-বিজ্ঞানীরা মেণ্ডেল-এর উপরোক্ত সূত্রকে নানা রকমের প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিগের মধ্যে জনন ঘটিয়ে দেখা যায় যে, প্রথম সঙ্কর বংশের গিনিপিগের রঙ সব কালো হয়েছে। এই বহিরাকৃতির রঙকে **ফিনোটাইপ** (*Phenotype*) বলা হয়। কালো রঙের জন্য যে জিন (BB) গিনিপিগের ক্রোমোজোমে আছে, সেটি **প্রকট** বা **ডমিন্যাণ্ট** (*Dominant*), তাই সেটি প্রথম সঙ্কর বংশধারায় প্রকাশ পেয়েছে। সাদা রঙের জন্য যে জিন (bb) গিনিপিগের ক্রোমোজোমে আছে, সেটি **প্রচ্ছন্ন** বা **রিসেসিভ** (*Recessive*), তাই সেটি প্রথম সঙ্কর বংশধারার সন্তানদের ক্রোমোজোমে থাকলেও, বহিরাকৃতিতে বিকাশলাভ করে না। প্রথম সঙ্কর বংশের ক্রোমোজোমে (Bb) জিন থাকলেও, রঙ কালোই হয়, কিন্তু জিন-ঘটিত বা

জিনোটাইপ (*Genotype*) (Bb) থাকায়, এরা **সঙ্কর** (*Hybrid*) ধারা। এখন এই সঙ্কর সন্তান-সন্ততির মধ্যে জনন-ক্রিয়া সম্পাদন করলে দেখা যায় যে, চার রকমের গিনিপিগের সৃষ্টি হচ্ছে। তিন রকমের কালো গিনিপিগ, যেমন BB, Bb, bB এবং একটি সাদা—bb। বিশুদ্ধ কালোর (BB) সঙ্গে বিশুদ্ধ কালোর জনন করালে, দেখা যাবে যে, সব সন্তান-সন্ততি বিশুদ্ধ কালোই হবে। আবার বিশুদ্ধ সাদার (bb) সঙ্গে



চিত্র 56—মেণ্ডেল-এর পরীক্ষা (প্রাণী)।

বিশুদ্ধ সাদার জনন করালে দেখা যাবে যে, সব সন্তান-সন্ততি বিশুদ্ধ সাদাই হবে। কিন্তু অশুদ্ধ কালোর (Bb) সঙ্গে অশুদ্ধ কালোর জনন করালে আবার বিশুদ্ধ কালো, অশুদ্ধ কালো ও বিশুদ্ধ সাদা রঙের গিনিপিগ সৃষ্টি হবে এবং তা হবে 1 : 2 : 1 আনুপাতিক হারে। দ্বিতীয় সঙ্কর বংশের সন্তান-সন্ততিরা 1 : 2 : 1 আনুপাতিক হারেই সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মেণ্ডেল-সাহেবের সূত্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয় জীবেই কার্যকরী হচ্ছে এবং বংশগতির ধারার নিয়মগুলিও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মেণ্ডেল-সাহেব একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যগত জিন নিয়ে যে আনুপাতিক হার বের করলেন, তাকে **একক সঙ্কর বংশের আনুপাতিক হার** (*Monohybrid ratio*) বলা হয়।

উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের মধ্যে দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে যদি মেণ্ডেলের সূত্র অনুসারে পরীক্ষা করা যায়, তাহলে **দ্বি-সঙ্কর বংশের আনুপাতিক হার** (*Dihybrid ratio*) পাওয়া যায়। মেণ্ডেল-সাহেব মসৃণ ও হলদে মটর-বীজ-প্রদানকারী গাছের সঙ্গে অমসৃণ সবুজ বীজ-প্রদানকারী গাছের পরাগ-সংযোগ ঘটান। একদিকে মসৃণ ও হলুদ রঙ—এই দুটি বিশুদ্ধ গুণ ধরা হয়েছে এবং অপরদিকে অমসৃণ ও সবুজ রঙ আরও দুটি বিশুদ্ধ গুণ নেওয়া হয়েছে। প্রথম সঙ্কর বংশধারায় সব গাছই মসৃণ ও হলদে রঙের দেখা যায়। দ্বিতীয় সঙ্কর বংশধারায় চার রকমের গাছের মধ্যে নয়টি গাছ মসৃণ ও হলদে বীজ-প্রদানকারী, তিনটি গাছ মসৃণ ও সবুজ বীজ-প্রদানকারী, তিনটি গাছ অমসৃণ ও হলদে বীজ-প্রদানকারী এবং একটিমাত্র গাছ অমসৃণ ও সবুজ বীজ-প্রদানকারী। এদের আনুপাতিক হার হ'ল 9 : 3 : 3 : 1.

গিনিপিগ-জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত আনুপাতিক হার পাওয়া যায়। এই আনুপাতিক হারকে দ্বি-সঙ্কর বংশের আনুপাতিক হার বলা হয়। **মেণ্ডেলিজমের সূত্রগুলি** মোটামুটিভাবে নিচে দেওয়া হ'ল :

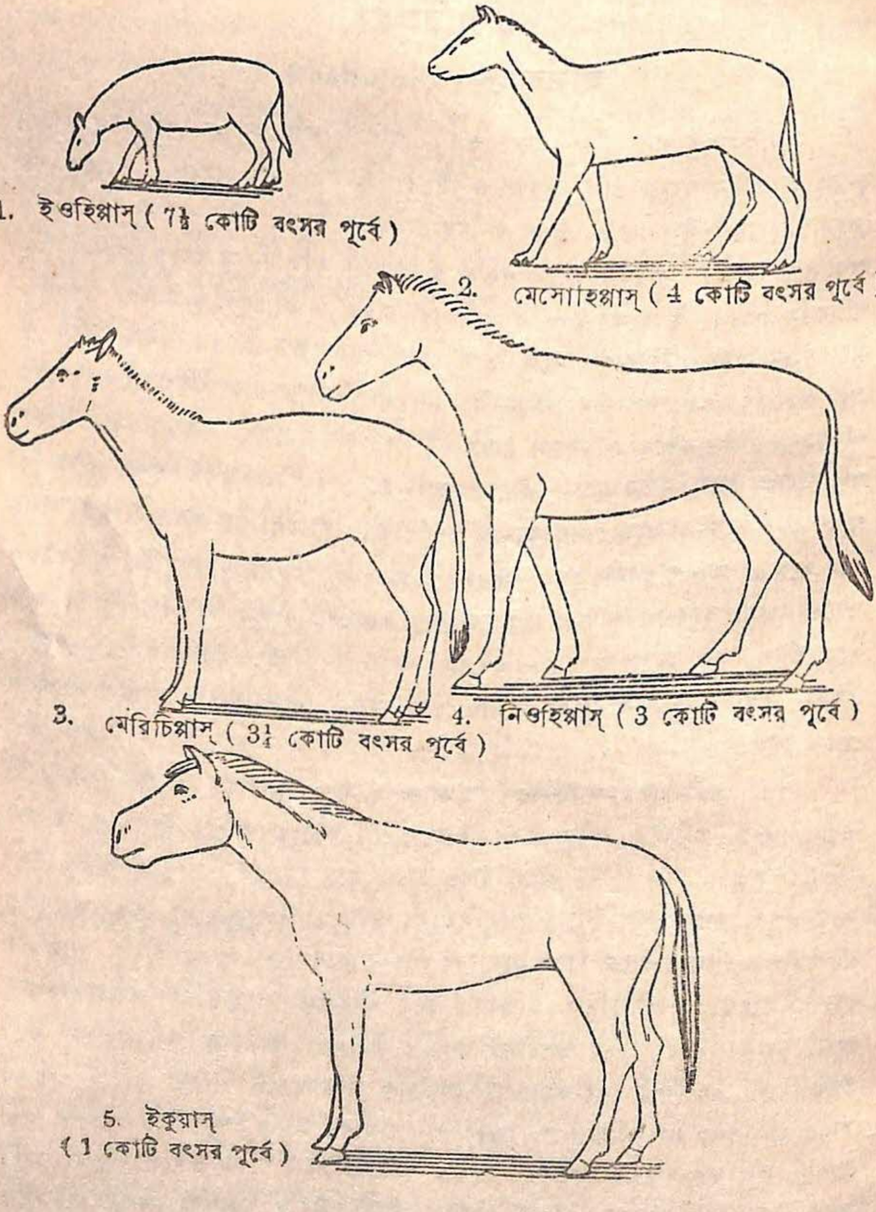
(1) ক্রোমোজোমের জিনের মধ্যে জীবের গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত থাকে। যে-কোন জীবের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জোড়া জিনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। (2) জোড়া জিনের যে-কোন একটি অপর জিনের গুণকে প্রচ্ছন্ন ক'রে নিজেকে প্রকট ক'রে তুলতে পারে। (3) ডিম্বাণু বা শুক্রাণু সৃষ্টি হবার সময়ে জিনের মধ্যে একটি জিন-ই তাদের হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকতে পারে। (4) বংশগতি-সম্পন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাধীন সত্তা সব সময় স্থায়িভাবে ক্রোমোজোমে থাকে এবং সেটিকে আলাদাভাবে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিব্যক্তি (Evolution)

ক্রমবিকাশই অভিব্যক্তির প্রকৃত অর্থ। পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। ভূ-ত্বক্ প্রতিদিন সূর্যের তাপ, বাতাস ও বৃষ্টিতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সৌরজগৎও কোনদিনই স্থিতিশীল নয়। আজ যে গ্রহ যে-স্থানে আছে, কাল হয়তো তা আরও দূরে সরে যাবে। পৃথিবীর সৃষ্টির পর হতে এইভাবে প্রতিদিন ভূ-ত্বকের কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। ভূ-ত্বকের উপর বসবাসকারী উদ্ভিদ্ ও প্রাণিকুল ভূ-ত্বকের পরিবর্তন এবং নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের এই পরিবর্তন হঠাৎ হয় না, ধীরে ধীরে ধারাবাহিকভাবে তাদের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠনে পরিবর্তন দেখা যায়। জীবজগতের এইরূপ ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। এইরূপ নূতন নূতন জীবগুলি পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন হয়। জীবের এইরূপ ধীরে অথচ ধারাবাহিক পরিবর্তনই তাদের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির শেষ নাই। পৃথিবীর স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে জীবের ক্রমবিকাশের গতিও অব্যাহত থাকে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের বহু তত্ত্বে এইরূপ ক্রমবিকাশের নানাবিধ প্রমাণ দেখা যায়। নিচে বিবিধ তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল ঃ

১। **জীবাশ্ম-ঘটিত প্রমাণ** (*Geological* or *Palaeontological evidence*) ঃ পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যে জীবের অস্তিত্ব ছিল না, এ-কথা সর্ববাদিসম্মত। পরে ভূ-ত্বক্ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে বিবিধ শিলাস্তরে গঠিত হয়। আগ্নেয়শিলা, রূপান্তরিত শিলা ও পাললিক বা স্তরীভূত শিলার মধ্যে কেবল পাললিক বা স্তরীভূত শিলার ভাঁজে ভাঁজে নানাবিধ জীবের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পাললিক শিলার চাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবজন্তু ও গাছপালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। এই প্রস্তরীভূত প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌কে **জীবাশ্ম** (*Fossil*) বলা হয়। সাধারণতঃ প্রাণীদের দেহ-কঙ্কালের হাড়গুলি জীবাশ্মরূপে পাওয়া যায়। গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির **ছাপ** (*Cast* বা *Imprint*) পাথরের উপর সম্পূর্ণভাবে থাকতে দেখা যায়। বড় বড় গাছের কাণ্ডগুলি পাথরে পরিণত হয়। মেরু-অঞ্চলে বরফের মধ্যে প্রাণীদের সম্পূর্ণ জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সাইবেরিয়ার বরফের ভেতর এইভাবে

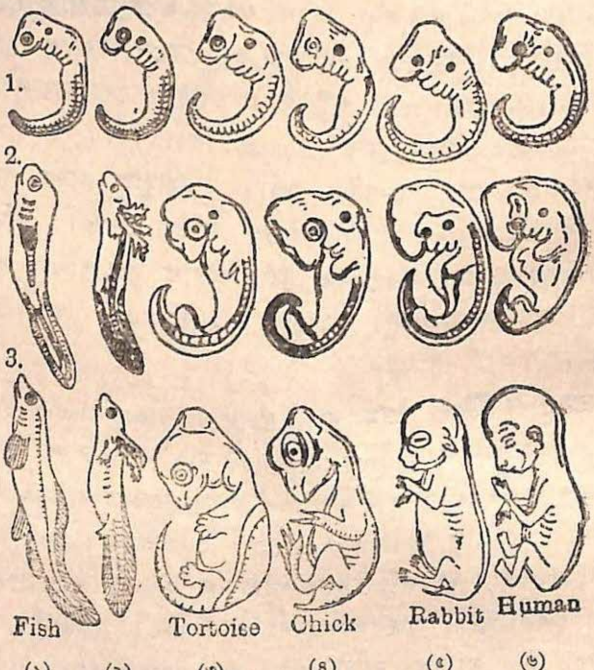


চিত্র 57—ঘোড়ার ক্রমবিকাশ।

ম্যামথের (*Mammoth*) জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ম্যামথ হাতির পূর্বপুরুষ। এইভাবে প্রায় ৫০ কোটি বছরের আগেকার প্রাণীদের জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। জীবাশ্মের আবিষ্কারের ফলে ক্রমবিকাশের বা অভিব্যক্তির ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয়। ঘোড়ার ক্রম-পরিণতির সাক্ষ্য হিসাবে আজ পর্যন্ত ২৪০টি জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ছয় কোটি বছর আগে ঘোড়ার বিড়ালাকৃতি আদিপুরুষটি সৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন **ইওহিপ্পাস্** (*Eohippus*)। ইওহিপ্পাসের সামনের পায়ে চারটি ও পিছনের পায়ে ছিল তিনটি আঙুল। তারপর সৃষ্ট হয় **অরোহিপ্পাস্** (*Orohippus*)—ঘোড়ার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্রমে ক্রমে **মেসোহিপ্পাস্** (*Mesohippus*), **মেরিচিপ্পাসের** (*Merychippus*) সৃষ্টি হয়। মেরিচিপ্পাসের ক্রম-পরিণতির ফলে বর্তমান ঘোড়ার মতো **ইকুয়াসের** (*Equus*) বিকাশ হয়। ইকুয়াস-ই বর্তমান ঘোড়া। এদের গলা লম্বা, পা-গুলিও লম্বা। মধ্যমাঙ্গুলি এদের সমগ্র দেহভার রক্ষা করে। বিবিধ প্রকারের উদ্ভিদ্-জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। **টেরিডোস্পার্মী** (*Pteridospermae*) নামক একশ্রেণীর উদ্ভিদ্-জীবাশ্ম বহু পাওয়া গেছে। এদের দেহের গঠন আধা-ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদের মতো এবং আধা-সব্‌জি-জাতীয় উদ্ভিদের মতো।

২। **ভ্রূণ-ঘটিত প্রমাণ** (*Embryological evidence*)ঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবন-আরম্ভে ভ্রূণই হচ্ছে প্রথম সোপান। মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি, গিনিপিগ ও মানুষের ভ্রূণগুলি প্রথম অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করলে, তাদের বাহ্যিক আকারে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এমনকি উপরি-উক্ত প্রাণীদের প্রথম অবস্থার ভ্রূণগুলি একত্র ক'রে রাখলে, পরে কোন্ ভ্রূণটি কার তা চিনতে পারা যায় না। ব্যাঙের লার্ভা—ব্যাঙাচির দেহে ফুলকা, ফুলকা-ছিদ্র, লেজ ও পাখনা দেখা যায়। ব্যাঙাচির রক্ত-সঞ্চালন-প্রণালীর ধারা ঠিক মাছের মতো এবং এরা মাছের মতো সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু ব্যাঙাচির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মাছের এমন সাদৃশ্য কেন? কারণ, মাছ হতেই ব্যাঙের ক্রমপরিণতি এবং জীব-জগৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ। এমনকি সাপ, পাখি, গিনিপিগ ও মানুষের ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় ফুলকা ও ফুলকা-ছিদ্র দেখা যায়। ভ্রূণের এইরূপ স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রেই বৈজ্ঞানিক **হেকেল** (*Haeckel*) পুনরাবৃত্তিবাদের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, **প্রতিটি জীব তার ভ্রূণ-অবস্থায়** (*Ontogeny*) **তার পূর্বপুরুষদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থার বিবিধ দশাগুলিকে** (*Phylogeny*) **পুনরাবৃত্তি করে** (*Ontogeny repeats or recapitulates phylogeny*)। এই মতবাদ উদ্ভিদের পক্ষেও প্রয়োগ করা যায়।

মস্ উদ্ভিদের **প্রোটোনিমা** দশাটি বা **ফার্ন** উদ্ভিদের **প্রোথ্যালাস** দশাটির সঙ্গে আদি উদ্ভিদ্ শ্যাওলার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এই প্রোটোনিমা এবং প্রোথ্যালাস দশা হচ্ছে মস্ ও ফার্ন উদ্ভিদের ভ্রূণ-দশা। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মাছ-জাতীয় প্রাণী হতেই সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ মাছ-জাতীয় প্রাণীদের ক্রমবিকাশের পরিণতিই আজকের মানুষ এবং শ্যাওলা-জাতীয় উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের ফলে আজকের সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র 58—বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ : ভ্রূণ অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্য অভিব্যক্তিবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

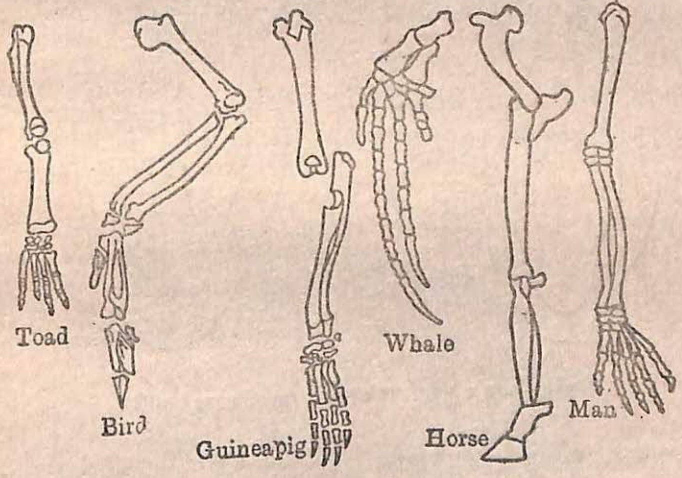
১. মাছ ; ২. স্যালামাণ্ডার ; ৩. কচ্ছপ ; ৪. মোরগ ; ৫. খরগোশ ; ৬. মানুষ।

৩। **জীব-জগতের শ্রেণীবিভাগ** (*Classification of plants and animals*) : উদ্ভিদ-জগৎ ও প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ পরোক্ষভাবে অভিব্যক্তির প্রমাণস্বরূপ। এককোষী প্রাণী বা প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণীগুলি আদি প্রাণী। এদের ক্রমপরিণতির ফলে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে এবং পেরিফেরা পর্বের প্রাণীরাই প্রথম বহুকোষী প্রাণী। তারপর বহুকোষ-বিশিষ্ট প্রাণীদের দেহে স্তরের সৃষ্টি হ'ল। প্রতিটি স্তরের কার্যকারিতা ও কোষ-বৈশিষ্ট্যও বাড়তে লাগল। এইভাবে সিলেন্টেরটা

পর্বের বিবিধ প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটল। সুতরাং জীব-জগতের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধপরতার উপর নির্ভরশীল এবং এই সম্বন্ধপরতাই অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

৪। **কোষতত্ত্ব-ঘটিত প্রমাণ** (*Histological evidence*) : একটি অতিকায় হাতির দেহ এবং এককোষী অ্যামিবার দেহ একই মালমসলা দিয়ে সৃষ্ট। অ্যামিবার কোষের সঙ্গে হাতির দেহের কোষের কোনও প্রভেদ নাই। উভয়ের দেহ-কোষ আকারে ও গঠনে এক। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন একই পদ্ধতিতে হয়। সুতরাং দুটি প্রাণীর মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন, তাদের ভিত্তি এক। পরে জীবকোষের ভিন্নরকম গঠন ও পরিবর্তন ক্রমবিকাশকে সম্ভবপর করেছে।

৫। **মেরুদণ্ডীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মূল গঠনের সাদৃশ্য** (*Similarity of Vertebrate organs*) : ব্যাঙের অগ্রপদ, পাখির ডানা, গিনিপিগের অগ্রপদ, তিমির সামনের পাখা (Flipper), ঘোড়ার পা এবং মানুষের হাত বস্তুতঃ ভ্রূণ

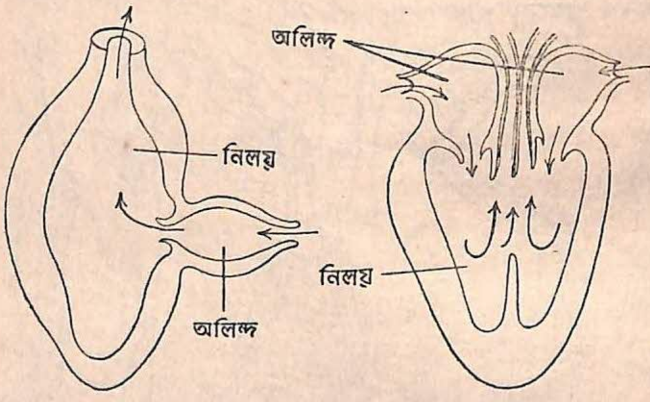


চিত্র 59—বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদের হাড়।

হতে একই পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিবিধ পরিবেশের জন্য এদের কার্যকারিতা বিভিন্ন। বস্তুতঃ ব্যাঙের অগ্রপদ, পাখির ডানা, গিনিপিগের অগ্রপদ, তিমির সামনের পাখা, ঘোড়ার পা এবং মানুষের হাত কেটে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—তাদের হাড়ের পরিস্থাপন, মাংসপেশী ও স্নায়ুর সংস্থান প্রতিক্ষেত্রেই একপ্রকার। প্রতিটি প্রাণীর অগ্রপদ—ডানাই হোক বা পাখাই হোক, তা **প্রগণ্ডাস্থি** (*Humerus*), **রেডিও-আল্না** (*Radio-ulna*), **কব্জির হাড়** (*Carpal*) ও

মেটাক্যারপ্যাল (*Metacarpal*) হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। মেরুদণ্ডীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের সৌসাদৃশ্য ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য। সেইরূপ সবৃজি-উদ্ভিদের সবুজ কাণ্ড, আলু, ধুতুরার কাঁটা এবং ঝুমকোলতার আকর্ষ—এদের গঠন ও আকৃতি বিভিন্নরূপ। কিন্তু যদি উপরি-উক্ত প্রতিটি অঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে এরা বস্তুতঃ সকলেই কাণ্ড। **সৃষ্টি একবারই হয়, কিন্তু তাদের বিকাশ হয় বার বার, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে।** সুতরাং কাণ্ডের ক্রমবিকাশই বিবিধ উদ্ভিদের উদ্ভব সম্ভব করেছে।

৬। **বিবিধ যন্ত্রের তুলনামূলক প্রমাণ** (*Comparative anatomy*)ঃ জীব-জগতের সৃষ্টি একবারই। দুর্বার গতিতে এই প্রাণস্রোতের প্রবাহ



চিত্র 60—মাছ ও সরীসৃপের হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত-চলাচলের রেখাচিত্র।

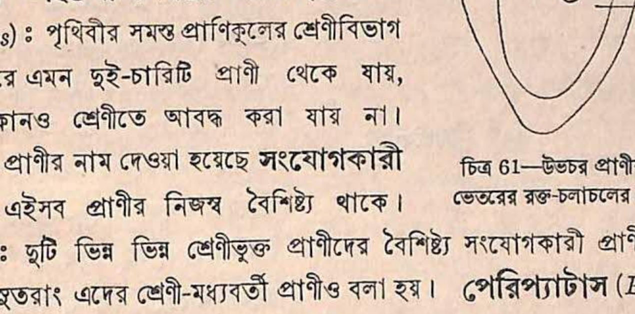
সময় ও পরিবেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এই প্রবাহস্রোতে এসেছে অপরূপ রূপান্তরের ঢেউ। এক-একটি যন্ত্রের সৃষ্টির পরে আসে তাদের পরিবর্তন। মাছের হৃদ্‌যন্ত্র অতি সাধারণ। একটি নিলয় ও একটি অলিন্দের সমন্বয়ে এটি গঠিত। ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রে আরও একটু পরিবর্তন দেখা যায়। পাশাপাশি দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয়ের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের বিকাশ আরও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে। সরীসৃপের হৃদ্‌যন্ত্রে একটিমাত্র নিলয় থাকলেও, তার মধ্যে একটি উঁচু মাংসল-প্রাচীর থাকে। এই মাংসল-প্রাচীরটি স্তন্যপায়ী গিনিপিগের হৃদ্‌যন্ত্রে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নিলয়টিকে সম্পূর্ণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত

করে। মাছের সরল হৃদ্‌যন্ত্রটি ধীরে ধীরে সময় ও পরিবেশের মাধ্যমে বিকাশলাভ করে এবং আজকের মানবের হৃদ্‌যন্ত্রটি সেই মাছের হৃদ্‌যন্ত্রটির পরিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আজকের মানুষ মাছের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্রমবিকাশের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। বিবিধ মেরুদণ্ডীর এক-একটি অঙ্গের সৌসাদৃশ্য ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য।



চিত্র 61—উভচর প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের ভেতরের রক্ত-চলাচলের রেখাচিত্র।

৭। **সংযোগকারী প্রাণী** (*Connecting links*)ঃ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিকুলের শ্রেণীবিভাগ করার পরে এমন দুই-চারিটি প্রাণী থেকে যায়, যাদের কোনও শ্রেণীতে আবদ্ধ করা যায় না। এইসকল প্রাণীর নাম দেওয়া হয়েছে **সংযোগকারী প্রাণী**। এইসব প্রাণীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সাধারণতঃ দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সংযোগকারী প্রাণীদের মধ্যে থাকে। সুতরাং এদের শ্রেণী-মধ্যবর্তী প্রাণীও বলা হয়। **পেরিপ্যাটাস** (*Peripatus*)

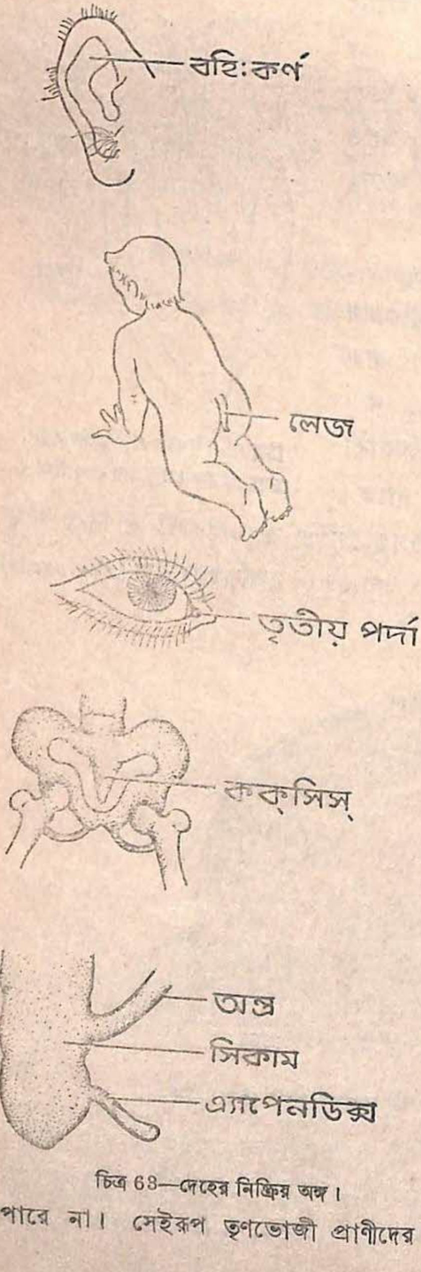


চিত্র 62—স্তন্যপায়ী-শ্রেণীভুক্ত আদিম হংসচঞ্চু প্রাণী বা মনোট্রিম।

নামক একপ্রকার প্রাণীর মধ্যে সন্ধিপদশ্রেণী ও অঙ্গুরীমাল শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য থাকে। হংসচঞ্চু, পিঁপড়াভুক্‌ ও ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেও দুই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য থাকে। এরা আধা-সরীসৃপ এবং আধা-স্তন্যপায়ী। **হংসচঞ্চু** (*Duck-billed mole*)

বস্তুতঃ স্তন্যপায়ী। এদের দেহ লোমে আবৃত, কিন্তু শরীরের উত্তাপ ধ'রে রাখবার ক্ষমতা নাই। আবার, এরা সরীসৃপের মতো ডিম পাড়ে। ডিম হতে শাবক বের হয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করে। এইসমস্ত প্রাণী একপ্রকার জীব হতে অন্যপ্রকার জীবের অভিব্যক্তির জীবন্ত সাক্ষী।

৮। দেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (*Vestigeal organ*)ঃ যেসকল অঙ্গ একটি নির্দিষ্ট জীবে সক্রিয় (functional), অথচ অন্য জীবে তার অস্তিত্ব থাকলেও কর্মক্ষমতা-রহিত, তাদের বলা হয়—নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। উট পাখি বা এমু পাখি স্থলচর। এদের ডানা আছে, কিন্তু ডানাগুলি বহু যুগ ধ'রে অব্যবহারের জন্য এতই অপুষ্ট যে, তারা উড়তে পারে না। এদের ডানার প্রয়োজন নাই, তবু কোন্ অতীত পূর্বপুরুষের নিকট হতে অর্জিত ডানা আজও রয়ে গেছে। মানুষের লেজ নাই, তবু কোন্ অতীত পূর্বপুরুষের নিকট হতে অর্জিত লেজের হাড়টি আজও মেরুদণ্ডের শেষে দেখা যায়। গোরু, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতি প্রাণী বহিঃকর্ণ নাড়াতে পারে। কান নাড়াতে হলে যে-যে মাংসপেশীর দরকার, সেইসমস্ত মাংসপেশী মানুষের বহিঃকর্ণেও আছে। কিন্তু সেগুলি এতই অপুষ্ট যে, মানুষ তা নাড়াতে পারে না। সেইরূপ তৃণভোজী প্রাণীদের সক্রিয় **সিকামটি** (*Caecum*) ও মানুষের



চিত্র 63—দেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ।

নিষ্ক্রিয় **অ্যাপেন্‌ডিক্স** (*Appendix*)। এইসকল অপুষ্ট অঙ্গের অবস্থান জীব-জগতের সম্বন্ধপরতার নিদর্শন এবং ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য।

৯। **শারীরিক রক্তের গুণাগুণের সাদৃশ্য** (*Physiological evidence*)ঃ বানরের রক্তের সঙ্গে গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে, তা **স্ফটিকাকারে** (*Crystal*) পরিণত হয়। এই স্ফটিকগুলিকে **হিমোগ্লোবিন স্ফটিক** (*Hæmoglobin crystal*) বলা হয়। দেখা গেছে যে, মানুষের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার—বানরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের মতো। কিন্তু কুকুর বা ঘোড়ার হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের মতো হলেও বহুলাংশে ভিন্ন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের চেয়ে বা ঘোড়ার চেয়ে বানর-ই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। বানর হতেই ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

জীবের ক্রমবিকাশ হতে সময় লাগে কোটি-কোটি বছর। অতি ধীরে অথচ ধারাবাহিকভাবে প্রাণীদের অভিব্যক্তি ঘটে। অভিব্যক্তি যে কি-ভাবে ঘটে, সে-বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিকের মতবাদ জানা যায়। তাঁদের মধ্যে **জন লামার্ক** (*John Lamarck*, 1744—1829), **চার্লস ডারউইন** (*Charles Darwin*, 1809—1882) এবং **ডি ভ্রিস** (*De Vries*, 1848—1935)-এর মতবাদই প্রধান। নিম্নে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিকদের মতবাদগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

জন লামার্ক (1744—1829)-এর **মতবাদ** ঃ প্রধানতঃ দুটি তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে লামার্ক তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, জীবদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের উপর তাদের ক্রমবিকাশ নির্ভরশীল। তাঁর মতে, যদি কোন প্রাণী পরিবেশের আওতায় কোন একটি অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করে, তা হলে সেই অঙ্গটি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তার জটিলতাও বেড়ে যায়। এইভাবে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অঙ্গটি প্রাণীর বহিরাকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। আবার তার বিপরীতও হয়। কোন প্রাণী তার বিশিষ্ট একটি অঙ্গ ব্যবহার করল না, অথবা নূতন পরিবেশে অঙ্গটির কোন প্রয়োজন না থাকায়, তা অব্যবহৃতই থেকে গেল। লামার্ক-এর মতে, অব্যবহৃত অঙ্গটি ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এবং পরে সেই অঙ্গটি একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়। লামার্ক-এর এই **ব্যবহার** এবং **অব্যবহার মতবাদ** (*Law of use and disuse*) সর্বজন-সমর্থিত। কিন্তু এর দ্বারা অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি উপরি-উক্ত মতবাদের সাহায্যে তাঁর দ্বিতীয় মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, প্রাণীদের জীবনকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার

বা অব্যবহারের ফল ধীরে-ধীরে সময়ের এবং পরিবেশের মাধ্যমে তাদের সন্তান-সন্ততিতে প্রকাশ পায়; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে, তা উত্তরাধিকার-সূত্রে বংশপরম্পরায় পরিলক্ষিত হয় (*The result of use or disuse is handed over to the progeny by inheritance*)। শুধু তাই নয়, এই বৈশিষ্ট্যটি আরও ধারাবাহিকভাবে বেড়ে একটি নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করে। **প্রাণীদের জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্য-গুলি উত্তরাধিকারসূত্রে বংশপরম্পরায় পরিলক্ষিত হওয়াই** (*Inheritance of acquired characters*) **জন লামার্ক-এর দ্বিতীয় মতবাদ।** জন লামার্ক উদাহরণ দিয়ে তাঁর মতবাদ প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলেই জিরাফের অগ্রপদ ও গ্রীবা ধীরে-ধীরে সময়ের ও পরিবেশের মাধ্যমে বড় হয়েছে। আজকের জিরাফের মতো আগেকার জিরাফের অগ্রপদ ও গ্রীবা এত লম্বা ছিল না। পূর্বপুরুষদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে আজকের জিরাফ তার অগ্রপদ ও গ্রীবা অর্জন করেছে।



চিত্র 64—উটপাখি।

চার্লস ডারউইন (*Charles Darwin*, 1809—1882): চার্লস ডারউইন-এর মতবাদ মোটামুটি অভিব্যক্তির প্রবাহকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রমাণিত করে। তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক **ওয়ালেস** (*Wallace*) বহুবিধ তথ্যের দ্বারা সুদৃঢ় করেন। পৃথিবীতে সদাসর্বদা দুটি তথ্যের স্থিতি থাকে। প্রথমটি প্রাণীদের বাস করবার স্থান এবং দ্বিতীয়টি খাদ্য। অবশ্য খাদ্য-উৎপাদন সাধারণভাবে কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু ভূ-ত্বকের বাসস্থান বাড়াবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি ক্রমাগত হচ্ছে। তার ফলে, বাসস্থান ও আহারের জন্য প্রাণীদের মধ্যে নিয়ত সংগ্রাম লেগেই আছে। প্রত্যেক প্রাণী উপযুক্ত বাসস্থান ও আহারের জন্য সংগ্রামে রত। এটাই জীবের **জীবন-সংগ্রাম** (*Struggle for existence*)। এই জীবন-সংগ্রামে যারা বিজয়ী তারাই কেবল প্রকৃতির সঙ্গে বেঁচে থাকে, আর যারা বিজিত তারা ধীরে-ধীরে বিলুপ্ত হয়। উন্নত, বিজয়ী প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং যেসকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা বিজয়ী, সেইসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এইভাবে নিজের বাসিন্দাদের বেছে নেয়। চাষী যেমন পুষ্ট চারাগাছগুলিকে বেছে-বেছে রোপণ করে এবং অপুষ্ট চারাগাছগুলিকে ফেলে দেয়, তেমনি প্রকৃতি বলিষ্ঠ প্রাণিসমূহকে পালন করে এবং দুর্বল প্রাণিসমূহকে অনাদরে ত্যাগ করে। প্রকৃতির এই

নিয়মকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (*Natural Selection*) বলা হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন-ই মহামতি চার্লস ডারউইন-এর মতবাদ। জীবন-সংগ্রামে সফল হতে হলে, কতকগুলি যোগ্যতার প্রয়োজন। এই যোগ্যতাই বংশগতির সূত্রে প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে। প্রকৃতির নির্বাচন কতকগুলি তথ্যের মাধ্যমে বিকাশলাভ করে। নিচে তথ্যগুলির বিবরণ দেওয়া হ'ল :

(ক) **বংশবৃদ্ধির অত্যধিক হার** (*Prodigality of production*) : জীবদের বংশবৃদ্ধির হার খুবই বেশী। মাছ একসঙ্গে কয়েক হাজার ডিম পাড়ে। যদি প্রত্যেকটি ডিম পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়ে বেঁচে থাকত, তা হলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ কেবল মাছেই পূর্ণ হয়ে যেত। জীবের এইরূপ অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হলেও, তাদের আহার বা বাসস্থানের আয়তন বৃদ্ধি পায় না। ফলে, প্রাণীদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, জীবদের বংশবৃদ্ধির হার খুব বেশী হলেও, প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতায় তা প্রায় স্থিতিশীল থাকে। জীবদের জীবন-সংগ্রামই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রথম অস্ত্র।

(খ) **জীবন-সংগ্রাম** (*Struggle for existence*) : জীবদের জীবন-সংগ্রাম জন্ম থেকেই। প্রথমেই জীবদের সংগ্রাম লাগে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রখর রৌদ্র, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন, শীতাধিক্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে জন্ম হতেই প্রতিটি জীবকে সংগ্রাম করতে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে জীবের এই সংগ্রামকে **প্রাকৃতিক সংগ্রাম** (*Environmental struggle*) বলা হয়। জীব প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে-করতে বাড়তে থাকে এবং পূর্ণতা-প্রাপ্তির পরে আহার ও বাসস্থানের জন্য নূতন ক'রে সংগ্রামে রত হয়। একই **প্রজাতি-ভুক্ত** (*Species*) প্রাণীদের মধ্যে আহার ও বাসস্থানের জন্য নিজেদের মধ্যে অতি তীব্রভাবে সংগ্রাম চলতে থাকে। কারণ, একই প্রজাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। প্রাণীর এইরূপ সংগ্রামকে **সমপ্রজাতি-বিরোধ** (*Intra-specific struggle*) বলে। একই প্রজাতি-ভুক্ত যে-কোন প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের বিরোধ অতি তীব্রভাবে দেখা যায়। আবার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও বিরোধ দেখা যায়; যেমন—বিড়াল ইঁদুর খায়, বাঘ হরিণ খায়, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিড়াল, ইঁদুর, বাঘ ও হরিণ বিভিন্ন প্রজাতি-ভুক্ত। এই ধরনের বিরোধকে **বিসম-প্রজাতি-বিরোধ** (*Inter-specific struggle*) বলা হয়। সমপ্রজাতি ও বিসম-প্রজাতি এই দু'প্রকার বিরোধের মূলে কেবলমাত্র দুটি কারণ বিদ্যমান। তা হ'ল প্রাণীদের আহার ও বাসস্থান লাভ করার সমস্যা।

(গ) **যোগ্যতমের জয়** (*Survival of the fittest*)ঃ জীবন-সংগ্রামে যে-সমস্ত প্রাণী যোগ্যতার সঙ্গে জয়লাভ করতে পারে, কেবলমাত্র সেইসব প্রাণীই বেঁচে থাকে। বিজয়ী প্রাণীদের উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে-ধীরে আরও উন্নত হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনে কেবলমাত্র যোগ্যতম, সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীরাই নির্বাচিত হয়। এই সময়ে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাণীরা নিজদেহে **অভিযোজন** (*Adaptation*) করে। প্রাণীদের এই অনুকূল **পরিবৃত্তি** (*Variation*) এবং উহার অভিযোজন বিজয়ীকে জয়ী করায়। এইরূপ হিতকর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকতর শ্রেয়তা লাভ করে এবং বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধীরে-ধীরে প্রাণীর মধ্যে স্থায়িভাবে পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনই ক্রমবিকাশ-পদ্ধতিতে সক্রিয় রেখে এক-একটি নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

ডারউইন-এর মতে, **যেসকল বৈশিষ্ট্য প্রাণীদের পক্ষে অহিতকর সেগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। হিতকর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং বংশগতির** (*Heredity*) **মধ্যে দিয়ে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। যেসকল বৈশিষ্ট্য হিতকর নয়, আবার অহিতকরও নয়, সেগুলি যেমন, তেমনই থাকে এবং বংশগতির ধারা মেনে চলে।**

ডি ভ্রিস-এর মতবাদ (*De Vries*, 1848—1935)ঃ সাধারণতঃ জীবদের ক্রোমোজোমগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু কখনো কখনো দেখা গেছে যে, **জীবের জনন-কোষের ক্রোমোজোমগুলিতে হঠাৎ পরিবর্তন আসে।** পরিবর্তনের ফলে প্রাণিদেহে নানাপ্রকার পরিবর্তন দেখা যায়। এইরূপ পরিবর্তন সাধারণতঃ অনুকূল **পরিবৃত্তি** (*Variation*) হওয়ায়, বংশগতির ধারা মেনে চলে। প্রাণীদের দেহে উপরোক্তভাবে পরিবর্তন হঠাৎ আসে এবং স্বভাবতঃ এইরূপ পরিবর্তন স্থায়ী হয়। জীবদের জনন-কোষের ক্রোমোজোমগুলির পরিবর্তনকে **মিউটেশন** (*Mutation*) বলা হয়। মিউটেশন-ই ডি ভ্রিস-এর মতবাদ। মিউটেশন মতবাদ ক্রমবিকাশের প্রধান অস্ত্র। ডারউইন অনুকূল পরিবৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা কি-ভাবে হয়, সে-কথা ব্যক্ত করেননি। ডি ভ্রিস তা ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিককালে নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে ক্রোমোজোমের পরিবর্তন-সাধন সম্ভব হচ্ছে। আণবিক-রশ্মি-প্রয়োগে ক্রোমোজোমে পরিবর্তন হয়। আণবিক-বোমা-বিস্ফোরণের ফলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির বহু জাপানীর মধ্যে মিউটেশন-ঘটিত পরিবর্তন দেখা গেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভিযোজন

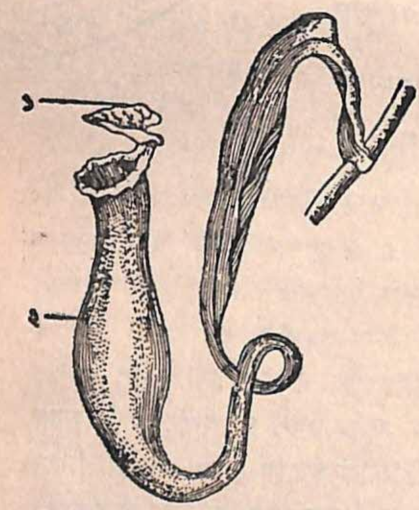
(Adaptation)

প্রকৃতির পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। তাই প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীব-জগৎকে চলতে হয়। এর ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বহিরাকৃতি বা অন্তর্গঠনে পরিবর্তন আসে। পরিবেশের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বা অন্যভাবে বলতে গেলে, এই সামঞ্জস্য-বিধানের কুশলতার উপর জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। **এই কাজে যে জীব যত কুশলী, তার অস্তিত্ব বজায় রাখার সম্ভাবনা সেই অনুপাতে তত বেশী। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে জীবনকে চলার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে বলা হয় অভিযোজন।** জীব-জগতে অভিব্যক্তির মতো অভিযোজনও সবসময়ে চলছে। কারণ, অভিযোজন এনে দেয় জীব-জগতের অধিবাসীদের বাঁচার পথ। জীবের জন্ম জলে। কিন্তু অভিব্যক্তি ও জীবদেহের অভিযোজনের ক্ষমতার ফলে জীবনের প্রসার ঘটেছে জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, এমনকি মাটির তলায়ও। সৃষ্টির দরবারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজনের কৌশল বা পন্থা দেখতে পাওয়া যায়। জীব-জগতের অভিযোজন-পন্থাগুলি মোটামুটিভাবে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তার একটি বিবরণ এক-এক ক'রে নিচে দেওয়া হ'ল :

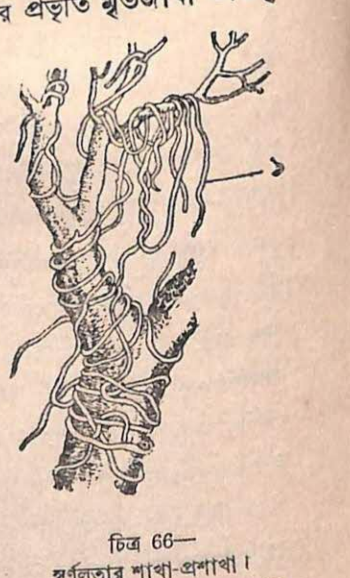
উদ্ভিদের অভিযোজন : আগেই বলা হয়েছে, অভিযোজন জীবের ধর্ম। খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে জীব নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং নিজের অস্তিত্ব ও বংশের অস্তিত্ব বজায় রাখে। অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় অধিগত হয়। তাই অভিযোজনও একপ্রকার জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার এবং এই হাতিয়ার বংশপরম্পরায় অধিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে জীবের অভিব্যক্তিকে বাস্তবে রূপদান করে।

উদ্ভিদের মধ্যে অভিযোজনের ব্যাপকতা দেখা যায়। **পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের অভিযোজন** ঘটপত্রী, ডিস্কিডিয়া, ঝাঁঝি ও সূর্যশিশির উদ্ভিদে দেখা যায়। এরা বাতাস বা মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না। অথচ উদ্ভিদের

পরিপোষণের জন্যে নাইট্রোজেন অনিবার্য। তাই এরা পাতার ফলককে নানারকম ভাবে রূপান্তরিত ক'রে পতঙ্গ ধরার জন্য ফাঁদ তৈরি করে এবং পতঙ্গ শিকার ক'রে নিজেদের গ্রন্থিরসের সাহায্যে পতঙ্গের দেহরস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। **পরভোজী উদ্ভিদেরা** তাদের পাতা, কাণ্ড, ফলক নানাভাবে অভিযোজিত ক'রে স্বভোজী উদ্ভিদের দেহ থেকে রস শোষণ করে। পাতাবিহীন **স্বর্ণলতা** পরভোজী উদ্ভিদের আদর্শ উদাহরণ। স্বর্ণলতার শাখা-প্রশাখা পোষক উদ্ভিদ্‌কে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে এবং কাণ্ড থেকে অস্থানিক মূল বের ক'রে পোষক উদ্ভিদের দেহে সেগুলিকে প্রবেশ করিয়ে খাদ্যরস শোষণ করে। তাই এই মূলগুলিকে চোষক-মূলক বলে। মনোট্রোপা, অ্যাগারিকাস ও মিউকর প্রভৃতি **মৃতজীবী উদ্ভিদ্‌** পচনশীল জৈব পদার্থের ভিতর হতে পরিপোষণের সামগ্রী শোষণ ক'রে জীবনধারণ করে। অনেক মৃতজীবী উদ্ভিদের গোড়ায় ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্‌ থাকায়, মৃতজীবী উদ্ভিদ্‌কে খাদ্য যোগায় এবং মিথোজীবীরূপে বাস করে। বড় পানা, কচুরীপানা ও ক্ষুদে পানা প্রভৃতি **জলজ উদ্ভিদের** অভিযোজন অক্সিজেন-আহরণের জন্য সাধিত হয়। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। এদের কাণ্ডের মধ্যে ও বৃন্তের মধ্যে প্রচুর বাতাস-থলি থাকে। ফলে, উদ্ভিদের ওজন কমে যায় এবং জলজ উদ্ভিদ্‌ জলের উপর ভাসতে থাকে। এর ফলে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে উদ্ভিদের কোন অসুবিধে হয় না এবং আলো প্রচুর পরিমাণে পায়। ভাসমান জলজ উদ্ভিদ্‌ তাই সহজে কাণ্ডের দ্বারা অঙ্গজ-জনন ও ফুল ধারণের দ্বারা যৌন-জননও করতে পারে। পদ্ম, শালুক প্রভৃতি



চিত্র 65—ঘটপত্রী ও তার একটি পাতা বড় ক'রে দেখানো হয়েছে : ১. কলসের ঢাকনা, ২. কলস।



চিত্র 66—
স্বর্ণলতার শাখা-প্রশাখা।

জলজ উদ্ভিদের পাতা জলের উপর থাকে আর এদের মূল মাটির ভেতর থাকে। এদের পত্র-ফলকে, মূলে ও রাইজোমে প্রচুর বাতাবকাশ বা বাতাস-থলি থাকে। বালুকাময় মৃত্তিকা বা মরুভূমিতে যে-সমস্ত উদ্ভিদ্ জন্মায়, তাদের **জাঙ্গল উদ্ভিদ্** বলা হয়। নানাভাবে এরা অভিযোজনের সাহায্যে নিজেদের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে। উদ্ভিদ্‌গুলি খর্বাকার। এদের কাণ্ড স্থূল, রসালো ও কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যাপটা হয়। পাতা থাকলেও, ছোট ও স্থূল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। এদের মূল মাটির অনেক নিচে জলের সন্ধানে এগিয়ে যায় এবং মূলে প্রচুর শাখা-প্রশাখা থাকে। বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়ায় মরুভূমির উদ্ভিদ্‌গুলি নিজ দেহে জল ভ'রে রাখে। মাটি শারীরবৃত্তীয়ভাবে শুষ্ক থাকায়, জাঙ্গল উদ্ভিদ্‌গুলি দেহের ভেতর জল ধ'রে রেখে নিজের পরিপোষণের কাজে লাগায়। পাতা ও কাণ্ড খুব ঘন রোম, কণ্টক বা চুন-জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা থাকে। এর জন্যে উদ্ভিদের বাষ্পমোচন খুবই কম হয়। পাতার মেসোফিল কণায় কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না। ফণিমনসা, ক্যাক্‌টাস, বাবলা, আকন্দ, ঘৃতকুমারী এবং পুনর্নবা প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গুলিকে জাঙ্গল উদ্ভিদ্ বলা হয়। সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলবর্তী লবণাক্ত এঁটেল মাটি বা জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকায়, উদ্ভিদের মূল মাটি থেকে জল-মিশ্রিত ধাতব পদার্থ শোষণ করতে পারে না। এই ধরনের মাটিকে **শারীরবৃত্তীয়ভাবে শুষ্ক মাটি** (*Physiologically dry soil*) বলে। গরান, কেওড়া, সুঁদরি প্রভৃতি **লবণাম্বু উদ্ভিদ্** তাই অভিযোজনের সাহায্য নেয়। এদের উচ্চতা বেশী হয় না ও পাতার আকার ছোট এবং স্থূল হয়। মাটির ভেতরকার অক্সিজেন সহজে পাওয়া যায় না, তাই এদের মূলগুলি মাটির ভেতর না প্রবেশ ক'রে সোজা মাটির উপরে শাখার মতো খাড়া ভাবে এগিয়ে যায়। এদের অগ্রাংশে অসংখ্য শ্বাস-রন্ধ্র থাকে। বাতাস থেকে অক্সিজেন শ্বাস-রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। তাই মূলগুলিকে শ্বাস-মূল বলে। অতিরিক্ত লবণ মাটিতে থাকায়, এদের বীজ মাটিতে অঙ্কুরিত না হয়ে ফলের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে মাটির দিকে মূল নামিয়ে দেয়। একে তাই **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম** বলা হয়। **আলোক ও বায়ুর সন্ধানে** কাঁঠাল-লতা, রোহিণী শ্রেণীর উদ্ভিদ্ নিজের দেহের বিবিধ অংশকে

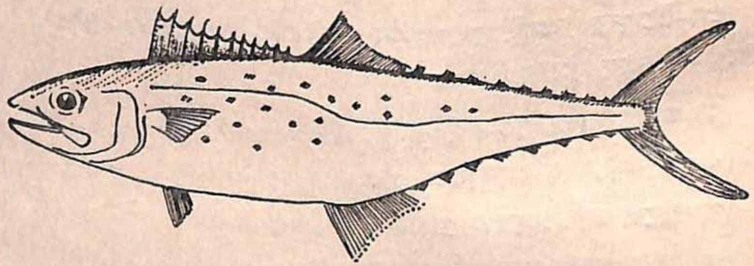


চিত্র 67—ফণিমনসা।

নিয়ে জন্মায়। তাই অভিযোজনও প্রকৃতির অভিব্যক্তির নানা হাতিয়ারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রে আছে।

(ক) **জলে অভিযোজন** (*Aquatic adaptation*) : জলের আদি অধিবাসী হচ্ছে মাছ। মাছ পুরোনো পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই মাছের অভিযোজনকে **মুখ্য অভিযোজন** বলে। সুতরাং জলে বাস করতে হলে শরীর কি-ধরনের হওয়া দরকার বা জলে বাস করলে শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলের ভেতর থাকতে প্রাণীকে সাহায্য করে, তার একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। নিচে এই ধরনের জলে-থাকা আদি প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ দেওয়া হ'ল :

(1) সালমন মাছের শরীরের আকার টর্পেডোর মতো বা হাত-চালানো তাঁতের মাকুর মতো। মাথা, দেহ ও লেজ সবই দু'পাশ দিয়ে চাপা। দেহের কোন অংশ দেহ



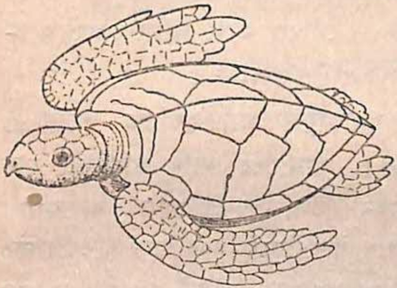
চিত্র 70—সালমন মাছ।

হতে বাইরে বেরিয়ে থাকে না। ফলে, জলে-থাকা আদি প্রাণী, অর্থাৎ মাছ, জলের ভেতর বিনা বাধায় সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে পারে। (2) মাছের দেহ থেকে বের-হওয়া বেজোড় পাখনাগুলি সঞ্চারণশীল এবং ফিন্-রে-এর সাহায্যে অটুট থাকে। এদের সাহায্যে মাছ সাঁতারে পটু হয়ে ওঠে। লেজের পাখনা হালের কাজ করে ও জোড় পাখনাগুলি মাছকে পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে জলের মধ্যে সমান্তরাল ক'রে রাখে এবং সাঁতারের সময়ে অন্যান্য পাখনাগুলির সমন্বয়-সাধন ক'রে মাছ ভারসাম্য বজায় রাখে। (3) মাছের পৌষ্টিক নালী থেকে বের-হওয়া একটা **বাতাস-থলি** (*Swim-bladder*) বা যাকে আমরা মাছের পটকা বলি—এটি মাছের জলের ভেতরে উপর-নিচ করার কাজে সাহায্য করে। থলির মধ্যে বাতাস কমে গেলে মাছ জলে ডুবে যায়, আবার দরকারমতো থলিতে বাতাস ভ'রে মাছ জলে ভেসে ওঠে। (4) মাছের কানকোর

তলায় শ্বসনের জন্যে ফুলকা থাকে। ফুলকা দিয়ে জলের ভেতরে-থাকা অক্সিজেন শোষণ ক'রে মাছ শ্বাসকার্য চালায়।

প্রতিটি জীবকেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে স্থলের বহু প্রাণী জলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তন ক'রে ভালোভাবে জলের আদি জীবের মতো বাস করছে। তাই সীমাহীন সমুদ্র তার অফুরন্ত থাকার জায়গা ও জলের ভেতরে-থাকা খাবারের লোভ দেখিয়ে অনেক সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবদের নিজের গহ্বরে টেনে নিয়ে গেছে। নিজের পুরোনো বা আদি পরিবেশ ত্যাগ ক'রে যখন প্রাণী নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজের শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তখন প্রাণীর এই অভিযোজনকে **গৌণ অভিযোজন** বলা হয়।

স্থল থেকে অভিযোজিত প্রাণীদের মধ্যে সামুদ্রিক কচ্ছপ একটি উদাহরণ। এদের পা-দুটি চ্যাপটা হয়ে হালের মতো হয়ে গিয়েছে। শরীরের উপরকার খোল



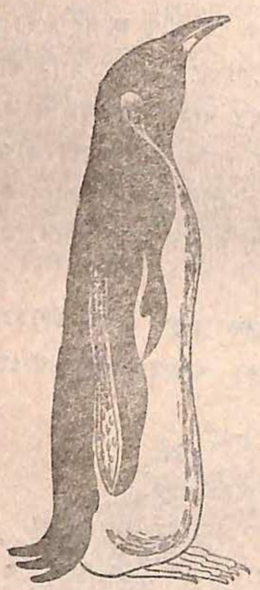
চিত্র 71—সামুদ্রিক কচ্ছপ।



চিত্র 72—জলের স্তন্যপায়ী প্রাণী।

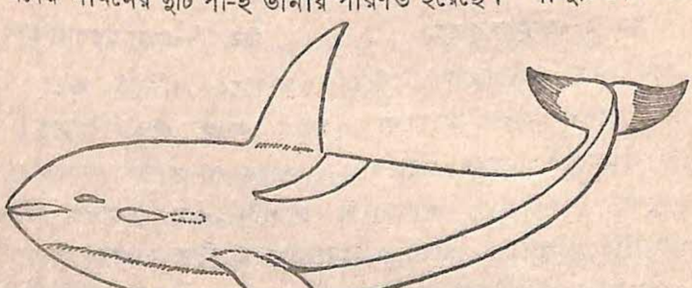
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত শরীরটিকে টর্পেডোর আকারে পরিণত ক'রে নিয়েছে। এদের লেজ জলের মধ্যে অকেজো হওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। উভচরী কুমির জলে বাস করে নিজের প্রয়োজনে। এদের পা পাতলা চামড়ায় আংশিক জোড়া ও লেজ বেশ লম্বা, পাশাপাশি চ্যাপটা এবং এগুলির জন্য কুমির জলে সাঁতার কাটতে পারে। এদের বহিঃনাসারন্ধ্রের ছিদ্র মাথার সবচেয়ে উপরে সরে যায় এবং কুমিরের শরীরের সমস্ত অংশ যখন জলের তলায় থাকে, তখন তার নাসারন্ধ্র জলের উপরে থাকে। ফলে, এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন শোষণ ক'রে ফুস্‌ফুসে ভরতে পারে। হাঁস, বক ও পানকৌড়ি—এরা জাতে পাখি হলেও, জলে এদের বাস। এদের পায়ের আঙুলগুলি পাতলা পর্দা দিয়ে সম্পূর্ণ জোড়া। পেঙ্গুইন

পাখির ডানার পালক নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং এর বদলে পালকহীন ডানাগুলি মোটা ও চ্যাপটা হয়ে হালের আকার ধারণ করেছে। এরই সাহায্যে এরা জলে সাঁতার কাটে। পায়ের আঙুলগুলি পাতলা চামড়ায় জোড়া ও শরীরটিও মাছের মতো টর্পেডোর আকার ঃ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে জলে অভিযোজন এত বেশী যে—**তিমি, ডলফিন, শুশুক, সিল**—এদের দেখলে জলজ প্রাণী ব'লে মনে হয়। এদের গায়ে চুল থাকে না; থাকে না পিছনের পা। সামনের দুটি পায়ের গঠন মাছের পাখনার মতো ও পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা। এরা স্তন্যপায়ী এবং এদের শরীরের উত্তাপ একটা মাত্রায় থাকে। এদের বহিঃকর্ণ এবং চামড়ার সবরকমের গ্রন্থি ও স্নায়ু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বহিঃনাসারন্ধ্র মাথার সবচেয়ে উপরে থাকে। ভোঁদড় জলে অভিযোজিত আর-একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ।



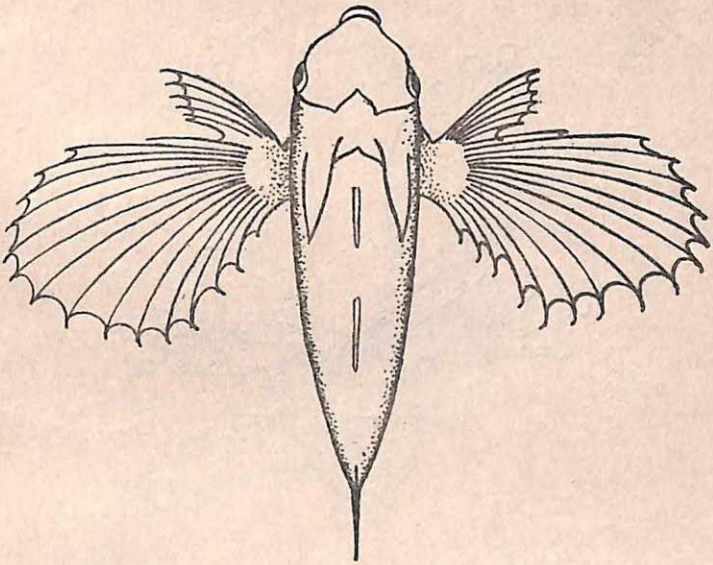
চিত্র 73—পেঙ্গুইন।

(খ) **আকাশে অভিযোজন** (*Volant adaptation*) ঃ আকাশের আদি অধিবাসী হ'ল পাখি; যেমন—চিল, শকুন, পায়রা বা কাকি। বাজপাখি, চিল বা শকুন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে বিচরণ করে। এরা মুখ্য অভিযোজিত প্রাণী। এদের সামনের দুটি পা-ই ডানায় পরিণত হয়েছে। পা-দুটি বেশ মাংসল এবং

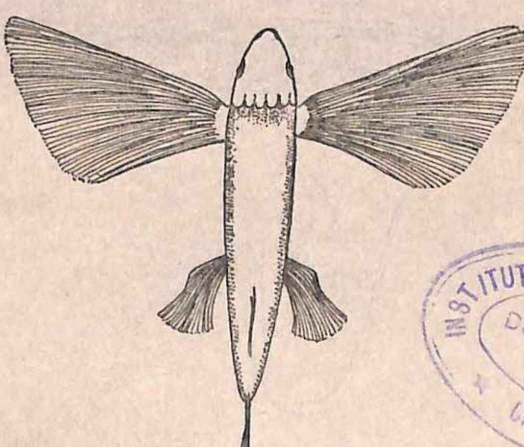


চিত্র 74—তিমি (সমুদ্রের স্তন্যপায়ী প্রাণী)।

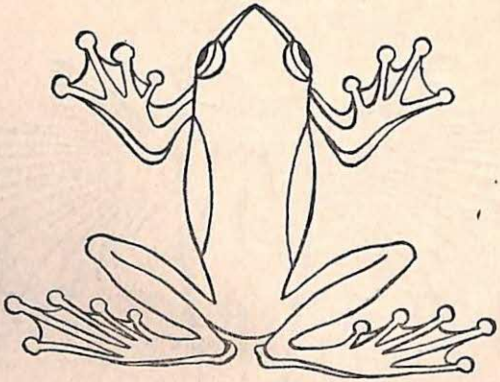
এতে নানারকমের পালক থাকে। উন্নত, বড় ডানার সাহায্যে পাখি আকাশে ওড়ে। আকাশে ওড়বার সময়ে এরা ডানা মেলে ঠিক এরোপ্লেনের মতো আকার ধারণ ক'রে



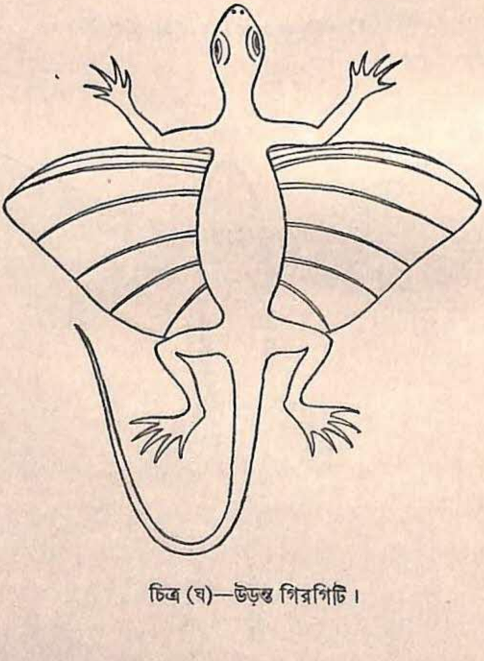
চিত্র (ক)—উড়ুক্কু-মাছ (Dactylopterus)।



চিত্র (খ)—উড়ুক্কু-মাছ (Exocetus)।

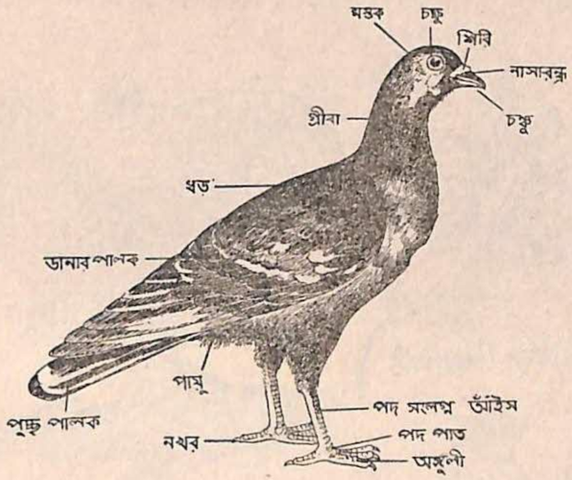


চিত্র (গ)—গেছো-ব্যাঙ।



চিত্র (ঘ)—উড়ন্ত গিরগিটি।

সহজেই বাতাস কাটিয়ে উড়তে পারে। এদের সামনের পা বা ডানা ও পেছনের পায়ের সঙ্গে শরীরের কিছু অংশ পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া থাকে। এর ফলে এরা শরীর দিয়ে বেশী পরিমাণে বাতাস ধ'রে রাখতে পারে। শরীরের ভেতরকার



চিত্র 75—পায়রা।

হাড়গুলি সচ্ছিদ্র হওয়ায় এর মধ্যে বাতাস ভরা থাকে, ফলে হাড়গুলি ওজনে হালকা হয়। পাখির দুটি ফুস্ফুস হতে অনেকগুলি বড় বড় **বায়ু-থলি** (*Air-sac*) বের হয়। এই বায়ু-থলিগুলি প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত বাতাস দেহের ভেতর ধ'রে রাখতে পারে। এতে পাখির শ্বাসকার্যে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি শরীর হালকা ক'রে আকাশে উড়তেও সুবিধা হয়।

অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণী নিজেদের আদিবাস ছেড়ে আকাশে অভিযোজিত হয়েছে—এর উদাহরণও অনেক। এদের মধ্যে **উড়ুক্কু-মাছ** (*Dactylopterus* বা *Exocetus* চিত্র—ক, খ) ঠিক পাখিদের মতো উড়তে না পারলেও, লম্বা-চওড়া বক্ষ-সংলগ্ন পাখনা খুলে বেশ খানিকটা দূর জলের উপর 'গ্লাইড' ক'রে বা ভেসে যেতে পারে। ক্যানিং-এর সমুদ্রোপকূলে এক্সোসিটাস পাওয়া যায়। **গেছো-ব্যাঙ** বা **উড়ো-ব্যাঙ** (*Rhacophorus*) উভচর হলেও, গাছের ডালে-ডালে লাফ দিয়ে চলাফেরা করে। এদের সামনের ও পেছনের পা বেশ লম্বা হয় এবং আঙুলে গোল 'প্যাড' থাকে। আঙুলগুলি পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া, বাহু ও পুরোবাহুর মাঝে পাতলা চামড়া বাহু-দুটিকে জুড়ে থাকে। সরীসৃপের মধ্যে **উড়ুক্কু-ড্রাগন** (*Draco-volans*) খুব

ভালো উড়তে না পারলেও, কিছুটা পারে। এদের হাত ও পায়ের মাঝে শরীরের পাশ থেকে পাতলা চামড়া ছাতার কাপড়ের মতো প্রসারিত হয়। এই প্রসারিত চামড়াকে **প্যাট্যাজিয়াম** (*Patagium*) বলে। ড্রাকো-র শরীর বেশ ছোট ও উপর-নিচ ভাবে চ্যাপটা। প্রতি পাশের প্যাট্যাজিয়ামের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ'টি পঞ্জর

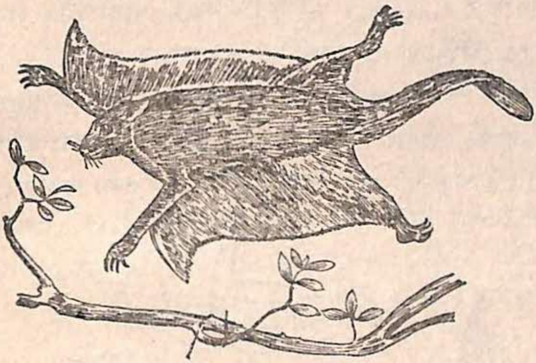


চিত্র 76

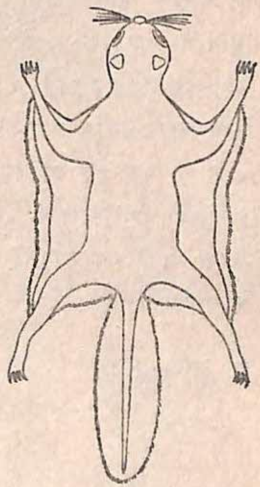
দেখা যায়। পঞ্জরগুলি প্যাট্যাজিয়ামকে খুলে রাখে। চিনে-পাখার মতো ড্রাকো প্যাট্যাজিয়াম খুলতে পারে, আবার বন্ধও করতে পারে। পাখিদের মধ্যে এমু ও অস্ট্রিচ—এরা দৌড়-পাখি। এদের দেহ ভারী হয়ে গিয়ে পেশীবহুল হয়ে গিয়েছে। এদের ডানাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। দৌড়বার সময়ে এরা মাঝে-মাঝে ডানা তোলে। সাধারণতঃ এরা গৃহপালিত।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে **উড়ুক্কু-কাঠবিড়াল, উড়ুক্কু-লিমুর, উড়ুক্কু-পতঙ্গভুক্**—এরা আকাশে ওড়বার চেষ্টা করে এবং কিছুটা উড়তেও পারে। এদের প্যাট্যাজিয়াম খুবই

উন্নত ধরনের। হাতের উপরদিকে গলা থেকে হাতের কবজি পর্যন্ত পাতলা চামড়ায় ঢাকা থাকে। আবার, হাতের কবজি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া থাকে। আঙুলগুলি পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া, এমনকি লেজের চারপাশ থেকে পাতলা চামড়া বেরিয়ে পা-দুটিকে জুড়ে রাখে এদের হাত-দুটি বড় বড় হয়। সারাদেহ প্যাট্যাজিয়াম বা পাতলা পর্দায় জোড়া থাকায়, এরা হাত ও পা



চিত্র 77—উড়ন্ত কাঠবেড়ালি।



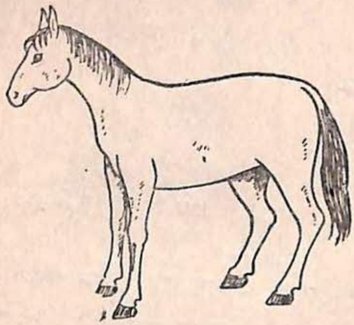
চিত্র 78—উড়ুক্কু লিমুর।

ছড়িয়ে বেশ কিছুদুর উড়তে পারে। কিন্তু বাদুড়ের মতো অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী এত ভালো উড়তে পারে না। বাদুড়ের সামনের পা বা হাত-দুটি দেখবার মতো। হাত-দুটি পায়ের চেয়ে প্রায় চারগুণ লম্বা ও তেমনি মজবুত। **পতঙ্গভুক্ ও ফলভুক্ স্তন্যপায়ী** (*Insectivorous and Frugivorous mammals*) বাদুড়েরও একই ধারার প্যাট্যাজিয়ম-বিন্যাস দেখা যায়। হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলি প্যাট্যাজিয়ামকে প্রসারিত ক'রে রাখে। বাদুড়ের শরীর ছোট এবং শরীরের অনুপাতে প্যাট্যাজিয়াম অনেক বড়, তাই বাদুড় অনায়াসে তার হাত নাড়িয়ে প্যাট্যাজিয়ামের সাহায্যে পাখির মতো উড়তে পারে। কিন্তু আকাশে অভিযোজ্যতার আদর্শ উদাহরণ বলতে আমরা বাদুড়কেই মনে করি, যেমন জলে অভিযোজ্যতার আদর্শ উদাহরণ হ'ল তিমি ও সীল।

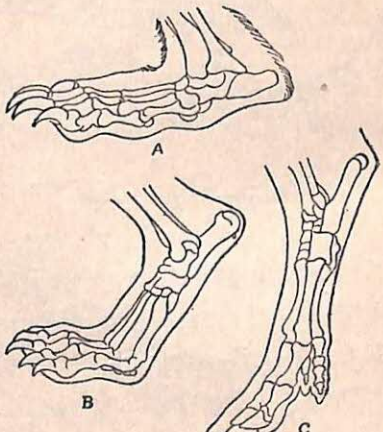


চিত্র 79—বাদুড়।

(গ) **স্থলে অভিযোজন ঃ** (i) **দ্রুতগতির জন্য** (*Cursorial adaptation*) **ঃ** স্থলের মাটি শক্ত; কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নিচু। কোন কোন জায়গা পাহাড়িয়া, আবার কোন কোন জায়গা সমতল। সাধারণতঃ তৃণভোজী প্রাণীর জীবন বা অস্তিত্ব তার দ্রুতগতির উপর নির্ভরশীল। কারণ তৃণভোজী প্রাণীদের প্রিয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে মাংসাশী প্রাণী। দ্রুতগতির জন্য অভিযোজনের আদর্শ উদাহরণ হ'ল **রেসের ঘোড়া**। ঘোড়ার শরীর এমনভাবে তৈরি যে, যখন সে দৌড়ায়, তার দেহের কোন অংশ বাতাসকে বাধা দেয় না। দৌড়বার সময়ে ঘোড়া তার গলা, মাথা ও দেহ এক লাইনে ক'রে দৌড়ায়। পেছনের পা ও সামনের পা—এই দুটিই বেশ লম্বা, পেশীবহুল ও মজবুত। সামনের পা ও পেছনের পায়ের একটিমাত্র আঙুল বাদে, বাকী সব আঙুলই ক্ষয়প্রাপ্ত। একটিমাত্র আঙুলের খুরের ওপর ঘোড়ার একটি পা দাঁড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ ঘোড়ার অত বড় দেহ তার চারটে খুরের ওপর ভর ক'রে থাকে। এর ফলে, মাটির সঙ্গে ঘোড়ার সংযোগ খুব কম থাকায়, দৌড়বার সময়ে মাধ্যাকর্ষণের টান ঘোড়ার দেহের ওপর কম পড়ে। ঘোড়ার কনুই ও হাঁটুর হাড়ের সন্ধি এমনভাবে তৈরি, যার ফলে ঘোড়া কেবলমাত্র একদিকেই হাঁটতে বা দৌড়তে পারে। ঘোড়ার গলা লম্বা ও বড় এবং এদের চোখ মাথার বেশ ওপরে থাকে। এদের চোখের জ্যোতিও প্রখর।



চিত্র 80—ঘোড়া।

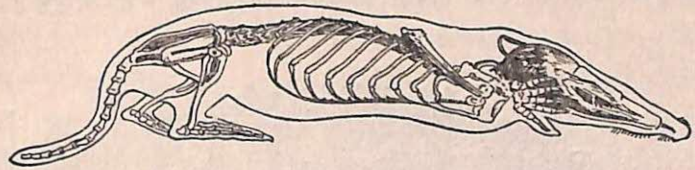


চিত্র 81

A—ভল্লুক পায়ের সব পাতা দিয়ে চলে (Plantigrade); B—হায়েনা কেবল আঙুলে ভর ক'রে চলে (Digitigrade) ; C—শুয়োর খুরে ভর ক'রে চলে (Unguligrade)।

(ii) **খনন-কার্যের জন্য অভিযোজন** (*Fossorial adaptation*) **ঃ** অনেক প্রাণী মাটির নিচে বাস করে। এরা নানা উপায়ে দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে

মাটি খুঁড়ে গর্ত ক'রে মাটির ভেতরে বাসা বেঁধে জীবন-নির্বাহ করে। **কেঁচো, উই, অন্ধ-পিঁপড়ে, জিম্নোফিয়না, পা-বিহীন গিরগিটি, ডিম-দেওয়া স্তন্যপায়ী বা**



চিত্র 82—টালপা।

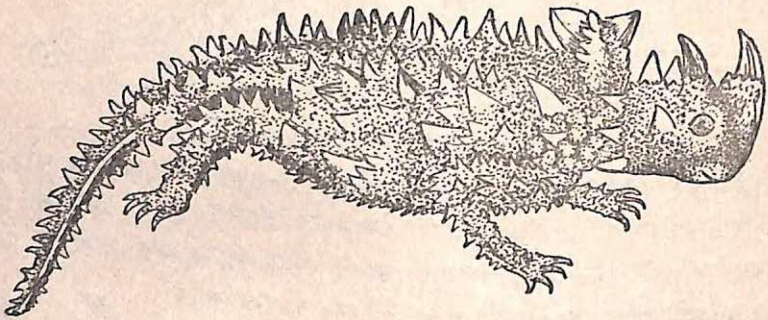
মসোটিমাটা এবং **ছুঁচো**—খনন-কার্যের জন্য যে-সমস্ত প্রাণীদের নাম করা হ'ল, তার মধ্যে **টালপা** (*Talpa*) নামে একরকমের ছুঁচোই আদর্শ উদাহরণ। এরা সামনের পা-দুটি খনন-কার্যে ব্যবহার করে। খনন-কার্যের জন্য সামনের পা-দুটি আকারে ছোট, অথচ বেশ মজবুত হয়। পেছনের পা খনন-কার্যে দরকার হয় না। এই পা-দুটিকে টালপা খোঁড়া ও মাটি সরিয়ে ফেলার কাজে লাগায়। তাই পেছনের পা-দুটি বড়, চওড়া এবং এর আঙুলে লম্বা নখ থাকে। মাটির ভেতরে থাকার ফলে এদের চোখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং অপব্যবহারের ফলে অকেজো বহিঃকর্ণও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাথা থেকে এদের **তুণ্ড** (*Snout*) দেখা যায়। এই অঙ্গটিও এরা মাটি-খনন-কার্যে লাগায়। এদের ইন্‌সিসার দাঁতগুলিও মুখবিবরের বাইরে বেরিয়ে আসে। দাঁতও খননের জন্য ব্যবহার হয়। টালপার হাত-দুটিকে শক্তি যোগায় তার শ্রোণীচক্রের ক্লাভিকল, স্কাপুলা ও কোরাকয়েড হাড়গুলি। হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর **টালপা** (*Talpa micrura*) পাওয়া যায়।



চিত্র 83—টালপা-র খননের নখ।

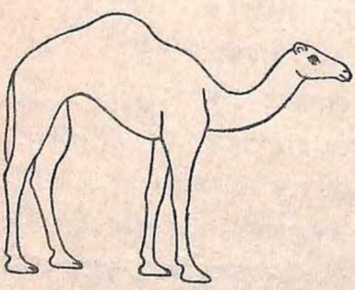
(iii) **মরু-বাসের জন্য অভিযোজনঃ** মরুভূমির পরিবেশ খুবই কঠিন। সর্বত্র বালিতে ভরা। কোথাও গাছপালা নেই। দিনে অসহ্য গরম, রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। দিনে বালি-ওড়ানো গরম ও ঝোড়ো-হাওয়া। এ-থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকে না। এ-হেন মরুভূমির পরিবেশের মধ্যেও নিজেকে অভিযোজিত ক'রে অনেক প্রাণীকে বাস করতে দেখা যায়। **বিষাক্ত সাপ, মাকড়সা** ও অন্যান্য সরীসৃপ—এরাও মরুভূমিবাসী। অস্ট্রিচ, বুনো গাধা ও উট মরুভূমির ভারবাহী জীব। মরুভূমিতে **মোলক** (*Moloch*) নামে একরকমের গিরগিটি দেখতে পাওয়া যায়।

এদের সারা দেহে বড় বড় বিষাক্ত কাঁটা থাকে। দেহের চামড়া পুরু ও খস্‌খসে হওয়ায়, এদের চামড়ার ভেতর দিয়ে জল বাষ্পাকারে বের হতে পারে না। মরুভূমিতে জলের অভাবের জন্য মোলক তার চামড়াকে এইভাবে অভিযোজিত করেছে। এদের



চিত্র 84—মোলক।

বহিঃনাসারন্ধ্র, কান ও চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বালির ঝড় থেকে বাঁচাবার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা এরা করে। এই ইন্দ্রিয়গুলি চামড়ায় ঘেরা ছোট ছোট গর্তের মধ্যে থাকে। মরুভূমিতে জলের বড় অভাব হওয়াতে, রাতে যখন ঠাণ্ডায় হিম পড়ে, মোলক মুখবিবর খুলে হিমের বা কুয়াশার জল পান ক'রে জলের অভাব মেটায়। এরা তখন শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্য ক্ষণে-ক্ষণে শরীরের রঙ পালটায়। মরুভূমিতে বৃষ্টির অভাবে মাটি অতি শুষ্ক ও গরম থাকে। জল জীবের জীবন, তাই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জলের জন্য নানাভাবে নিজেদের শরীর অভিযোজিত করে। মরুভূমিতে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বা লড়াই খুবই কঠিন। উটের পেটের ভেতরে জল জমিয়ে রাখার কয়েকটি থলি আছে। এরা যখন জল পায় তখন এমনভাবে পান করে, যাতে পেটের সব থলিগুলি জলে ভরে ওঠে। এই জল দিয়ে উট বহুদিন বিনা জলপানে থাকতে পারে। এদের গলা প্রায় সাত থেকে নয় ফুট লম্বা হওয়ায়, মাথাটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে থাকে। এইভাবে গরম বালির ঝড় থেকে এরা



চিত্র 85—উট।

মাথাটিকে বাঁচায়। চোখ মাথার অনেকটা ওপরের দিকে থাকে। চোখের লোম খুব বড় বড় হওয়ায়, চোখ সব সময় লোমে ঢাকা থাকে। সেইরকম কানের গর্ত সূচীসূক্ষ্ম এবং তার মুখেও প্রচুর লোম থাকে। বহিঃনাসারন্ধ্রে কপাটিকা থাকায়, এরা কপাটিকা বন্ধ ক'রে দিয়ে গরম বালি মেশানো হাওয়া থেকে ছিদ্রগুলিকে রক্ষা করে। উভচরের মধ্যে **শিং-বিশিষ্ট ব্যাঙ** (*Horned toad*), সরীসৃপের মধ্যে **মাবুইয়া**—এদের চোখ স্বচ্ছ পর্দায় ঢাকা; **মোলক, টাইফোলপ্‌স** (*Typholops*)—এদের চোখ স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে ঢাকা; **র‍্যাট্‌ল সাপ** (*Rattle snake*), স্তন্যপায়ীদের মধ্যে **সেজিয়া** (*Sagia*), **অ্যান্টেলোপ** (*Antelope*) প্রভৃতি মরুভূমিবাসী প্রাণীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

(iv) **বৃক্ষবাসের জন্য অভিযোজন** (*Scansorial adaptation*): আকারে ছোট এমনতর তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থল নিরাপদ মনে না ক'রে গাছের ডালে ডালে বাস করে। গাছের ফল ইত্যাদি খেয়ে, গাছের ডালে বাসা বেঁধে বাচ্চা প্রসব ক'রে জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের **বৃক্ষবাসী** (*Arboreal* or *Scansorial*) প্রাণী বলা হয়। **কাঠবেড়ালি, বহুরূপী, গিরগিটি, লাল জাতের বাঁদর, লিমুর, শিম্পাঞ্জি ও গিবন** প্রভৃতি মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী প্রাণী বৃক্ষবাসী। অমেরুদণ্ডীদের

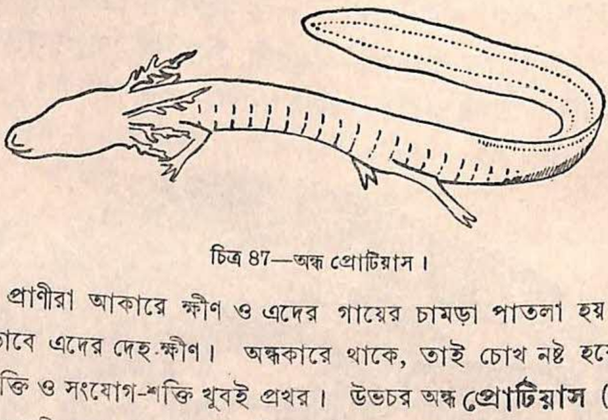


চিত্র 86—বহুরূপী।

মধ্যে গেছো-শামুক ও নানারকমের পতঙ্গের নাম বৃক্ষবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ করা যায়। এদের হাত, পা ও আঙুলগুলি এমনভাবে অভিযোজিত হয়, যাতে ক'রে এরা অতি সহজে গাছের ডালপালা ধরতে পারে। এদের হাত পায়ের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। হাতের আঙুলের নখগুলি বাঁকানো থাকায়, এরা তা দিয়ে চট্‌ ক'রে গাছের ডাল ধ'রে নিতে পারে। **গিবন**—একজাতীয় বাঁদর, গাছের ডাল ধ'রে দোল খায়। এদের

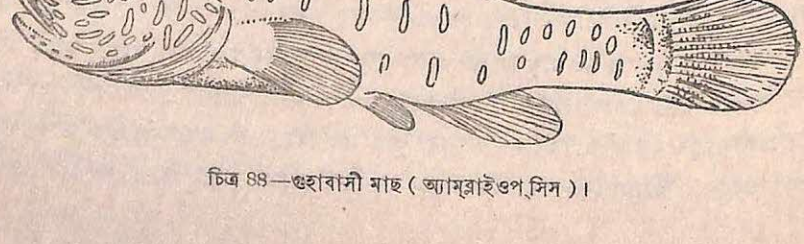
হাত-দুটি পায়ের চেয়ে প্রায় তিনগুণ লম্বা। গেছো-ব্যাঙের আঙুলের ডগায় গোলাকার, আটকানো প্যাড থাকে। তেমনি বহুরূপী ও অন্যান্য গিরগিটির (জেকো) পায়ের ও হাতের পাতার তলার দিক খাঁজে-খাঁজে ভরা থাকে। এর দ্বারা এরা সহজে গাছে উঠতে পারে। বহুরূপীর হাতের প্রথম তিনটি আঙুল জোড়া এবং শেষ দুটি আঙুলও জোড়া। এর ফলে, দুটি জোড়া-অংশ দিয়ে এরা সাঁড়াশির মতো গাছের ডাল ধ'রে রাখে। বৃক্ষবাসীদের লেজ বড় ও পুষ্ট হয়। সাধারণতঃ এরা লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরতে পারে। **অ্যাটেলেস** (*Ateles*) নামে একরকমের বাঁদর তার লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে গাছের ডাল ধ'রে রেখে, হাত ছেড়ে মাথা নিচু ক'রে দোলে। গাছের বড় বড় কাণ্ডে ঠোঁট দিয়ে ঠোকরায় কাঠঠোকরা পাখি। এরাও বৃক্ষবাসী।

(v) **গুহা-বাসের জন্য অভিযোজন** (*Adaptation to cave life*)ঃ গুহায়



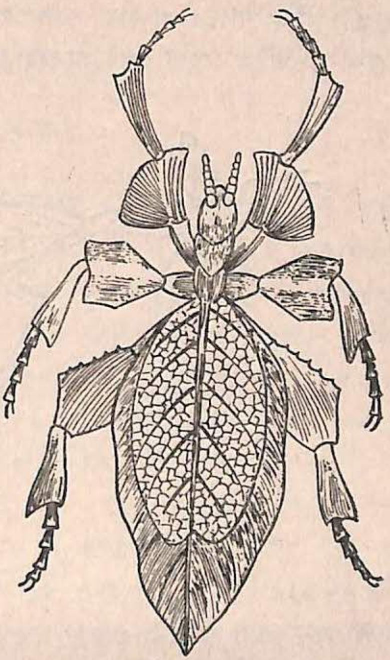
চিত্র 87—অন্ধ প্রোটিয়াস।

বসবাসকারী প্রাণীরা আকারে ক্ষীণ ও এদের গায়ের চামড়া পাতলা হয়। প্রধানতঃ খাওয়ার অভাবে এদের দেহ ক্ষীণ। অন্ধকারে থাকে, তাই চোখ নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু এদের ঘ্রাণ-শক্তি ও সংযোগ-শক্তি খুবই প্রখর। উভচর অন্ধ **প্রোটিয়াস** (*Proteus*) ও গুহায় বসবাসকারী অন্ধ-মাছ **অ্যাম্ব্লাইওপ্সিস** (*Amblyopsis*) গুহায় অভিযোজিত প্রাণীর উদাহরণ।

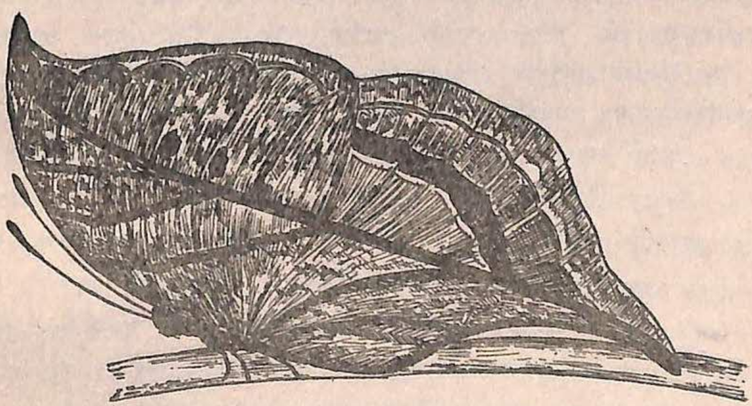


চিত্র 88—গুহাবাসী মাছ (অ্যাম্ব্লাইওপ্সিস)।

(ঘ) **আত্মরক্ষার জন্য অভিযোজন** (*Mimicry*)ঃ নিজেকে বাঁচাবার জন্য যে-কোন প্রাণী যদি অন্য কোন প্রাণীর মতো বা অন্য কোন জড় পদার্থের মতো নিজের দেহকে অভিযোজিত ক'রে শত্রুকে ফাঁকি দিতে পারে বা শত্রুকে এড়াতে পারে, তা হলে অন্যের চেহারা অনুকরণের এই পন্থাকে বলা হয় **মিমিক্রি** (*Mimicry*) বা **আত্মরক্ষার জন্য অভিযোজন**। এই ধরনের অভিযোজনের অনেক আশ্চর্য উদাহরণ আছে; যেমন **কাঠি-পোকা** (*Stick-insects : Carausius*)। এদের দেহ লম্বা কাঠির মতো ও গাঁটযুক্ত পদগুলি সরু সরু কাঠির মতো। এদের গায়ের রঙও শুকনো ডালের মতো খয়েরী রঙের। এই পোকাগুলি ডালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, এরা একটি প্রাণী তা সহজে বোঝা যায় না। এরা ধীরে ধীরে চলে। বৃক্ষবাসী প্রাণীরা এদের শুকনো ডাল ব'লে মনে ক'রে খাদ্য

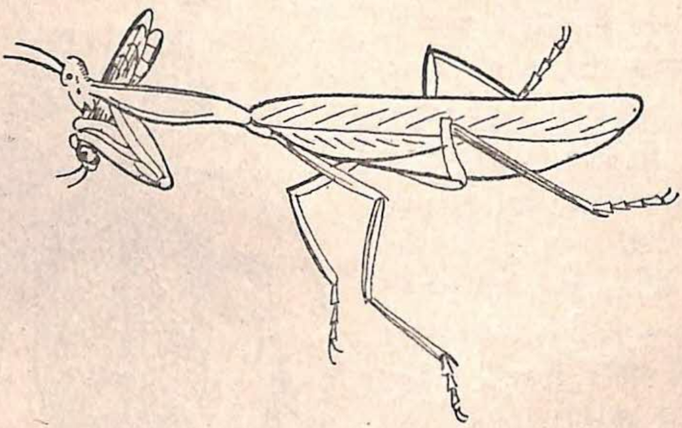


চিত্র 89—পাতা-পতঙ্গ।



চিত্র 90—ক্যালিমা।

হিসাবে ভক্ষণ করে না। সেইরকম **পাতা-পতঙ্গের** (*Leaf-insect* : *Phyllium*) পাখাগুলি ঠিক গাছের পাতার আকারের হয়। এদের সমস্ত শরীরটাই সবুজ, এমনকি পা-গুলিও ছোট ছোট পাতার মতো দেখতে হওয়ায়, এদের শত্রুরা গাছের



চিত্র 91—গঙ্গাফড়িং।

পাতা মনে ক'রে রেহাই দেয়। সাধারণতঃ, গিরগিটি ও পাখি এদের শত্রু। **ক্যালিমা** (*Kallima*) প্রজাপতির পাখা-দুটি শুকনো পাতার মতো, এমনকি পাতার মধ্যে দিয়ে একটি শিরাও থাকে। দূর থেকে মনে হয়, দুটি পাতা শুকিয়ে গাছের ডালে লেগে আছে। কতকগুলি প্রজাপতি পাখিদের প্রিয় খাদ্য। আবার, আর একপ্রকার প্রজাপতি আছে, সেগুলি পাখিরা খায় না, বা খেতে ভালবাসে না। **মনার্ক-প্রজাপতি** পাখিরা খায় না, তাই পাখিদের প্রিয় খাদ্য **ভাইসুরয়-প্রজাপতি** মনার্ক প্রজাপতির মতো নিজের পাখা ও গায়ের রঙ অভিযোজিত করে। এইভাবে বহু প্রজাপতি আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রজাপতির মতো দেহের রঙ ও আকার অভিযোজিত ক'রে প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। **সবুজ গঙ্গাফড়িং, লাউডগা সাপ** ও **গেছো-ব্যাঙের** গায়ের রঙ এত সবুজ যে, এরা গাছের ডালে পাতার মধ্যে লুকিয়ে থেকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পায়।

অভিযোজনের বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন পন্থার মধ্যে অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকে। জীবের অভিযোজনের মূল লক্ষ্য হ'ল স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকার তাগিদে অভিযোজনের ফলস্বরূপ জীবের দেহে আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে জীবের অভিব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে নতুন জীবনধারার সূচনা করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক চক্র

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র (Nitrogen cycle): সবুজ উদ্ভিদ্ বাতাস হতে অতি সহজেই অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্বারা এরা শ্বেতসার প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন দিয়ে এরা শ্বেতসার খাদ্যকে দহন ক'রে শক্তি নির্গত করে। আবার, বিবিধ সঞ্চিত খাদ্য এরা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা প্রস্তুত করে; যেমন—বিভিন্ন শর্করা, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন ইত্যাদি। নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যও এদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাতাসে এত বেশী নাইট্রোজেন থাকলেও, উদ্ভিদ্ এর এক অণুও শোষণ করতে পারে না। অথচ বাতাসে শতকরা আশি হতে পঁচাশি ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তবে কি আমরা মনে ক'রব যে, উদ্ভিদের **পত্ররন্ধ্রের** (*Stomata*) ভেতর দিয়ে কেবলমাত্র অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করতে পারে? নাইট্রোজেন কি প্রবেশ করতে পারে না? বাতাসে এত কম পরিমাণে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকলেও, তা যখন অনায়াসে উদ্ভিদের দেহের ভেতর প্রবেশ করতে পারে, তখন নাইট্রোজেনও পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে নিশ্চয় প্রবেশ করে। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন নানা উপায়ে শোষণ ও ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু প্রতিটি কোষে বাতাসের নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করলেও, উদ্ভিদ্ তা শোষণ বা ব্যবহার করতে পারে না। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ভিতর প্রবেশ ক'রে আবার বেরিয়ে আসে। অথচ কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জাতীয় পদার্থের দ্বারা নির্মিত। উদ্ভিদের কোষগুলি কী কারণে বাতাস হতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। সুতরাং মাটির ভিতরে জল-মিশ্রিত যে-সমস্ত ধাতব নাইট্রেট পাওয়া যায়, তা উদ্ভিদ্ মূলরোমের সাহায্যে শোষণ করে এবং নিজদেহে নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। যুগ যুগ ধ'রে উদ্ভিদ্ এইভাবে মাটি হতে নাইট্রেট-আকারে নাইট্রোজেন শোষণ ক'রে আসছে এবং নিজদেহের পুষ্টিসাধন করছে। কিন্তু এইভাবে উদ্ভিদ জমি হতে ক্রমাগত নাইট্রেট শোষণ করার ফলে, জমিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কমে এবং জমি নাইট্রেট-বিহীন হয়ে পড়ে। সেইজন্য বায়ু হতে নানা উপায়ে

জমিতে নাইট্রেট জমা হয় এবং সেইরূপ বিভিন্ন উপায়ে নাইট্রেট ও প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য হতে নাইট্রোজেন নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। নাইট্রোজেনের এইরূপ বিবর্তনের ফলে বাতাসে এর পরিমাণ প্রায় একই থাকে। নাইট্রোজেন বাতাস হতে মাটিতে এবং মাটি হতে জীবদেহে ও জীবদেহ হতে পুনরায় বাতাসে ফিরে যায়। একেই **নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র** (*Nitrogen cycle*) বলে। নিচে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-গ্রহণ-প্রণালী-সহ নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্রের প্রধানতঃ তিনটি উপায়ের বিবরণ দেওয়া হ'ল :

(১) **বিদ্যুৎক্ষরণে নাইট্রোজেনের স্থিতি** (*Nitrogen fixation by electric discharge*) : আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণের সময়ে বা বজ্রপাতের সময়ে বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলি অক্সিজেন কণার সঙ্গে মিলিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইডে (Nitric oxide) পরিণত হয়।

$$N_2 + O_2 = 2NO \text{ (Nitric oxide)}$$

নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে (Nitrogen peroxide) পরিণত হয়।

$$2NO + O_2 = 2NO_2 \text{ (Nitrogen peroxide)}$$

বিদ্যুৎক্ষরণের সময়ে বৃষ্টির জলে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড সহজেই দ্রবীভূত হয়ে নাইট্রাস অ্যাসিডে (HNO_2) ও নাইট্রিক অ্যাসিডে (HNO_3) পরিণত হয়।

$$2NO_2 + H_2O = \underset{\text{Nitrous acid}}{\underset{\downarrow}{HNO_2}}\ \underset{\text{Nitric acid}}{\underset{\downarrow}{HNO_3}}$$

মৃত্তিকায় বিবিধ ধাতব লবণ থাকে। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম লবণের সঙ্গে নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিলিত হয়ে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেটে পরিণত হয়। উদ্ভিদের উপাদেয় খাদ্য এই দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ও নাইট্রেট এবং উদ্ভিদ্ মূলরোমের সাহায্যে ইহার শোষণ হয়। রসায়নবিদ্গণের মতে, প্রতিদিন প্রায় 2,50,000 টন নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড পৃথিবীতে বজ্রপাতের সময়ে বিদ্যুৎ-ক্ষরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়। আবার, নাইট্রাস লবণগুলি ব্যাক্টিরিয়ার কার্যকলাপের দ্বারা নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। দেখা গিয়েছে যে, গড়ে প্রতি বৎসরে প্রতি একর জমিতে বৃষ্টির জলের দ্বারা প্রায় চার পাউণ্ড নাইট্রোজেন জমা হয়।

(২) **মৃত্তিকার স্বাধীন ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেনের স্থিতি** (*Nitrogen fixation by free-living Bacteria in the soil*) : আমরা জানি, মাটির ভেতরে বাতাস সহজেই প্রবেশ করতে পারে। অক্সিজেন এইভাবে

মূলতন্ত্রের শ্বাসকার্য পরিচালনা করে। মৃত্তিকার ভেতরে নানাবিধ স্বাধীন ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মায়। এদের মধ্যে কেউ অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে, আবার কেউ-বা বিনা অক্সিজেনে শ্বাসকার্য পরিচালনা করতে পারে। **অ্যাজোটোব্যাক্‌টার ক্রোকোকাম** (*Azotobacter chrococum*) নামক ব্যাকৃটিরিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং মাটির জল-অঙ্গার পদার্থ হতে শক্তি সঞ্চয় ক'রে জীবন-ধারণ করে। এরা এই শক্তি-প্রয়োগে বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলিকে অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। সেইরূপে **ক্লোসট্রিডিয়াম প্যাসটিউরিয়ানাম** (*Clostridium pasteurianum*) নামক ব্যাকৃটিরিয়াও বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলিকে অ্যামোনিয়া ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। কিন্তু এদের শ্বাসকার্য অক্সিজেনের দ্বারা পরিচালিত হয় না। মাটির ভেতরকার জল-অঙ্গার পদার্থগুলিকে এরা নিজ দেহ হতে উৎসেচক রস (*Enzyme*) নির্গত ক'রে বিশ্লেষণ করে এবং এর দ্বারা গতিশক্তি সঞ্চয় করে। ব্যাকৃটিরিয়াগুলির দেহ হতে জীবিত অবস্থায় অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিঃসৃত হয়, কিংবা মৃত অবস্থায় এদের দেহে জমা থাকে। **নাইট্রোসোমোন্যাস** (*Nitrosomonas*) নামক একপ্রকার ব্যাকৃটিরিয়া মৃত্তিকায় প্রচুর জন্মায়। ইহারা অ্যামোনিয়াকে অক্সিজেন দ্বারা নাইট্রাস অ্যাসিডে পরিণত ক'রে গতিশক্তি সঞ্চয় করে। উপরোক্ত রাসায়নিক সংকেতের ইঙ্গিত নিচে দেওয়া হ'ল :

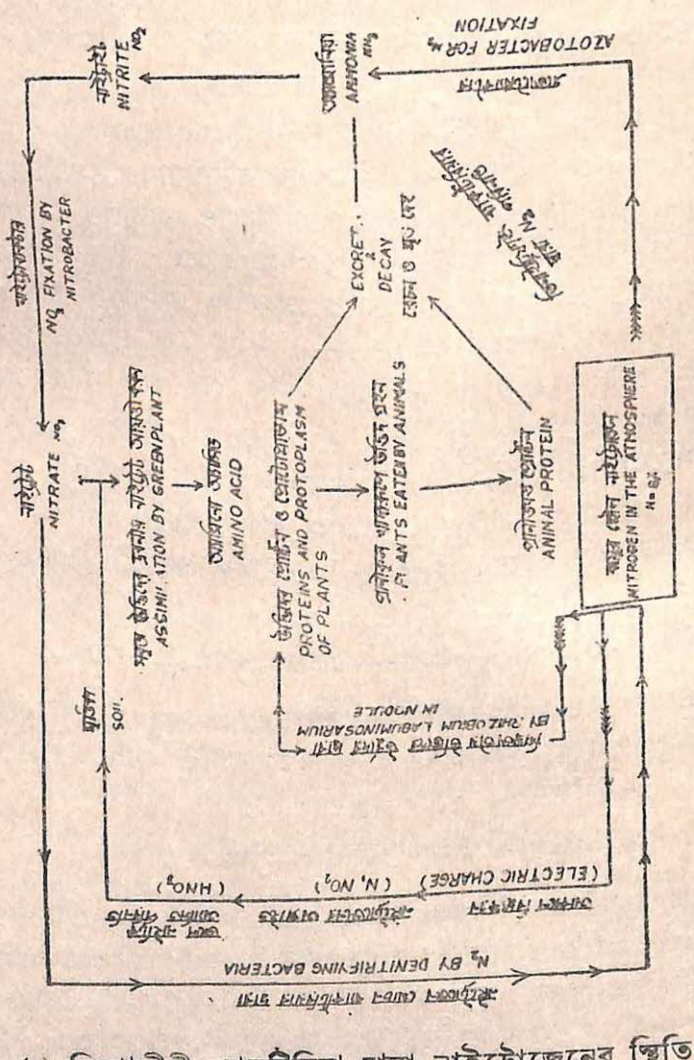
$$2NH_3 + 3O_2 + \text{Nitrosomonas} - 2HNO_2 + 2H_2N + 179 \text{ Cal.}$$

নাইট্রাস অ্যাসিড আবার **নাইট্রোব্যাকৃটার** (*Nitrobacter*) নামক একপ্রকার ব্যাকৃটিরিয়ার সাহায্যে আরও অক্সিজেন শোষণ ক'রে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, যথা—

$$2HNO_2 + O_2 \text{ (Nitrobacter)} - 2HNO_3 + 18 \text{ Cal.}$$

নাইট্রোব্যাকৃটার ব্যাকৃটিরিয়াও এইভাবে অল্প পরিমাণে শক্তি শোষণ করতে পারে। সুতরাং নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড মাটির ভিতরকার বিবিধ ধাতব লবণের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যথাক্রমে নাইট্রাইট (Nitrite) এবং নাইট্রেট তৈরি করে। নাইট্রাইট লবণগুলিকে পুনরায় **নাইট্রোব্যাকৃটর ব্যাকৃটিরিয়া** নাইট্রেটে পরিণত ক'রে ক্ষান্ত হয়। এইভাবে মাটির ভিতরকার স্বাধীন ব্যাকৃটিরিয়া দ্বারা বাতাসের নাইট্রোজেনের অণুগুলি নাইট্রেটে স্থিতিলাভ করে এবং উদ্ভিদ্‌-ভোগ্য হয়। নাইট্রো-সোমোন্যাস ও নাইট্রোব্যাকৃটার ব্যাকৃটিরিয়াকে নাইট্রোজেন-গ্রহণের জন্য, উহাদের

নাইট্রোজেন-আত্তীকরণ-ব্যাক্‌টিরিয়া বা **নাইট্রিফাইং ব্যাক্‌টিরিয়া** (*Nitrifying bacteria*) বলা হয়।



চিত্র 92—নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র।

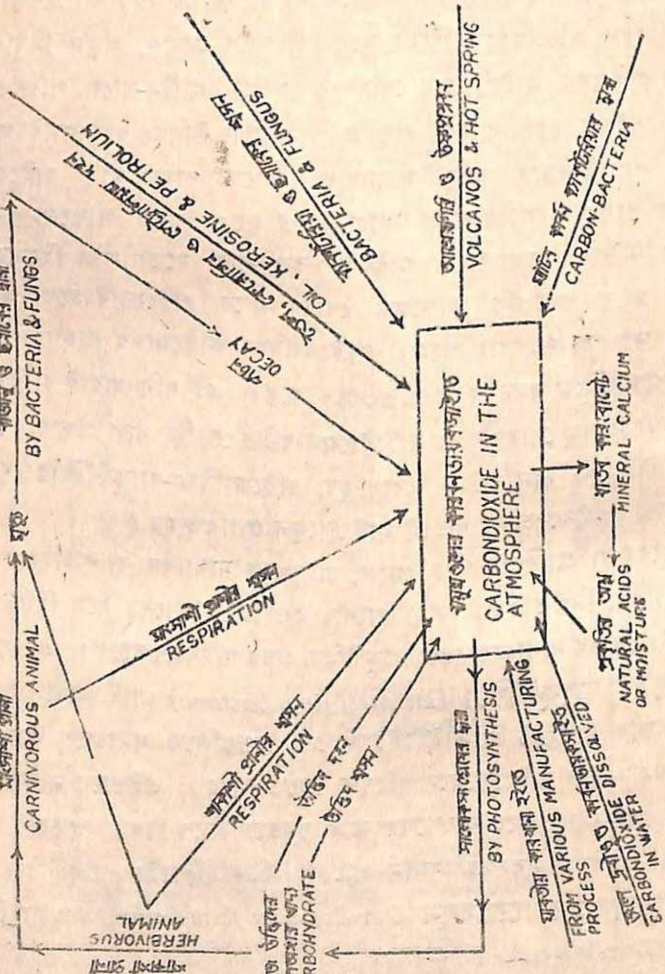
(৩) **মিথোজীবী ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেনের স্থিতি** (*Nitrogen fixation by symbiotic bacteria*)ঃ আমরা জানি যে—ছোলা, মটর প্রভৃতি শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে **অর্বুদ** (*Nodule*) জন্মায় এবং আমরা এও জানি যে, অর্বুদের ভেতরে একপ্রকার **রাইজোবিয়ম** (*Rhizobium*) নামক ব্যাক্‌টিরিয়া

বাস করে। এরা শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা নির্মিত জল-অঙ্গার খাদ্য দহন ক'রে শক্তি শোষণ করে এবং তার দ্বারা বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ ক'রে একে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যে পরিণত করে। এই নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য উদ্ভিদ্ গ্রহণ ক'রে তার নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাইজোবিয়ম অন্যপ্রকার উদ্ভিদের মূলের সংস্পর্শে এলেও, অর্বুদ নির্মাণ করতে পারে না, বা বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ ক'রে তা প্রোটিন-খাদ্যে পরিণত করতে পারে না। সেইরূপ ছোলা বা মটর প্রভৃতি শিম্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ও রাইজোবিয়ম ব্যতীত অন্য কোন ব্যাক্‌টিরিয়ার সঙ্গে জীবনধারণ করতে পারে না। রাইজোবিয়ম-ব্যাক্‌টিরিয়ার শ্বাসকার্য অক্সিজেনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এদের অক্সিজেন সরবরাহ করবার জন্য উদ্ভিদের মূলকোষে প্রাণীদের রক্তকণার মতো লাল হিমোগ্লোবিন-কণার সৃষ্টি হয়। কণাগুলি অক্সিজেন শোষণ ক'রে রাইজোবিয়মকে শ্বাসকার্য-পরিচালনার জন্য তা সরবরাহ করে। রাইজোবিয়ম অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভিদের জল-অঙ্গার খাদ্যগুলিকে দহন ক'রে শক্তি সঞ্চয় করে। এই শক্তি দ্বারাই রাইজোবিয়ম বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ ক'রে নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা অংশীদার উদ্ভিদ্‌কে দান করে। বোধ হয়, রাইজোবিয়ম-ব্যাক্‌টিরিয়ার দেহ হতে নিঃসৃত রাসায়নিক উৎসেচকের দ্বারাই নাইট্রোজেন শোষিত হয়।

উদ্ভিদ্‌দেহ বা প্রাণিদেহ পচে গেলে, তা থেকে নানাবিধ ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়। ইহা গ্যাসীয় হওয়ায়, বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আবার, মাটির ভেতর নানাপ্রকারের ব্যাক্‌টিরিয়া প্রচুর পরিমাণে থাকে। এগুলির মধ্যে **ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্‌টিরিয়া** (*Denitrifying bacteria*) গোষ্ঠী প্রধান। এগুলি মাটির ভেতরকার নাইট্রেট ও নাইট্রাইট ধাতব লবণগুলিকে অনায়াসে অ্যামোনিয়া গ্যাসে বা এমনকি মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করতে পারে। এইভাবে নাইট্রেট হতে প্রচুর নাইট্রোজেন নির্গত হয়ে বাতাসের সঙ্গে পুনরায় মিশে যায়। সুতরাং বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবসময় সমান থাকে। ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্‌টিরিয়ার মধ্যে **সিউডোমোন্যাস ফ্লুয়োরেসেন্স** (*Pseudomonas fluorescence*) এবং **ব্যাসিলাস সাব্‌টিলিস** (*Bacillus subtilis*) প্রধান।

কার্বনের বিবর্তন-চক্র (Carbon cycle): উদ্ভিদের প্রধান ও প্রথম খাদ্য হচ্ছে শ্বেতসার। সালোকসংশ্লেষ-প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ বাতাস হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শ্বেতসার খাদ্যই অন্যান্য জৈব-অজৈব উপাদানের সংমিশ্রণে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, তৈল ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত

করে। কোষের সাইটোপ্লাজমের বহুবিধ উপাদানের মধ্যে কার্বন একটি। একদিকে উদ্ভিদ্‌ যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, তেমনি শ্বসন-ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হতে এরা কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে। সুতরাং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কার্বন



চিত্র 98—কার্বনের বিবর্তন-চক্র।

ডাই-অক্সাইড নানা উপায়ে পুনরায় দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু পুনরায় তা বাতাসে ফিরে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্রমাগত জীবদেহে প্রবেশ এবং জীবদেহ হতে পুনরায় বের হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিলিত হওয়াকেই **কার্বনের বিবর্তন-চক্র** বলা হয়।

এই বিবর্তন-চক্রে বহু উপায়ে পৃথিবীর সজীব ও নির্জীব বস্তু হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

সবুজ উদ্ভিদ্ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দেহের ভিতরে প্রবেশ করায় এবং এর সঙ্গে জলের সংমিশ্রণের ফলে শ্বেতসার খাদ্য প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ্ দিবাকালে সূর্যের আলোকের সাহায্যে উক্ত খাদ্য তৈরি করে এবং এই প্রণালী রাত্রিকালে কার্যকরী হয় না। উদ্ভিদের শ্বসন-ক্রিয়ায় জল-অঙ্গার খাদ্যগুলি অক্সিজেনের দ্বারা দহিত হয় এবং এতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনরায় নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বহু ছত্রাক ও ব্যাক্‌টিরিয়া জল-অঙ্গার খাদ্য তৈরি না করলেও তৈল, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ প্রভৃতি খাদ্যকে শ্বসন-ক্রিয়ায় দাহ করে এবং তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। শাকাশী প্রাণিগণ প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উদ্ভিদের দেহজাত জল-অঙ্গার ইত্যাদি এদের একমাত্র খাদ্য। শাকাশী প্রাণীদের মৃত্যুর পরে মৃতদেহ হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। বীজাণুর দ্বারা পচনের ফলে দেহের সমস্ত জল-অঙ্গার-জাতীয় বস্তু হতে উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলেও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। সেইরূপ শাকাশী প্রাণীদের ভক্ষণকারী মাংসাশী প্রাণীগুলি মৃত্যু ও পচনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত করে। কাঠ, চর্বি, জ্বালানী তৈল (যেমন—কেরোসিন, গ্যাসোলিন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি), বনজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আমরা নিজ স্বার্থে প্রতিদিন জ্বালিয়ে থাকি। এসবের জ্বলনের সময়ে নানা গ্যাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডও নির্গত হয়। পৃথিবীর নানা আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবণ হতে নানা-প্রকার ধাতব পদার্থ তরল অবস্থায় নির্গত হতে দেখা যায়। সেগুলির সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সর্বদাই নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। কার্বন-ব্যাকটিরিয়াগুলি মাটির ভেতরের কার্বনকে প্রথমে **কার্বন মনক্সাইডে** (*Carbon monoxide*) পরিণত করে এবং পরে কার্বন মনক্সাইড গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয় এবং ক্যালসিয়াম-জাতীয় ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে কার্বোনেটের সৃষ্টি করে। কার্বোনেট মৃত্তিকার চাপে কঠিন চুনাপাথরে পরিণত হয়। এইরূপ চুনাপাথর জলের বা অম্লের সংস্পর্শে এলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। পুষ্করিণী, নদী ও সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। জলজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী তা ব্যবহার ক'রে জীবনধারণ করে। জলজ প্রাণীগুলি কার্বন ডাই-অক্সাইডকে কার্বোনেটরূপে পরিণত করতে পারে। ঝিনুক, শামুক, প্রবাল ইত্যাদি প্রচুর জলজ-প্রাণীর বহিরাবরণী বা খোলস এই কার্বোনেটের দ্বারাই নির্মিত। খোলসগুলিকে দহন করলে, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু হলে

খোলসগুলি নানারূপ রাসায়নিক-ক্রিয়ার ফলে পুনরায় কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কল-কারখানার চিমনি হতে এবং প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যের নির্মাণ-কার্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। সাধারণভাবে কার্বন-বিবর্তন-চক্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যবহারের চেয়েও তার নির্গমনই বেশী। সমগ্র সবুজ উদ্ভিদ, বেশ কিছু-সংখ্যক ছত্রাক ও ব্যাক্‌টিরিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নানা খাদ্য প্রস্তুত করে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে যথাক্রমে কঠিন কার্বোনেট ও জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তুত করে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে বা জলে গড়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় সমানই থাকে।

অক্সিজেনের বিবর্তন-চক্র (Oxygen cycle)

আমরা জানি যে সবুজ উদ্ভিদ্ দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে শোষণ ক'রে পাতার মধ্যে শ্বেতসার খাদ্য তৈরি করে। এটা উদ্ভিদের একটি বিশেষত্ব। এই শারীর-বৃত্তিক পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ্ দেহ থেকে অক্সিজেন বাতাসে নির্গত করে। দিনের বেলায় এইভাবে বাতাসে ক্রমাগত অক্সিজেন জমা হয়। যে স্থানে যত বেশী সবুজ গাছপালা রয়েছে, সে স্থানের বাতাসে তত বেশী অক্সিজেন থাকার কথা। যদিও উদ্ভিদ্ দিন-রাতই শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে, তবুও দিনের বেলায় যে অক্সিজেন সালোকসংশ্লেষের দ্বারা উদ্ভিদ্ বাতাসে নির্গত করে, তার পরিমাণ অনেক বেশী থাকায়, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণের সমতা থাকে। বাতাসে উদ্ভিদ্-প্রদেয় অক্সিজেন প্রাণীরা শোষণ ক'রে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে। মোট কথা, প্রাণীদের বা মানবজাতির জীবন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সবুজ উদ্ভিদের উপর। বাতাসে এক ভাগ অক্সিজেন থাকে, আর থাকে চার ভাগ নাইট্রোজেন। এই এক ভাগ অক্সিজেন সমস্ত জীব-জগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। উদ্ভিদ্‌ও দহনের জন্য শ্বাসক্রিয়ায় দিন-রাত অক্সিজেন শোষণ করে। প্রাণীও ঠিক সেইভাবে দিন-রাত শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন শোষণ করছে এবং দেহের ভেতর তা দিয়ে দহন ক'রে নিজেকে সজীব রাখছে। কিন্তু বাতাসে অক্সিজেন আসছে কোথা থেকে? এতো অক্সিজেন-শোষণে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে না-ই বা কেন? আমরা জানি, একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ্‌ই দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন দেহ থেকে বের ক'রে দেয়। বাতাসে এই একটিমাত্র উপায়ে অক্সিজেন প্রবেশ

করে বা বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ এই একটিমাত্র উপায়ে স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু অক্সিজেন গ্রহণকারীরা দিন-রাতই তা শোষণ করছে, তবুও বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকার দরকার, মোটামুটিভাবে তাই থেকে যায়। এটি কি-ভাবে হয়? দুটি কারণবশতঃ এটি সম্ভব হচ্ছে। প্রথমতঃ, সবুজ উদ্ভিদ্ সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ার সময়ে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন নির্গত করে, যা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী নিশ্বাস নিয়েও শেষ করতে পারে না, বা বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনের স্থিতিশীলতার হেরফের করতে পারে না, অর্থাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ কমাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সবুজ উদ্ভিদ্ প্রাণিজগতের তুলনায় অন্ততঃ তিনগুণ হওয়ায়, বাতাসে অক্সিজেন সব সময়ে ঠিকই থাকে। বন-জঙ্গল ও গাছপালা কেটে শহর তৈরি করা যে কি মারাত্মক, এখন হয়তো তোমরা তা কিছুটা অনুমান করতে পারছ। অতিরিক্ত পরিমাণে গাছপালা কেটে-কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট ক'রে মানুষ যে ভাবে সভ্যতার পরিধি বাড়িয়ে চলেছে, তার ফলে এমন সময় একদিন আসবে, যে দিন সমস্ত জীবেরই জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। অক্সিজেনের পরিমাণ বাতাসে কমে যাবে এবং জীব নিশ্বাস-গ্রহণ প্রয়োজনমতো করতে পারবে না। ফলে, সমস্ত জীব-জগৎ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা বায়ু তরল ক'রে তা থেকে অক্সিজেন বের ক'রে লোহার সিলিণ্ডারে পুরে মানুষের ব্যবহারে লাগাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বায়ুতে সবুজ গাছপালার অভাবে যদি অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যেতে থাকে, তা হলে জীবের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে, সে-কথাও নিশ্চয়ই চিন্তা করা দরকার। কারণ, অক্সিজেনের উৎস কেবলমাত্র সবুজ গাছপালা, এবং এরাও বেঁচে থাকে অক্সিজেন দহন করে। অক্সিজেন-গ্রহণে জীব যেমন বেঁচে থাকে তেমনি নিত্য অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার জন্য ধীরে-ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে জরা এগিয়ে আসে। অক্সিজেন সর্বদাই ক্ষয় হচ্ছে এবং অক্সিজেনের নিত্য-ক্ষয়ই জীবকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। অক্সিজেন জীবকে পালন করে, আবার হননও করে।

নবম পরিচ্ছেদ

জীব, জড় ও পরিবেশ

বাস্তু-সংস্থান-তন্ত্র (Eco-system)ঃ নানারকমের জীব ও জড়পদার্থ প্রকৃতির একই পরিবেশে এক এক স্থানে বাস ক'রে আসছে। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধ নানা রকমের হয়। এক এক স্থানে এক-একটি গোষ্ঠী বা দল হিসেবে এরা বসবাস করে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিসমূহ পরস্পর একে অপরের স্বার্থে প্রকৃতির বিবিধ হাতিয়ারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক-একটি গোষ্ঠী বা ছোট ছোট দল তৈরি করে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এদের **সজীব গোষ্ঠী** (*Biotic Community*) বলেন। এক-একটি গোষ্ঠীতে নানাপ্রকারের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বসবাস করে। এই সুন্দর সহ-অবস্থানের মধ্যে নানারকমের সম্বন্ধও দেখা যায়। নিচে কয়েকটি সহ-অবস্থানের কথা দেওয়া হ'ল :

1. **সহকৃতি** (*Myrmecophily*)ঃ বড় বড় আমগাছ লম্বায় উঁচু না হয়ে চওড়ায় বেশ প্রসারিত হয়। তাই আমগাছের তলায় সবসময়ে ছায়া থাকে। আমগাছের পাতা গোরু, ছাগল ও অন্যান্য শাকাশী প্রাণীদের প্রিয় খাদ্য। মানুষ গোরু ও ছাগলকে খাওয়াবার জন্য আমগাছে উঠে অনেকসময়ই তার ডাল-পাতা পেড়ে নেয়। আমগাছ তাই এক অভিনব পন্থার দ্বারা নিজেকে শাকাশী, এমনকি মানুষের আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। এক ধরনের বড় বড় লাল-পিঁপড়া আমগাছের গোড়ায়, কাণ্ডে, শাখায়, এমনকি পাতায়ও বাস করে। পাতার রসকে খেয়ে এরা জীবনধারণ করে এবং বাসায় থেকে আমগাছেই সুখে জীবন-নির্বাহ করে। শাকাশী প্রাণী বা মানুষ গাছে চড়লেই এরা ভীষণভাবে কামড়ায়। কামড়ের জ্বালা ও যন্ত্রণায় কেউ গাছের দিকে এগুতে পারে না। গাছের সঙ্গে পিঁপড়ার এই সম্বন্ধকে **সহকৃতি** বলা হয়। পিঁপড়া গাছ থেকে খাদ্য ও বাসস্থান পায়, আর গাছ পিঁপড়ার সাহায্যে যতটা সম্ভব আত্মরক্ষা করতে পারে। আমেরিকায় একরকমের বাবলা-জাতীয় গাছেও এই ধরনের পিঁপড়া দেখা যায়। সজিনা গাছ ও শিউলি গাছের গোড়ায় অসংখ্য শুঁয়াপোকা দেখা যায়। এরা গাছের ক্ষতি করে না, বরং গাছকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে।

2. **মিথোজীবিতা** (*Symbiosis*): হাইড্রা নামে একরকমের একনালি-দেহী প্রাণীর দেহকোষের মাঝে-মাঝে কিছু কিছু সবুজ রঙের ক্লোরোফিল-যুক্ত এককোষী উদ্ভিদ্ দেখা যায়। এরা সূর্যের আলোক থেকে শক্তি নিয়ে নিজেদের দেহের ভেতর শ্বেতসার তৈরি করে। হাইড্রা এই সবুজ শৈবাল-জাতীয় এককোষী উদ্ভিদের তৈরি-করা শ্বেতসার খাদ্য হিসেবে সংগ্রহ করে এবং ছোট ছোট সামুদ্রিক পোকা ধ'রে যে প্রোটিন-খাদ্য সংগ্রহ করে, তার কিছুটা ভাগ এককোষী সবুজ রঙের শৈবালকে দেয়। শৈবাল তার নাইট্রোজেন খাদ্য হাইড্রা থেকে সংগ্রহ করে। এইভাবে একটি প্রাণী ও আর-একটি উদ্ভিদ্ নিজেদের স্বার্থের জন্য পরস্পর সুন্দরভাবে একই স্থানে বাস করে। এদের প্রত্যেককে **মিথোজীবী** (*Symbiont*) বলে ও এদের সম্বন্ধকে মিথোজীবিতা বলা হয়। **লাইকেন** (*Lichen*)-জাতীয় একরকমের উদ্ভিদ্‌কে পচা কাঠের গুঁড়ির উপর জন্মাতে দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছু শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ্ও জন্মায়। এরা সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ ক'রে শ্বেতসার তৈরি করে। উদ্ভিদের কিছু অংশ ছত্রাক-জাতীয়। এরা শ্বেতসার থেকে নিজেদের খাদ্য শোষণ ক'রে নেয় এবং উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি করে। শৈবাল ও ছত্রাক-মিশ্রিত এই উদ্ভিদের সৃষ্টি অভিনব। কারণ, এই উদ্ভিদের মধ্যে দুইরকমের উদ্ভিদ্ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রের উদ্দেশ্য এক পরস্পরের স্থিতির জন্য পরস্পরকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন-নির্বাহ করা। লাইকেন মিথোজীবিতার একটি আদর্শ উদাহরণ।

3. **সহযোগিতা** (*Commensalism*): দুটি প্রাণী এমনভাবে জীবনযাপন করে, যাতে একটি প্রাণী অপরটির সাহায্যে জীবনধারণের পথ সহজ ক'রে নেয়। দ্বিতীয় প্রাণীকে প্রথম প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে, প্রথম প্রাণীর কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীর প্রচুর অসুবিধা হয় এবং তার জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই দ্বিতীয় প্রাণীকে **সহযোগী** (*Commensal*) বলা হয়। **রিমোরা** (*Remora*) নামে একরকমের সামুদ্রিক মাছ আছে, যার সামনের পাখনা-দুটিকে একটি গোল **চোষকে** (*Sucker*) পরিণত হতে দেখা যায়। মাছটি বড় বড় **হাঙর**, তিমি ইত্যাদির গায়ে তার চোষকের দ্বারা আটকে থাকে। হাঙর বা তিমি সজোরে সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায় আর তার দেহে আটকে থেকে রিমোরাও অতি সহজে বিনা পরিশ্রমে সমুদ্রের নানা স্থান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। তিমি বা হাঙরের খাদ্য-গ্রহণের সময়ে কিছু কিছু খাদ্য জলে ভাসতে থাকে, সেগুলি রিমোরা অনায়াসে সংগ্রহ ক'রে নেয়। এই সম্বন্ধে দুটি প্রাণীর মধ্যে একে অপরকে ভক্ষণ করে না বা দুইজনাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। রিমোরার সঙ্গে হাঙরের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু

হাঙর বা তিমি না থাকলে, রিমোরার পক্ষে জীবন-নির্বাহ করা অতীব কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই রিমোরা সহযোগী প্রাণী।

সমুদ্রের বড় বড় **ঝিনুকের** মধ্যে **কাঁকড়াকে** বাস করতে দেখা যায়। এখানে কাঁকড়া সহযোগী প্রাণী। আবার **সি-অ্যানিমন** (*Sea-anemone*) নামক একরকমের একনালি-দেহী প্রাণীকে ঝিনুকের খোলের উপর আটকে থেকে জীবনযাত্রা-নির্বাহ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সি-অ্যানিমন সহযোগী প্রাণী। এই ধরনের কাঁকড়াকে সন্ন্যাসী-কাঁকড়া (Hermit crab) বলা হয়। **কাঠঠোক্‌রা** পাখি বড়-বড় গাছের কাণ্ডে তাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে গর্ত ক'রে ঘর বাঁধে। ডিম দিয়ে ঘর আগলে রেখে তারা পাহারা দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পরে তারা বাচ্চাগুলিকে বড় ক'রে ঘর ছেড়ে অন্য জায়গাতে উঠে যায়। এক ধরনের **নীলপাখি** (*Blue bird*) নিজেরা গাছের কাণ্ডে গর্ত ক'রে ঘর তৈরি করতে পারে না, তাই তারা কাঠঠোক্‌রা পাখির পরিত্যক্ত বাসায় নিজেদের ঘর বাঁধে আর ডিম পাড়ে। এক্ষেত্রে নীলপাখি কাঠঠোক্‌রার দ্বারা উপকৃত, তাই নীলপাখি সহযোগী।

4. **পরজীবিতা** (*Parasitism*)ঃ মানুষের পাকস্থলীর ভেতরে নানা প্রজাতির কৃমি বাস করে। এরা পাকস্থলীর ভেতরকার খাদ্যরস শোষণ ক'রে জীবনধারণ করে। অন্ত্রের ভিতরের গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে রক্ত শোষণ করে। প্লাস্‌মোডিয়াম বা ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের মধ্যে থেকে রক্ত খেয়ে জীবন-যাপন করে। আবার অ্যাণ্টা-অ্যামিবা বা আমাশয়ের জীবাণু—এরাও অন্ত্রের গাত্রে ক্ষত-সৃষ্টি করে ও রক্তপান ক'রে জীবনধারণ ক'রে থাকে। যকৃৎ ও বৃক্কে প্রবেশ ক'রে সেগুলিকে ক্ষয় ক'রে দেয়। এইরকম অজস্র প্রাণী মানুষের দেহের ভেতর ঘর-সংসার বেঁধে থাকে। তাদের খাদ্য মানুষই যোগায়। তাই এদের **পরজীবী** বলা হয়। মানুষ এইসব পরজীবীকে আশ্রয় দেয়, তাই তারা আশ্রয়দাতা বা হোস্ট (Host)। কৃমি, প্লাস্‌মোডিয়াম বা অ্যাণ্টা-অ্যামিবা, এরা সবই **পূর্ণ-পরজীবী** (*Total Parasite*)—আশ্রয়দাতা মানুষকে শোষণ ক'রে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়। এদের আবার **অন্তঃপরজীবীও** (*Endoparasite*) বলা হয়। এরা দেহের ভেতরে থেকে শোষণ করে, তাই এরা অন্তঃপরজীবী। স্বর্ণলতা উদ্ভিদ্ একটি পূর্ণ-পরজীবী প্রাণী। স্বর্ণলতার মূল আশ্রয়দাতার কাণ্ডের ভেতরে ঢুকে গিয়ে কাণ্ডের ভেতর থেকে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের খাদ্যরস শোষণ ক'রে নেয়। ফলে, আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্‌টি ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মরে যায়। রাস্‌না বা অর্কিড উদ্ভিদ্‌ও একটি পরজীবী। এরা আমগাছ বা শিমুলগাছের অক্ষের খাঁজে জন্মায় ও এদের মূল বাতাস থেকে জল শোষণ করতে পারে। এরা আশ্রয়দাতা

উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করে না। এদের **বহিঃপরজীবী** (*Ectoparasite*) বলে। মানুষের মাথার চুলের উকুন, গায়ের লোমের চাম—এগুলিও বহিঃপরজীবী। এরা দেহের বাইরে থেকে রক্ত শোষণ ক'রে জীবন-যাপন করে। এরা মারাত্মক না হলেও, নানা রোগের জীবাণু বহন করে। মশা ও ছারপোকা—মানুষ, গোরু, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীর রক্ত শোষণ ক'রে জীবনধারণ করে। এরা কিন্তু মানুষ বা অন্য প্রাণীদের দেহের ভিতরে বা বাইরে বাস করে না। সময়মতো কামড়ে রক্ত শোষণ করে। এদেরও পরজীবী বলা হয়। আবার জোঁক—মানুষ, গোরু বা মোষ সামনে পেলে, তাদের ধারালো দাঁত বসিয়ে রক্ত শোষণ করে। পচা পুকুর বা ডোবায় এদের বাস। এরাও পরজীবী। প্লাসমোডিয়াম, অ্যান্টা-অ্যামিবা, উকুন, মশা, ছারপোকা—এদের পরজীবিতা বিভিন্ন প্রকারের ও আশ্রয়দাতা প্রাণীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধও নানারকমের। অ্যান্টা-অ্যামিবার আশ্রয়দাতা দুটি প্রাণী—মানুষ ও মশা। এদের জীবনচক্র পর-পর দুটি প্রাণীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। তাই এক্ষেত্রে অ্যান্টা-অ্যামিবার প্রথম ও প্রধান 'হোস্ট' হচ্ছে মানুষ ও দ্বিতীয় 'হোস্ট' হচ্ছে মশা। মশাকে **অন্তর্বর্তী পরজীবী** (*Intermediate host*) বলা হয়। এককোষী **মনসিস্টিস**ও কেঁচো ও পাখির মাধ্যমে তার পরজীবী-জীবনের জীবনচক্র সমাপ্ত করে। কেঁচোর সে ক্ষতি করে, কিন্তু পাখির ক্ষতি করে না। কিন্তু পাখির পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে সে আবার কেঁচোর পৌষ্টিকনালীর মধ্যে প্রবেশ করে। পরজীবীদের পরজীবিতার স্থায়িত্ব সব পরজীবীর ক্ষেত্রে সমান নয়। মশা মানুষ বা গবাদি পশুর রক্ত পান না করলেও, সে অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। কতক্ষণ মশা মানুষকে কামড়ায়? শুধুমাত্র রক্তের উপর মশা নির্ভরশীল নয়। উকুন বা চাম কিন্তু রক্তের উপর নির্ভরশীল। জোঁক একবার বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে রক্ত শোষণ ক'রে তারপর ছেড়ে দেয়। তারপর বেশ কিছুদিন রক্ত শোষণ না ক'রেই বেঁচে থাকে। মশা ক্ষণিকের মধ্যে রক্ত শুষে নেয়, কিন্তু বারে-বারে শোষণ করতে চায়। তাই জোঁক আর মশার পরজীবিতার ধরন-ধারণ এক নয়।

5. **শিকারী** (*Predation*): তোমরা প্রাণীদের মধ্যে নানারকমের সম্বন্ধের কথা এখন জানতে পারলে, কিন্তু প্রাণীর সঙ্গে খাদ্যের ব্যাপারে অন্য প্রাণীদের নিগূঢ় সম্বন্ধ কত সর্বাত্মক হয়, সে বিষয়ে কিছু জানা দরকার। উদ্ভিদের মধ্যেও এই ধরনের খাদ্যের জন্য লড়াই দেখা যায়। শাক-সব্জির ক্ষেতে যত ভালোভাবেই মাটি পরিষ্কার করা যাক না কেন, মুথা-ঘাস ও নানারকমের জংলী কাঁটা-গাছ তাতে জন্মাবেই। শাক-সব্জির বৃদ্ধিরোধ ক'রে এরা মাটির সার জোর ক'রে টেনে নেবে। এর কারণ, এই গাছেদেরও বাঁচতে হবে। বাঘ বা সিংহ মরা প্রাণী খায় না। তারা শিকার ক'রে

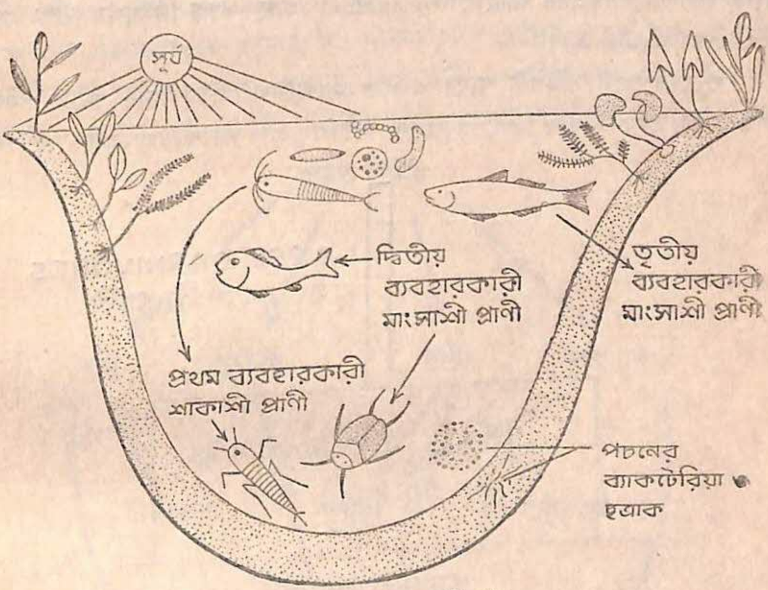
প্রাণীটিকে মেরে তাজা রক্ত-মাংস খায়। এদের শিকারী, অর্থাৎ **জ্যান্ত-প্রাণী-শিকারী** (*Predators*) বলা হয়। ধরা যাক, একটি বাঘ একটি বড় সম্বর (গোরুর মতো বড় জাতের হরিণ) মেরে ঝোপের আড়ালে ফেলে খাচ্ছে। সে একসঙ্গে সমস্ত সম্বরটাকে খেয়ে ফেলতে পারে না। কিছুটা খাবার পরে বাঘ জল খেতে নদীর ধারে চলে যায়। তখন দেখা যাবে, শেয়াল এসে সেই মরা হরিণ খেতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে শকুন এসে মরা হরিণটার চারপাশে জমা হচ্ছে। শেয়াল শকুনের অত্যাচারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন শকুন দলবদ্ধভাবে মরা হরিণ খেতে আরম্ভ করে। বাঘ জ্যান্ত হরিণ শিকার করায়, তাকে বলা হয় **জ্যান্ত-প্রাণী-শিকারী** (*Predator*)। কিন্তু শেয়াল ও শকুন মরা হরিণ খেয়ে জীবন-যাপন করে। এক্ষেত্রে শেয়াল ও শকুনকে **মরা-শিকারী** (*Scavenger*) বলা হয়। কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে মরা-শিকারীও জ্যান্ত-প্রাণী-শিকারীতে পরিণত হয়। শেয়াল খরগোশ ধ'রে জ্যান্ত খায়। আবার শকুন পাখি শিকার ক'রে খায়। তাই শিকারী কখনও জ্যান্ত-শিকার করে, আবার কখনো কখনো মরা-প্রাণী শিকার ক'রে খায়।

6. **খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ** (*Eater and Eaten*)ঃ শিকার ও শিকারীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, পরজীবী ও তার আশ্রয়দাতার মধ্যে সম্বন্ধও ঠিক তেমনি। পরজীবী প্রাণী আশ্রয়দাতা প্রাণীকে প্রাণে না মেরে তার ক্ষতি করে, কিন্তু শিকারী শিকারকে মেরে ফেলে। গোরু ও ছাগল ঘাস বা গাছপালা সম্পূর্ণ খায় না, কিছুটা খেয়ে এগিয়ে যায়। ব্যাঙ মশার ডিম খায়, কিন্তু কিছু ডিম থেকে যায়। তেমনি সাপের প্রিয়খাদ্য ব্যাঙ। বেড়াল ইঁদুর ধ'রে খায়। কুকুর বেড়াল দেখলেই তাড়া করে। বাজপাখি তার ধারালো নখ দিয়ে পাখির ছানা, ইঁদুর ও বেড়ালের ছানা শিকার ক'রে খায়। কিন্তু সেও রেহাই পায় না। তার গায়ের পালকের মধ্যে উকুন ও চাম পরজীবী-রূপে বাস ক'রে তার দেহ থেকে রক্ত শোষণ ক'রে খায়। সুতরাং প্রাণীদের মধ্যে এই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ জীবের বংশবৃদ্ধিকে কমিয়ে দেয়। একে **জীবের বংশ-নিয়ন্ত্রণ** (*Biological control*) বলা হয়। ক্ষেতের শস্যহানিকর ইঁদুর ও খরগোশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাষী কুকুর পোষে। ধান, পাট ও চা-বাগানে নানা জাতের প্রজাপতির জনন করিয়ে পোষা হয় এবং ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা ধান, পাট ও চা-গাছের পরজীবী পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলে উদ্ভিদগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ কাজে ব্যবহার ক'রে বহুক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

7. **প্রতিযোগিতা** (*Competition*)ঃ ঘন জঙ্গল বা বিষুবরেখাস্থিত অঞ্চলে সাধারণতঃ গাছগুলি খুবই লম্বা হয়। সূর্যের আলোক এদের ঐরূপ হবার একমাত্র পথ।

আলোকে সালোকসংশ্লেষ ক'রে এরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। তাই কে কতটা আলো শোষণ করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা গাছে-গাছে সুরু হয়ে যায়। ফলে, গাছগুলি খুব লম্বা হয়ে যায়। প্রাণীতে-প্রাণীতে জীবনধারনের জন্য যে প্রতিযোগিতা—এটিও উদ্ভিদ, জীব ও প্রকৃতির হাতিয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্পাদিত হয়।

এক-এক জায়গায় কিছু উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী একত্র হয়ে এক-একটি সজীব-গোষ্ঠী তৈরি করে। ধরা যাক, একটি বড় পুকুর রয়েছে। পুকুরে প্রধানতঃ মাছ আছে। মাছ-খেকো মাছও কিছু রয়েছে। জলে ছোট ছোট কাছিমও আছে। অসংখ্য এককোষী



চিত্র 94—পুকুরের পরিবেশ।

শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ, যেমন—ডেস্‌মিড, ডায়াটম ইত্যাদিও জলে বাস করছে। আবার অসংখ্য কীট-পতঙ্গের লার্ভা, কপিপড, সাইক্লপ্‌স, ডাফ্‌নিয়া-ও পুকুরের জলে দেখা যায়। জলের ভেতর জল-ঢোঁড়া সাপ ও সোনা-ব্যাঙ থাকে। পুকুরের ধারে জলজ উদ্ভিদ্‌ প্রচুর দেখা যায়। উপরোক্ত সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ জলের মধ্যে সহ-অবস্থান নীতি মেনে নিয়ে একটা গোষ্ঠী তৈরি ক'রে বাস করছে। পুকুরের ধারের মাটি ও পুকুরের তলার মাটিতে প্রচুর জৈব ও অজৈব রাসায়নিক খাদ্য রয়েছে। পুকুরের ধারের উদ্ভিদের সবুজ পাতায় তৈরি হচ্ছে শ্বেতসার। শ্বেতসারে সৌরশক্তি রয়েছে। পাতা জলে প'ড়ে প'চে যাচ্ছে। পুকুরের ধারের মাটি ধুয়ে-ধুয়ে প্রতিনিয়তই জলে পড়ছে। তাতে কত রাসায়নিক

পদার্থ রয়েছে। জলের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন ও আরও কত পদার্থ। নানা জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া ও ছত্রাক পচা উদ্ভিদ্ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করছে, আর সেই খাদ্য খাচ্ছে এককোষী অসংখ্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণী। অসংখ্য সবুজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী খাদ্য তৈরি করছে নিজেদের দেহের মধ্যে, সূর্যের আলোর সাহায্যে দেহ-বৃদ্ধিও করছে। সুতরাং খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো ও জলের ভেতরকার অক্সিজেন। এই দুটিকে নিয়ে সবুজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী খাদ্য তৈরি করছে। তাই এই পুকুরের পরিবেশে পুকুরের ধারের **সবুজ গাছপালা, এককোষী শৈবাল-উদ্ভিদ্ ও এককোষী প্রাণী** (*Phytoplankton* and *Zooplankton*) হচ্ছে **খাদ্য-নির্মাণকারক জীব** (*Producer organism*)।

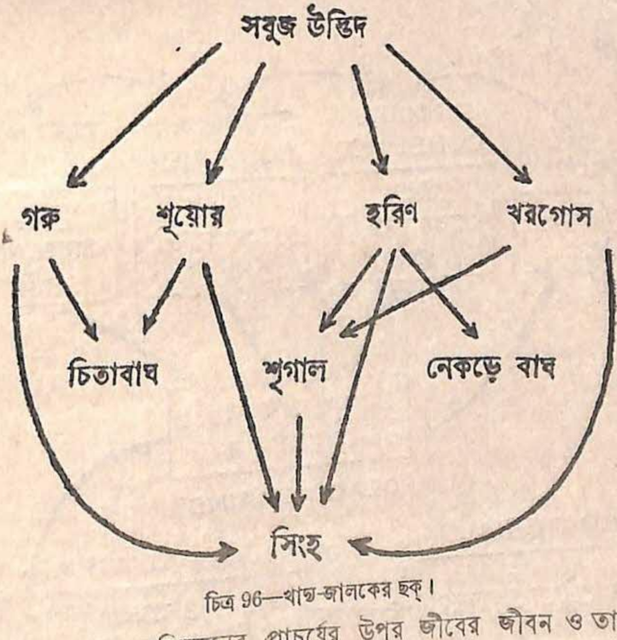
পুকুরের জলে সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্গত ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর ছোট ছোট অসংখ্য জলজ প্রাণী, যেমন—ডাফ্‌নিয়া, সাইক্লপ্‌স, সাইপ্রিস এবং ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর বহু জলজ



চিত্র 95—পরিবেশ-প্রথার খাদ্যচক্র।

প্রাণীর নানারকমের লার্ভা, যেমন—নপ্লিয়স, মেটানপ্লিয়স, জইয়া, মেটাজইয়া ইত্যাদি বাস করে। এরাই এককোষী উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের ব্যবহার করে খাদ্য-হিসেবে। তাই এদের পুকুরের পরিবেশের গোষ্ঠী-মধ্যে **প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণী** (*Primary consumers*) বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ-শ্রেণীর কিছু প্রাণীকেও প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণীরূপে

গণ্য করা হয়। পুকুরের ছোট ছোট চিংড়ি, জলের পোকা, মৌরলা মাছ, ছোট ল্যাটা-মাছ আবার প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণীদের খাদ্য-হিসেবে ব্যবহার করে। এদের তাই পুকুরের পরিবেশ-গোষ্ঠীর মধ্যে **দ্বিতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী** (*Secondary consumers*) বলা হয়। বড় জাতের মাছ মিরগেল, কাতলা, শোল, শাল ও রুই জলের দ্বিতীয় ব্যবহারকারী প্রাণীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য-হিসেবে ব্যবহার করে। তাই এদের **তৃতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী** (*Tertiary consumers*) বলা হয়। জলের কাছিম মাছ খেয়ে বাঁচে, আর জলের সাপ পুকুরের ধারের ব্যাঙ ধ'রে খায়। পুকুরের এই প্রাণীদের **জীবগোষ্ঠী** (*Biotic community*) বলে। **জড়গোষ্ঠী** (*Abiotic community*) সর্বতোভাবে জীবনধারণের রসদ যুগিয়ে জীবনধারাকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। জড়গোষ্ঠীর মধ্যে জল, আলো, বাতাস, তাপ, মাটি—এগুলির উপর জীবগোষ্ঠীর আয়ু নির্ভরশীল। পুকুরের জলে কতটা অক্সিজেন আছে, তার উপর জীবের শ্বাসক্রিয়া নির্ভর

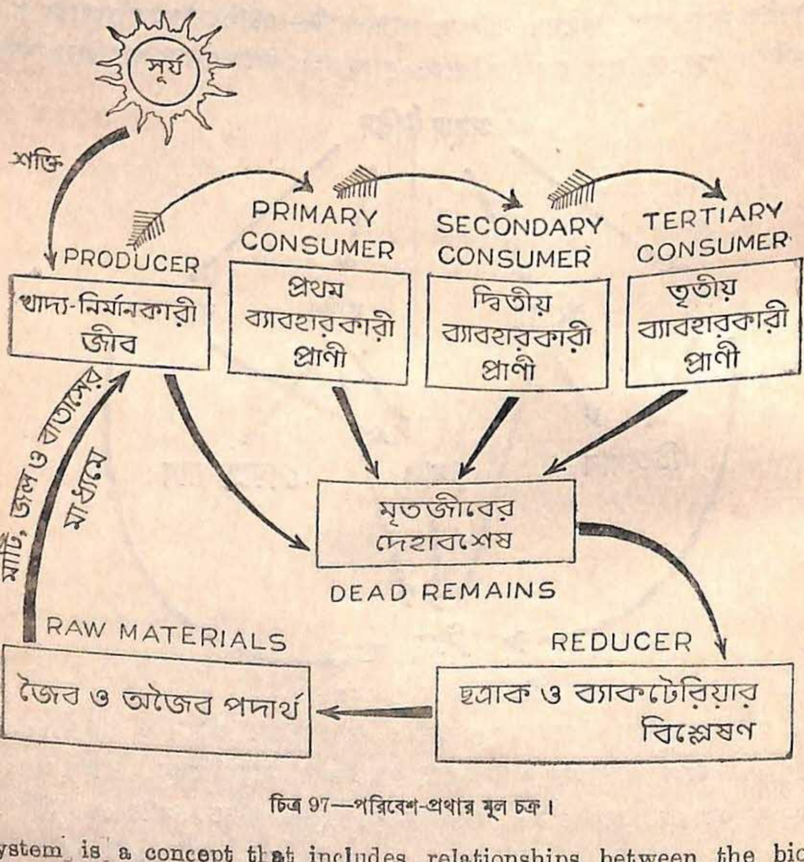


চিত্র 96—খাদ্য-জালকের ছক্।

করে। জলের ভেতরে অক্সিজেনের প্রাচুর্যের উপর জীবের জীবন ও তার জীবনচক্র নির্ভরশীল। জলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেন থাকলে, জীবের জীবন-রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে পুকুরের মাছকে ম'রে ভেসে উঠতে দেখা যায়। জল বিষাক্ত হয়ে উঠলে বা জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী হয়ে গেলে, ঐরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুকুরের তলাকার মাটি ও তার ধারের মাটিতে ক্যালসিয়াম,

পটাসিয়াম ও অন্যান্য ধাতু কতটা আছে তার উপর জীবগোষ্ঠীর স্থিতি নির্ভরশীল। তেমনি জলের উপর কতটা সূর্যের আলো পড়ে এবং জলের উত্তাপ কতটা হলে জীবের জীবনযাত্রা সহজ হয়, সেটাও পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, সূর্যের আলো ও জলের উত্তাপ জীবগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার জন্য অপরিহার্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পুকুরের পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়-গোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতাই পুকুরের পরিবেশ-প্রথাকে কার্যকরী করে।

জড়ের শোষণে জীবের সৃষ্টি। জীবের মৃত্যুতে আবার জড়ের জন্ম। তাই জীব ও জড় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়গোষ্ঠীর সম্বন্ধই যে-কোন স্থানের **পরিবেশ-প্রথা** বা সেই স্থানের **বাস্তু-সংস্থান-তন্ত্র** (*Eco-system*)। (The eco-



চিত্র 97—পরিবেশ-প্রথার মূল চক্র।

system is a concept that includes relationships between the biotic community and its abiotic community.) এইভাবে পাহাড়ের ও জলাভূমির

পরিবেশ-প্রথা বা মরুভূমির পরিবেশ-প্রথা পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, এই প্রথা **চক্রাকারে** (*Circular path*) আবর্তন করে। জড়বস্তু থেকে জীবের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, জনন ও মৃত্যু। মৃত্যুতে জড়ের সৃষ্টি। দেখা গিয়েছে যে, 17,850 পাউণ্ড শক্তি-বিশিষ্ট কুড়ি কোটি গাছপালা 2,250 পাউণ্ডের সাড়ে চারটি বাছুর সৃষ্টি করার মতো খাদ্য যোগাতে পারে। আবার এই সাড়ে চারটি বাছুরের মধ্যে যে খাদ্যসামগ্রী থাকে, তা-থেকে একটিমাত্র 105 পাউণ্ডের ওজনের বারো বছরের ছেলে বেঁচে থাকতে পারে। এ-থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কত বেশী পরিমাণ খাদ্য-নির্মাণকারী জীবের (*Producers*) সৃষ্টি হলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী (Primary, secondary and tertiary consumers) বাঁচতে পারে। জড়বস্তু থেকে খাদ্যের বিবিধ উপাদান একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ্‌ই যোগাড় ক'রে নিজের দেহের ভেতর শ্বেতসার খাদ্য তৈরি করতে পারে। শ্বেতসার খাদ্য থেকে অন্যান্য খাদ্য তৈরি হয়। সবুজ উদ্ভিদের উপর সমস্ত প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্যের জন্য নির্ভর করে। অসংখ্য শাকাশী প্রাণী, যেমন—ছাগল, গোরু, মোষ, ঘোড়া, হরিণ, হাতি ইত্যাদি উদ্ভিদ্ খেয়েই জীবনধারণ করে। আবার শাকাশী প্রাণী ভক্ষণ ক'রে বাঘ, সিংহ, শেয়াল, শকুন ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীরা জীবন-নির্বাহ করে। মানুষ সবচেয়ে উন্নত প্রাণী। এরা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দুই-ই খায়। মনুষ্যেতর শাকাশী বা মাংসাশী প্রাণী ম'রে গেলে মাটিতে প'চে থাকে এবং এই পচনের মূলে কাজ করে অসংখ্য ব্যাক্‌টিরিয়া। এরাই সেই মড়াকে পচিয়ে মাটিতে পরিণত করে। মড়া মাটিতে রূপান্তরিত হলে উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্-সারে পরিণত হয়। তাই ব্যাক্‌টিরিয়া ইত্যাদিকে **বিশ্লেষণকারী** (*Decomposers or Reducers*) বলা হয়। এরা যৌগিক জৈব-পদার্থগুলিকে পচিয়ে মূল পদার্থে আলাদা ক'রে দেয়। তখন মূল পদার্থগুলি মাটির সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে নানারকমের জলে দ্রবণীয় যৌগ-পদার্থে পরিণত হয়। তাই আমরা বলি, মড়া মাটিতে রূপান্তরিত হয় বা জীব থেকেই জড়ের সৃষ্টি। উদ্ভিদ্ মাটি থেকে জল শোষণ করার সময়ে দ্রবণীয় যৌগ-পদার্থগুলিকেও জলের সঙ্গে শোষণ ক'রে নেয়; যেমন—নাইট্রেট, ফস্‌ফেট, কিছু সালফেট ইত্যাদি। এগুলি উদ্ভিদ্‌কোষের সাইটোপ্লাজম বৃদ্ধি ক'রে কোষকে সজীব ও সতেজ করে এবং কোষ-বিভাজনে উদ্ভিদের সামগ্রিক বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ, প্রাণীর মৃতদেহের জৈব ও অজৈব পদার্থ আবার সজীবের আকার নেয়। খাদ্য-সিরিজে (*Food chain*) তৃতীয় থেকে পঞ্চম ব্যবহারকারী প্রাণী পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু যে-কোন পরিবেশ-প্রথার খাদ্য-সিরিজে উদ্ভিদ্‌কে সবচেয়ে তলায় দেখা যায়। কারণ, উদ্ভিদ্‌ই খাদ্য-নির্মাণকারী জীব। একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক ছোট ছোট

ফুল বা ফলের গাছে **অ্যাফিড্‌স** (*Aphids*) নামে একরকমের পতঙ্গ দেখা যায়। পতঙ্গগুলি পাতার রস শোষণ করে। আবার, অ্যাফিড্‌স খাবার জন্য চড়ুই, শালিখ ইত্যাদি পাখি গাছগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় আর অ্যাফিড্‌স ধ'রে খায়। অ্যাফিড্‌স সংখ্যায় অসংখ্য ও আকারেও খুব ছোট। পাখির সংখ্যা অ্যাফিড্‌স-এর চেয়ে অনেক কম এবং এদের আকারও অনেক বড়। কয়েকটি বাজপাখি এই অঞ্চলে চড়ুই বা শালিখ শিকার ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের সংখ্যা অনেক কম এবং এদের আকারও বিরাট। এক্ষেত্রে বাজপাখি তৃতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী। তাই খাদ্য-সিরিজ পরীক্ষা ক'রে আমরা কতকগুলি তত্ত্ব জানতে পারি; যেমন—উদ্ভিদ্‌ সমস্ত খাদ্য-সিরিজে নির্মাণকারী জীব। প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণী সংখ্যায় অসংখ্য এবং এরা আকারেও খুব ছোট। দ্বিতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় কম, কিন্তু এদের আকার প্রথম ব্যবহারকারী প্রাণীদের আকারের চেয়ে বড়। তৃতীয় ব্যবহারকারী প্রাণী সেইরকম দ্বিতীয় ব্যবহারকারী প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু আকারে অনেক বড়। দেখা গিয়েছে, শিকারী প্রাণীরাই বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে শেষ ব্যবহারকারী প্রাণী। খাদ্য-সিরিজে সাধারণভাবে তাদের ধরা হয়। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, সহযোগী সম্বন্ধ ও পরজীবী সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রাণীর খাদ্য-সিরিজকে আরও জটিল ক'রে তোলে। কিন্তু জীবগোষ্ঠীকে এক-একটি স্থানে একক-ভাবে ধ'রে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে সেইসব স্থানের পরিবেশ-প্রথা অনুযায়ী খাদ্য-সিরিজ বোঝা যায়। কোন জীব বা প্রাণী কোথায় বাস করছে এবং কি-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, তা জানতে হলে, সেই স্থানের জীবগোষ্ঠী ও জড়গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ ক'রে প্রাণীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক কতটা আছে জেনে নেওয়া বা স্থানের পরিবেশ-প্রথা জানা দরকার।

সংরক্ষণ (Conservation)

'সংরক্ষণ' নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতি এক-একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে এক-এক প্রকার উদ্ভিদের বা প্রাণীর পরিবেশের সূচনা করে। অর্থাৎ, ওই উদ্ভিদ্‌কে বা প্রাণীকে অন্য পরিবেশে নিয়ে গেলে, সেটি পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য বাঁচতে পারে না। সাইবেরিয়ার শ্বেত-ভল্লুক কেবলমাত্র সাইবেরিয়ার বরফ-জমা ঠাণ্ডা পরিবেশেই সহজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। শ্বেত-ভল্লুককে যদি আমাদের মতো গরম দেশে নিয়ে আসা যায়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। মরুভূমির ছোট-কাঁটা-ভরা গাছ যদি জলা-জায়গায় বা জলা-পরিবেশে রোপণ করা যায়, তাহলে সেটি

স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। সমুদ্রের জীব নদীতে থাকতে পারে না। তেমনি পাহাড়ের জীব সমতলে বাঁচতে পারে না। চা-গাছ তার পরিবেশ ছাড়া অন্য কোথাও রোপণ করলে, সেটি হয়তো বাঁচবে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন হবে। কাশ্মীরের আপেল বা আঙুর গাছ যদি চব্বিশ-পরগনায় এনে রোপণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, গাছ হয়তো বড় হবে, কিন্তু যে-ফল জন্মাবে তার স্বাদ কাশ্মীরের আপেল বা আঙুরের মতো হবে না। তাই প্রকৃতি অসংখ্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অনুযায়ী পরিবেশ তৈরি ক'রে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। কোন নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদের উপযুক্ত পরিবেশকে তার **প্রকৃতির উপযুক্ত পরিবেশের স্থান** (*Ecological niche*) বলা হয়। এখানে স্থানের অর্থ সাধারণ স্থান ঠিক নয়। প্রকৃতি-উপযুক্ত পরিবেশের স্থানের অর্থ হ'ল—যে পরিবেশে নির্দিষ্ট উদ্ভিদ্ বা প্রাণী তার বাঁচার পথ সহজ ও সুগম করতে পারে। তার জীবনযাত্রার জন্য কি কি দরকার, পরিবেশে কি কি সে পাচ্ছে—এই সব-ক'টি সমস্যা নিয়েই এক-কথায় 'তার পরিবেশের স্থান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। পরিবেশ তার বাসিন্দাদের এইভাবে সংরক্ষণ করে। পৃথিবীর সমস্ত জড় ও জীবের কোন সর্বাত্মক ধ্বংস নেই। তাদের কেবল রূপান্তর হয় নানাভাবে। প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর পর জড়-পদার্থে পরিণত হয়। বাতাসে ও মাটিতে থাকা নানারকমের পচনকারী ব্যাক্‌টিরিয়া ও ছত্রাক জড়পদার্থের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেটিকে পচিয়ে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সুরু করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস নির্গত হয়ে তা বাতাসে মিশে যায়। মাটিতে অনেক রকমের জৈব ও অজৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়, এর সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। নতুন রাসায়নিক পদার্থগুলি মাটির সঙ্গে মিশে থাকে। উদ্ভিদের পাতা, শাখা ও মূল এইভাবে মাটিতে প'ড়ে পচন-প্রক্রিয়ায় মাটিতে পরিণত হয়। এই মাটি-ই নতুন উদ্ভিদের সার। বীজ অঙ্কুরোদ্গমের পর থেকেই মাটিতে জল শোষণ ক'রে দেহ-বৃদ্ধি করে। জলে মাটির মধ্যে-থাকা রাসায়নিক দ্রবণীয় পদার্থও থাকে। সেগুলিও উদ্ভিদের দেহ-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এইভাবে পচনের ফলে যে-সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়, উদ্ভিদ্ মাটি থেকে তা শোষণ ক'রে নিজ দেহের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে মিশিয়ে নেয় এবং জড়পদার্থকে সজীব ক'রে তোলে। শাক-সব্‌জি, গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল—সবেতেই মাটি থেকে শোষণ ক'রে নেওয়া জীবের জড়পদার্থ থাকে। প্রাণী উদ্ভিদ্-ভক্ষণে বা উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল খাদ্য-হিসেবে গ্রহণ ক'রে উদ্ভিদের ভেতরে-থাকা জৈব খাদ্যগুলিকে নিজ দেহের সজীব অংশে পরিণত করে। এইভাবে মাংসাশী প্রাণী শাকাশী প্রাণীদের খাদ্য-হিসেবে গ্রহণ

ক'রে তাদের দেহ গঠন করে। মাংসাশী প্রাণীদের মৃত্যুতে আবার সমস্ত সজীব বস্তু জড়পদার্থে পরিণত হয়ে যায় এবং মাটির সংস্পর্শে আবার পচনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। প্রকৃতির এই সংরক্ষণ-প্রণালী চক্রবৎ, তেমনি বাতাসে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন চক্রও সদা-ঘূর্ণায়মান। **তাই 'এই পৃথিবীতে কোন বস্তুর ক্ষয় নেই, নেই তার ধ্বংস; কেবল আছে তার নানারকমের বৈচিত্র্যময় রূপান্তর। বস্তুর রূপান্তরই এনে দিয়েছে জীবের প্রাণময় জীবন আর জীবধারার চক্রাবর্তের প্রবাহ।** পরিবেশে এই বৃহৎ চক্রের মধ্যে আছে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য-চক্র বা বস্তু-চক্র। প্রাণীদের দেহ হতে নির্গত রেচন-পদার্থ ও অপুষ্টি-পদার্থ মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় বা সযত্নে মাটির ভেতরে সংরক্ষণ করা হয়। পরে এগুলি উদ্ভিদের ভালো সারে পরিণত হয়। ফুলকপি ও অন্যান্য শাক-সব্জির চাষে এগুলি চাষীরা ব্যবহার করে। শাক-সব্জি জলের মাধ্যমে এগুলি শোষণ ক'রে তাদের দেহ-বৃদ্ধি করে। বড় বড় ফুলকপি, বাঁধাকপি ও বেগুনে সার-রূপ জড়বস্তুগুলি সব্জির মধ্যে সজীব ও প্রাণময় হয়ে ওঠে। মানুষ-সহ অন্যান্য শাকাশী প্রাণী শাক-সব্জি খেয়ে তাদের দেহে ওই সারের মধ্যে থাকা জড়বস্তুগুলিকে আবার শরীর-বৃদ্ধির কাজে লাগায়:

প্রাণীর বর্জ্য ও অপুষ্ট খাদ্য → সার → মাটি → শাক-সব্জি → প্রাণী
↑____↓

কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীদের হাড় গুঁড়িয়ে চূর্ণ-করা 'বোন-ডাস্ট' (Bone-dust) সার হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। হাড়ের চূর্ণ দিন-পনেরো মাটিতে মিশিয়ে রাখলে, তা'ও মাটিতে পরিণত হয়। হাড়ের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস থাকে, তা গাছ শোষণ ক'রে নেয় জলের মাধ্যমে এবং প্রাণী সেই গাছ খেয়ে নিজেদের দেহে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস বৃদ্ধি করে। প্রতিটি বস্তুই তার রূপ পরিবর্তন করছে নানাভাবে এবং এই আবর্তনে বস্তু একবার প্রাণী আর একবার উদ্ভিদের ভেতর দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন: **কোন বস্তুর ক্ষয় নেই, আছে বিভিন্ন রূপে জীবের মধ্যে তাদের চক্রাকারে প্রবাহ।**

মানুষ নতুন নতুন শিল্প-অঞ্চলের জন্য বা বাসভূমির জন্য বন-জঙ্গল, জলাভূমি ইত্যাদি পরিষ্কার ক'রে মানব-বসতি স্থাপন করার ফলে দিনে দিনে সবুজ বনাঞ্চলের পরিধি কমে যাচ্ছে। তৃণভূমি ও বনাঞ্চল কমে যাওয়ার ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং এইভাবে সবুজ উদ্ভিদের ক্ষয়ের ফলে বাতাস দূষিত হয়ে গেলে জীবের ধ্বংস অনিবার্য। তেমনি কল-কারখানার চিমনি-

নিঃসৃত কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস বাতাসকে ভীষণভাবে দূষিত করে। বড় নদীগুলিতে ক্রমাগত কল-কারখানার আবর্জনা-নিক্ষেপ, বিভিন্ন পৌর-প্রতিষ্ঠানের নালা-নর্দমার জল-নিক্ষেপ ইত্যাদির ফলে নদীর জল ক্রমে বিষাক্ত হয়ে যায়। ফলে জলজ প্রাণী, যেমন—মাছ ইত্যাদির সংখ্যা কমে আসে এবং তার ফলে নদীর জলও ক্রমশঃ পানের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। নতুন নতুন রেলের লাইনের জন্যেও বন-জঙ্গল কাটা হয়। এ-সবের ফলে জড় ও জীবের ভারসাম্যতা বজায় থাকে না। তাই নতুন নতুন কৃত্রিম বনাঞ্চল সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। সবুজ উদ্ভিদের সমাবেশ কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে না, এর ফলে জীব-জগতের আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ভর করে।

ক্রমাগত বন-জঙ্গল বিনাশের ফলে বন্য প্রাণীরা ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বহু প্রাণীর আর অস্তিত্ব নেই। তাই সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতি গঠন করেছেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে বিশেষ বিশেষ বনভূমি অঞ্চলে আইনের দ্বারা প্রাণী-হত্যা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, এবং বিলুপ্তপ্রায় বিশেষ বিশেষ প্রাণীদের নতুন স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সব বনাঞ্চলকে **অভয়ারণ্য** বলা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে চামরামারি, সুন্দরবন, গোরুমারা, জলদাপাড়া ইত্যাদি স্থানে অভয়ারণ্য দেখা যায়। বাস্তু-সংস্থান-তন্ত্রের সাথে সংরক্ষণ পারস্পারিকভাবে নির্ভরশীল।

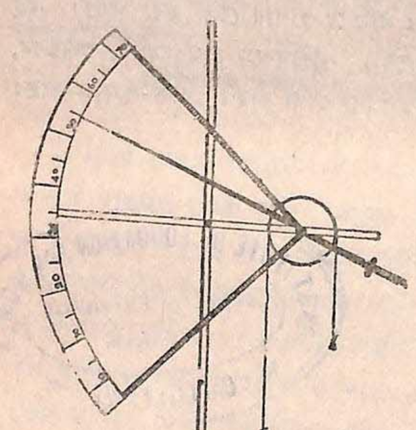
দশম পরিচ্ছেদ

প্রদর্শন ও পরীক্ষা

(Demonstration and Experiments)

A. বৃদ্ধির পরীক্ষা (Experiment on Growth) ঃ উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধি কি-ভাবে মেপে জানা যায়, তা 'বৃদ্ধি ও জনন' পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে ল্যাবরেটরিতে কাণ্ডের বৃদ্ধির পরীক্ষা কি-ভাবে করা হয়, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। **আর্ক-ইণ্ডিকেটর** (*Arc-indicator*) যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি পরীক্ষা করা যায়।

যন্ত্র (*Description of apparatus*) ঃ আর্ক-ইণ্ডিকেটরের প্রধান অংশ একটি বৃত্তের এক-চতুর্থাংশ নিয়ে তৈরি। এক-চতুর্থাংশটি কাঠের বা টিনের পাত দিয়ে তৈরি ও আর্কের ধারগুলি **অংশাঙ্কিত** (*Graduated*)। এর কেন্দ্রে একটি কপিকল (*Pulley*) লাগানো থাকে। কপিকলের কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে একটি সূক্ষ্ম **নির্দেশক** (*Pointer*) কপিকল থেকে আর্কের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নির্দেশক এমনভাবে লাগানো হয়, যাতে কপিকল ঘুরলে নির্দেশক আর্কের পরিধির ওপর ওঠা-নামা করতে পারে। একটি লোহার স্ট্যাণ্ডে আর্ক-ইণ্ডিকেটর যন্ত্রটি আটকানো থাকে।



চিত্র 98—আর্ক-ইণ্ডিকেটর।

উপকরণ (*Requirements*) ঃ আর্ক-ইণ্ডিকেটর, টব-সমেত সতেজ চারাগাছ, ভারী বস্তু ও টোন-সুতো।

পরীক্ষা (*Experiment*) : একটি শক্ত টোন-সুতো ইণ্ডিকেটরের কপিকলের মধ্যে দিয়ে দু'পাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সুতোর একপ্রান্ত চারাগাছের শীর্ষাগ্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল এবং সুতোর অপরপ্রান্ত একটি ভারী বস্তু দিয়ে বাঁধা রইল। বস্তুটি ঝুলতে থাকলো। চারাগাছের আগা যাতে ছিঁড়ে না যায়, তার জন্য চারাগাছ-অনুযায়ী ওজন বাঁধা হয়ে থাকে। আর্কের গায়ে নিদের্শকের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে, এই অবস্থায় প্রায় বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা রেখে দেওয়া হ'ল।

নিরীক্ষা (*Observation*) : মনে কর, বারো ঘণ্টা পরে দেখা গেল, নির্দেশক-আর্ক পূর্ব স্থান থেকে বেশ কিছুটা উপরে উঠে গিয়েছে। কতটা ওপরে উঠে গিয়েছে, তা আর্কের পরিধির উপর লিখিত পরিমাপ থেকে বোঝা যায়।

সিদ্ধান্ত (*Inference*) : উদ্ভিদের বৃদ্ধির ফলে, ভারী বস্তুর দিকে সুতো নেমে যায়, তাই নির্দেশকটি ওপরে উঠতে থাকে। নির্দেশকের অবস্থানের পার্থক্য হতে উদ্ভিদের বারো ঘণ্টার বৃদ্ধির পরিমান সহজে নির্ণয় করা যায়।

পরীক্ষার ফল (*Result*) : মনে কর, নির্দেশকটি 12 ঘণ্টায় x সে.মি. ওপরে উঠেছে। সাধারণতঃ আর্কের পরিমাপ 90 গুণ বাড়ানো থাকে।

অতএব 12 ঘণ্টায় উদ্ভিদের প্রকৃত বৃদ্ধি হচ্ছে :

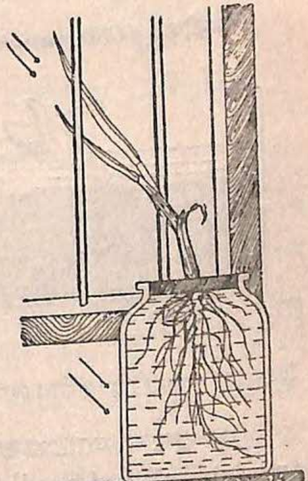
$$\frac{x}{90} \text{ সে.মি.} = y \text{ সে.মি. (মনে ক'রে);}$$

সুতরাং, প্রতি ঘণ্টায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি $= \frac{y}{12}$ সে.মি.।

B. আলোকবৃত্তির পরীক্ষা (Experiment on Phototropism) :

উপকরণ (*Requirements*) : দুই-ছিদ্র-যুক্ত একটি রবারের ছিপি, বাঁকানো কাঁচের নল, একটি বড় বোতল, অনুশীলন-দ্রবণও একটি সতেজ চারাগাছ।

পরীক্ষা (*Experiment*) : বোতলটিতে অনুশীলন (কৃষ্টিজল)-দ্রবণ দিয়ে অর্ধেকের চেয়ে বেশী ভর্তি করার পরে ছিপির সাহায্যে বোতলের মুখটি ভালোভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। এখন ছিপির একটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চারাগাছটি এমনভাবে প্রবেশ করাও, যাতে শুধুমাত্র গাছের মূল অঞ্চলটি



চিত্র 99—উদ্ভিদ আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অনুশীলন-দ্রবণের মধ্যে ডুবে থাকে। ছিপির অপর ছিদ্র দিয়ে বাঁকানো কাঁচ-নলটি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ল। এতে বোতলের মধ্যে বায়ু-চলাচলের সুবিধে হয়। কোন একটি অন্ধকার ঘরের একটি মাত্র জানালা খুলে, বোতল-সমেত চারাগাছটিকে কয়েকদিন জানালার ধারে রেখে দেওয়া হ'ল।

নিরীক্ষা (*Observation*) : চার-পাঁচ দিন পরে চারাগাছের কাণ্ড জানালার দিকে ঝুঁকে গিয়েছে দেখা যাবে ; কিন্তু এর মূল স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

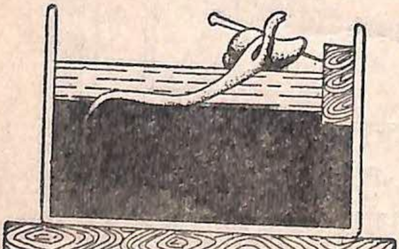
সিদ্ধান্ত (*Inference*) : উপরোক্ত পরীক্ষার দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, উদ্ভিদের সবুজ কাণ্ড ও শাখা আলোক-অনুকূলবর্তী।

C. অভিকর্ষবৃত্তির পরীক্ষা (Experiment on Geotropism) :

উপকরণ (*Requirements*) : সদ্য-অঙ্কুরিত ছোলা-বীজ, পারদ, পেট্রিডিস, ছিপি ও আলপিন।

পরীক্ষা (*Experiment*) : পেট্রিডিসটিকে অর্ধেক পারদে পূর্ণ ক'রে তার ওপর অল্প পরিমাণ জল ঢেলে দেওয়া হ'ল। সদ্য-অঙ্কুরিত ছোলা-বীজটি ছিপির সঙ্গে আলপিন দিয়ে গেঁথে জলের উপর ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল।

নিরীক্ষা (*Observation*) : ভাসমান বীজটিকে ওই অবস্থায় কিছুদিন রেখে দেবার পরে দেখা গেল, বীজের মূল জলের স্তর ভেদ ক'রে পারদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।



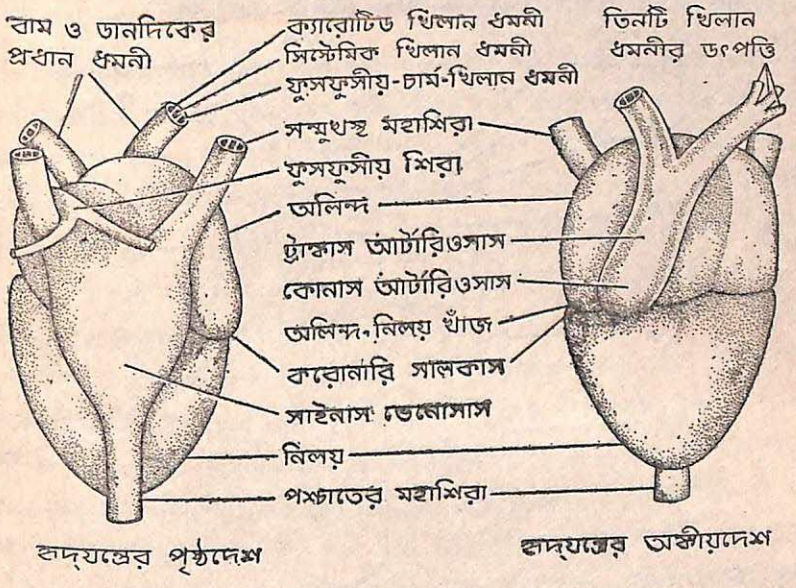
চিত্র—100 অভিকর্ষবৃত্তির পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত (*Inference*) : ধাতব পারদ অত্যন্ত ভারী হওয়া সত্ত্বেও অনুকূল ও অভিকর্ষী মূল পারদের বাধা অতিক্রম ক'রে পারদের মধ্যে প্রবেশ করছে।

D. কুনো-ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্র ও তার ধমনীতন্ত্র (Heart and Arterial arches of Toad) :

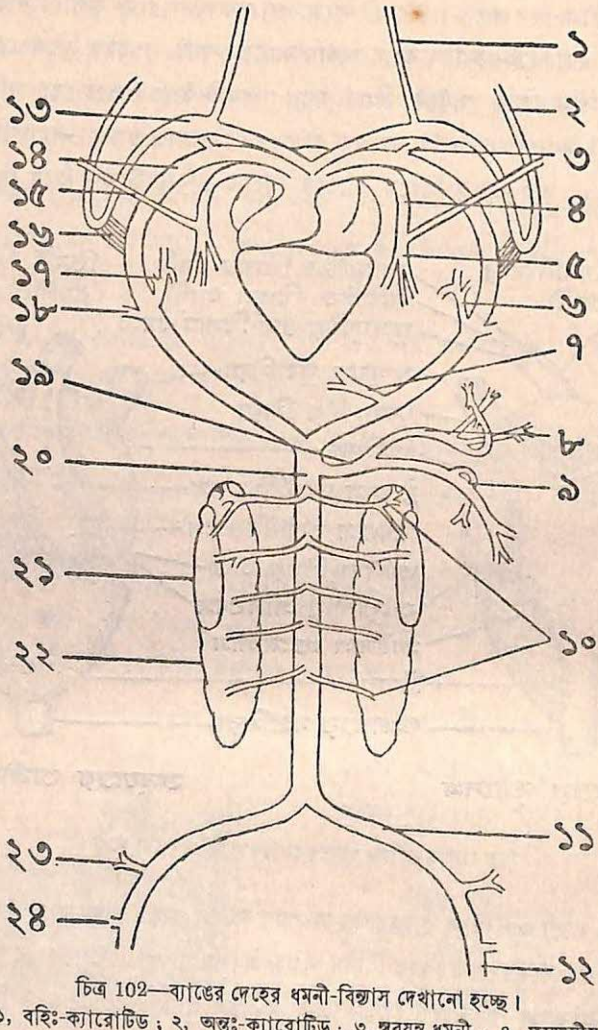
কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীকে ব্যবচ্ছেদ করতে হলে, সেটিকে আগে একটি বন্ধ-কৌটোর মধ্যে রেখে, তার ভেতরে তুলোর সাহায্যে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করতে হয়। এর দ্বারা

প্রাণী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। একটি কুনো-ব্যাঙকে উপরোক্ত উপায়ে সংজ্ঞাহীন ক'রে মোম-দেওয়া একটি ট্রে-তে চিৎ ক'রে অর্থাৎ অঙ্কীয়-দেশটি ওপরের দিকে রেখে, ব্যাঙের হাত ও পা পিন দিয়ে আটকে দিতে হয়। একটি কাঁচির সাহায্যে অতি সাবধানে ব্যাঙের অঙ্কীয়-মধ্যরেখার ওপর বরাবর ব্যাঙের কেবলমাত্র চামড়া লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলতে হবে। এই একই নিয়মে ব্যাঙের দেহের চর্বিস্তরটিকেও চিরে ফেলতে হবে।



চিত্র 101—ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রের বহিরাকৃতি দেখানো হচ্ছে।

এখন ট্রে-টির মধ্যে জল দিলে ব্যাঙ চেরা-অবস্থায় জলের মধ্যে থাকবে এবং জলের ভেতর থেকেই ব্যাঙের দেহের ভেতরকার বিবিধ অঙ্গগুলি দেখতে পাওয়া যাবে। ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর **পেক্টোরাল গার্ডলটি** (*Pectoral girdle*) থাকায়, সেটিকে কাঁচি দিয়ে কেটে দু'পাশ দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হয়। গার্ডলটি সরিয়ে ফেললেই ব্যাঙের হৃদ্‌যন্ত্র পরিষ্কার দেখা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের **পেরিকার্ডিয়াম** (*Pericardium*) আবরণটি অপসারণ করলে, হৃদ্‌যন্ত্রের **অলিন্দ** (*Auricle*) ও **নিলয়** (*Ventricle*) দেখা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের অঙ্কীয়-দেশে ওপরের দিকের বাম দিকে বাম-অলিন্দ ও ডান দিকে ডান-অলিন্দ দেখা যায় এবং এদের মাঝে লম্বালম্বি বিভেদ-প্রাচীরটিও চিহ্নিত করা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের নিচের দিকে উলটো ত্রিভুজের মতো নিলয় দেখা যায়। দুটি আঙুল দিয়ে নিলয়টিকে চেপে ধ'রে রাখলে, তার



চিত্র 102—ব্যাঙের দেহের ধমনী-বিন্যাস দেখানো হচ্ছে।

১, বহিঃ-ক্যারোটিড ; ২, অন্তঃ-ক্যারোটিড ; ৩, স্বরযন্ত্র ধমনী ; ৪, ফুস্‌ফুসীয় চার্ম-ধমনী ; ৫, ফুস্‌ফুসীয় ধমনী ; ৬, অক্সিপিটো-ভার্টিব্রাল ধমনী ; ৭, গ্রাসনালী ধমনী ; ৮, সিলিয়াক ধমনী ; ৯, মেসেন্‌টেরিক ধমনী ; ১০, বৃক্ক ধমনী ; ১১, ইলিয়াক ধমনী ; ১২, ফিমোরাল ধমনী ; ১৩, ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ ; ১৪, সিস্টেমিক খিলান-ধমনী ; ১৫, চার্ম-ধমনী ; ১৬, সন্ধিবন্ধনী (Ligament) ; ১৭, অক্সিপিটো-ভার্টিব্রাল ধমনী ; ১৮, সাব্‌ক্লেভিয়ান ধমনী ; ১৯, সিলিয়্যাকো মেসেন্‌টেরিক ধমনী ; ২০, পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনী (Dorsal Aorta) ; ২১, শুক্রাশয় ; ২২, বৃক্ক ; ২৩, এপিগ্যাস্‌ট্রিকো ভেসিকালিস ; ২৪, সায়াটিক ধমনী।

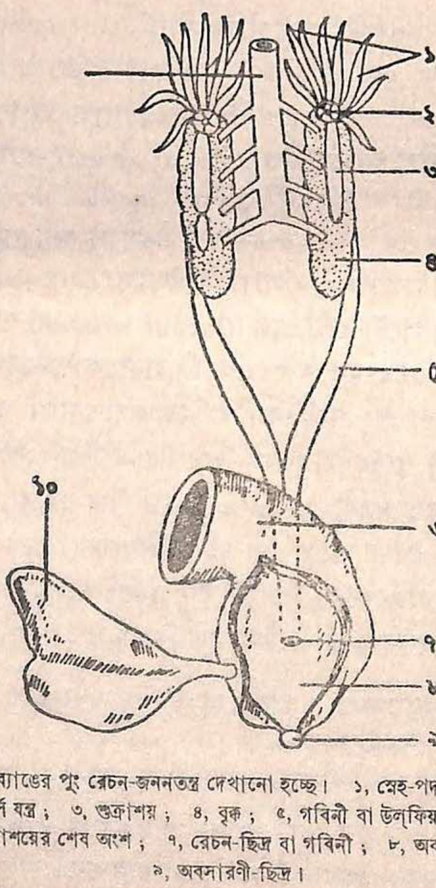
মধ্যে রক্ত আসা-যাওয়া করছে সেটি অনুভব করা যায়। নিলয়ের অগ্রাংশের ডান দিক থেকে **কোনাস আর্টারিওসাস** (*Conus arteriosus*) বা ধমনীর মূলটি বের হয়। কোনাস আর্টারিওসাসের সঙ্গে **ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস** (*Truncus arteriosus*) যুক্ত হয়েও আবার এটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি **মহাধমনী**তে (*Aortic arches*) পরিণত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের পৃষ্ঠদেশে একটি তিনমুখো থলি দেখা যায়। থলিটিকে **সাইনাস ভেনোসাস** (*Sinus venosus*) বলা হয়। থলিটির তিনটি মুখে তিনটি মহাশিরা এসে যুক্ত হয়।

ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস থেকে দুটি অ্যাওর্‌টিক আর্চ বাম ও ডানে বেরিয়ে এসে আবার প্রতিটি মহাধমনী তিনটি ধমনীতে বিভক্ত হয়। অ্যাওর্‌টিক আর্চের ওপর একটি পাতলা পর্দা থাকে। পর্দাটি সরিয়ে দিলে উপরোক্ত তিনটি **মহাধমনী** (*Aortic arches*) দেখা যায়। প্রথমটি **ক্যারোটিড আর্চ** (*Carotid arch*) ব্যাঙের মাথার দিকে এগিয়ে যায় এবং একটি গোলাকার **স্থূল ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ** (*Carotid labyrinth*) সৃষ্টি করে এবং এখান থেকেই **এক্সটারনাল ক্যারোটিড** (*External carotid*) ও **ইণ্টারনাল ক্যারোটিড** (*Internal carotid*) নামে দুটি ধমনী বের হয়। অ্যাওর্‌টিক আর্চের দ্বিতীয় বা **সিস্টেমিক আর্চ** (*Systemic arch*) বেঁকে অপরদিকের সিস্টেমিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি যুক্ত-ধমনী বা **ডরসাল অ্যাওর্‌টা** (*Dorsal aorta*) সৃষ্টি করে। প্রতিটি সিস্টেমিক হতে **ল্যারাইঞ্জিয়াল** (*Laryngeal*), **সাব্‌ক্লেভিয়ান** (*Subclavian*), **অক্সিপিটো-ভার্টিব্রাল** (*Occipito-vertebral*) শাখা-ধমনী বের হয়। ডরসাল অ্যাওর্‌টার সৃষ্টির মূল অংশ থেকে **সিলিয়াকো-মেসেন্‌টেরিক** (*Coeliaco mesenteric*) **ধমনী** বের হয়ে পৌষ্টিকনালীর দিকে এগিয়ে যায়। **ডরসাল অ্যাওর্‌টা** (*Dorsal aorta*) দুটি বৃক্কের মাঝখান দিয়ে নিচের দিকে নেমে যায় এবং প্রতিটি বৃক্ককে চারটি ক'রে **বৃক্ক ধমনী** (*Renal arteries*) দিয়ে বৃক্ককে রক্ত সরবরাহ করে। ডরসাল অ্যাওরটা দুটি পায়ের মাঝে এসে দুই **ইলিয়াক** (*Iliac*) ধমনীতে ভাগ হয়ে প্রতিটি পায়ে রক্ত সরবরাহ করে। প্রতিটি ইলিয়াককে আবার প্রতি পায়ে **সায়াটিক** (*Sciatic*) ও **ফিমোরাল** (*Femoral*) ধমনীতে বিভক্ত হতে দেখা যায়।

E. কুনো-ব্যাঙের পুং-রেচন-জননতন্ত্র (Male urino-genital system of Toad) :

ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদের প্রণালীর কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যাঙের 'ভিসারা' বা দেহের ভেতর খোলার পরে তার পৌষ্টিকতন্ত্রের পৌষ্টিকনালী ও পৌষ্টিকগ্রন্থি কেটে বাদ দিতে হবে। হৃদ্‌যন্ত্র, ফুস্‌ফুস, প্রধান শিরা ও ধমনীগুলি কেটে বাদ দিতে হবে।

পুরুষ-ব্যাঙের দুটি লম্বাকৃতি **বৃক্কের** (*Kidney*) ওপর একটি ক'রে সাদা, লম্বা **শুক্রাশয়** বা **টেস্‌টিস** (*Testes*) দেখা যায়। প্রতি বৃক্কের শীর্ষে হরিদ্রাভ ফিতের মতো অনেকগুলি **ফ্যাট বডিজ** (*Fat bodies*) থাকে। বর্ষাকালে এদের বৃদ্ধি বেশী হয়। ফ্যাট বডিজ ও টেস্‌টিসের মধ্যবর্তী স্থানে লাল রঙের গোলাকার **বিডার্স অরগানকে** (*Bidder's organ*) যুক্ত থাকতে দেখা যায়। এটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকেজো ডিম্বাশয়। বৃক্কের বাইরের দিক হতে একটি ক'রে **গবিনী নালী** বা **ইউরেটার** (*Ureter*) বের হয়। দুটি ইউরেটারকে ক্লোয়েকার কাছে যুক্ত হতে দেখা যায় এবং সংযুক্ত ইউরেটার নালীটি ক্লোয়েকার পৃষ্ঠদেশে উন্মুক্ত হয়। ব্যাঙের সাদা রঙের **মূত্রাশয়টি** (*Urinary bladder*) দ্বি-বিভক্ত এবং ক্লোয়েকা-র সঙ্গে যুক্ত।



চিত্র 103—ব্যাঙের পুং রেচন-জননতন্ত্র দেখানো হচ্ছে। ১, স্নেহ-পদার্থের ফিতা; ২, বিডার্স যন্ত্র; ৩, শুক্রাশয়; ৪, বৃক্ক; ৫, গবিনী বা উল্‌ফিয়ান নালী; ৬, মলাশয়ের শেষ অংশ; ৭, রেচন-ছিদ্র বা গবিনী; ৮, অবসারণী; ৯, অবসারণী-ছিদ্র।

শুক্রাশয় বা টেস্‌টিস-এর সঙ্গে বৃক্ক কয়েকটি অতি সূক্ষ্ম ভাসা-এফারেন্‌সিয়া নালী দিয়ে যুক্ত। ভাসা-এফারেন্‌সিয়া নালী বৃক্কের ইউরিনিফেরাস টিউবিউল্‌স-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। শুক্রকীট শুক্রাশয় থেকে ভাসা-এফারেন্‌সিয়া নালী-পথে ইউরিনিফেরাস টিউবিউলের ভেতর ঢোকে। অসংখ্য ইউরিনিফেরাস টিউবিউল যুক্ত হয়ে প্রতি বৃক্কে গবিনী নালী বা ইউরেটার সৃষ্টি করে। তাই মূত্রের সঙ্গে শুক্রাশয়ের শুক্রকীটও গবিনী নালীর ভেতর দিয়ে ক্লোয়েকায় জমা হয় এবং সেখান থেকে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে, ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কি?

2. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্রের বিবরণ দাও।

3. ব্যাঙের মস্তিষ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও। মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অঞ্চলের কি কি কাজ, তা লেখ।

4. স্নায়ু কোষ, স্নায়ু, গ্যাংলিয়ন, শ্বেতপদার্থের স্তর ও ধূসর পদার্থের স্তর—এই কথাগুলির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

5. মানুষের মস্তিষ্কের বিশদ বিবরণ চিত্রসহ দাও। এর কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি কি কাজ হয়, তা লেখ।

6. সুষুম্নাকাণ্ডের অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

7. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কি? এই তন্ত্রটি কি-ভাবে কাজ করে?

8. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখের অন্তর্গঠনের বিবরণ দাও।

9. মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদ এঁকে তার প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা কর।

10. চোখের উপযোজন ক্রিয়া কাকে বলে? ক্ষীণদৃষ্টি ও দীর্ঘদৃষ্টি শব্দের অর্থ কি?

11. প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

12. মানুষের কানের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দাও।

13. চামড়ার বিবিধ অংশ বর্ণনা কর।

14. নাক ও জিভ—এই দুই স্নায়ু-অঙ্গের কার্যকারিতার বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি কাকে বলে? মানুষের দেহের কোন্ কোন্ স্থানে এই ধরনের কি কি গ্রন্থি দেখা যায়? হরমোনের কাজ কি?

2. পিট্যুইটারী গ্রন্থির বিষয়ে বিশদ বিবরণ দাও।

3. থাইরয়েড ও প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি দেহের কোথায় থাকে? এদের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

4. অ্যাড্রিনাল ও অগ্ন্যাশয় যন্ত্রের হরমোনগুলির কার্যকারিতা লেখ।

5. শুক্রাশয়, থাইমাস ও পাকস্থলীর গ্রান্ত্রকে এণ্ডোক্রাইন অধ্যায়ে কেন ফেলা হয়? কি কি হরমোন এদের থেকে নিঃসৃত হয় এবং এদের কাজ কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. চিত্রসহ মাইটোসিসের বিবরণ দাও।

2. উদ্ভিদ-কোষের মাইটোসিসের সঙ্গে প্রাণিকোষের মাইটোসিসের কি পার্থক্য?

3. প্রাণিকোষ-মাইটোসিসের বিবরণ দাও ও প্রতিটি দশার চিত্র অঙ্কন কর।

4. মেয়োসিস কাকে বলে? উদ্ভিদ্ বা প্রাণী-বীজকোষের মেয়োসিসের বর্ণনা কর। প্রতিটি দশার চিত্র অঙ্কন কর।

5. উজেনেসিস ও স্পারমাটোজেনেসিস প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর। এর তাৎপর্য কি?

6. ক্রোমোজোমের জোড়-বাঁধা অবস্থার আগে ও পরে তার গঠন সম্বন্ধে লেখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিবিধ দশা বর্ণনা কর।

2. দৈনিক বৃদ্ধি বললে কি বুঝায়?

3. বায়ুমণ্ডলের বৃদ্ধি কি কি অবস্থার উপর নির্ভরশীল?

4. গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জনন ও নিষেক বর্ণনা কর।

5. থ্যালোফাইটার জনন বর্ণনা কর।

6. ব্রাওফাইটা ও টেরিডোফাইটা উদ্ভিদের জনন ও জনন-অঙ্গগুলির বিবরণ দাও।

7. প্রোটোজোয়ার জনন-প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

8. হাইড্রার বিবিধ প্রকারের জনন-অঙ্গ বর্ণনা কর।

9. আরশোলার একই দেহে পুং- ও স্ত্রী-জননতন্ত্র কি-ভাবে অবস্থান করে, তার বিবরণ দাও।

10. ব্যাঙের পুং-জননতন্ত্রকে কেন পুং-রেচন-জননতন্ত্র বলা হয়? ব্যাঙের উপরোক্ত তন্ত্রটির চিত্র অঙ্কন ক'রে পুং-জননতন্ত্রের বিবরণ দাও।

11. গিনিপিগের জননতন্ত্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. বংশপরম্পরার গুণাগুণ কি-ভাবে বংশানুক্রমিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে-বিষয়ে বিশদ বিবরণ দাও।

2. বিয়োজন-বিভাজন পদ্ধতি কাকে বলে? এর সঙ্গে বংশগতির কি সম্বন্ধ?

3. জন মেণ্ডেল-এর জীবনী এবং তাঁর তত্ত্ব কি-ভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল তা বর্ণনা কর।

4. মেণ্ডেল-এর পরীক্ষাগুলি বর্ণনা কর এবং পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা লেখ।

5. 'দ্বি-সঙ্কর বংশের আনুপাতিক হার' কি-ভাবে বার করা হয়, সেটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

6. মেণ্ডেলের সূত্রগুলি বর্ণনা কর।

7. সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর: জিনোটাইপ, সংকর, রিসেসিভ, ডমিন্যান্ট ও ফিনোটাইপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. অভিব্যক্তি কাকে বলে? অভিব্যক্তির জীবাশ্ম-ঘটিত কিছু প্রমাণ লিপিবদ্ধ কর।

2. অভিব্যক্তির ভ্রূণ-ঘটিত ও কোষতত্ত্ব-ঘটিত প্রমাণগুলির বিবরণ দাও।

3. মেরুদণ্ডীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল গঠনের সাদৃশ্য থেকে কি-ভাবে অভিব্যক্তির ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা বর্ণনা কর।

4. কোন যন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারা দেখে, জীবের অভিব্যক্তির ইঙ্গিত কি-ভাবে পাওয়া যায়, তার বিবরণ দাও।

5. দেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলির অভিব্যক্তিকে প্রমাণিত ক'রে ও তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

6. 'হিমোগ্লোবিন স্ফটিক' কাকে বলে? এর দ্বারা কি-ভাবে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়—লেখ।

7. 'লামার্ক-এর তত্ত্ব' ব্যাখ্যা কর।

8. ডারউইন-এর তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা কর।

9. পরিবর্তন কি-ভাবে আসে? এ-বিষয়ে লামার্ক-এর ও ডারউইন-এর মত লেখ।

10. 'ডি ভ্রিস-এর তত্ত্ব' সংক্ষেপে লেখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1. অভিযোজন কাকে বলে ভালো ক'রে বুঝিয়ে লেখ। জীব-জগতে অভিযোজন কত রকমের দেখা যায়, তার একটি সংক্ষিপ্ত চার্ট লেখ।

2. জলের জন্যে অভিযোজনের ধারা কি? একটি আদি জলজ-প্রাণীর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে? বিবিধ পর্বের মধ্যে জলের জন্য অভিযোজিত প্রাণীগুলির ছোট ক'রে বিবরণ দাও।

3. আকাশের অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য কি? পায়রার আকাশের অভিযোজনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

4. যে-সমস্ত প্রাণী উড়ুক্কু জীবনযাপন করেছে, অথচ পক্ষী নয়, তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম ও বিবরণ দাও।

5. দ্রুতগতির জন্য অভিযোজন প্রাণীদের মধ্যে কেন হয়? এইসব প্রাণী-অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

6. মরুবাসের জন্য অভিযোজন কোন্ কোন্ প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে হয়েছে? এদের বিবরণ দাও।

7. গুহা-বাসের জন্য অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য কি? উদাহরণসহ অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

8. কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য অভিযোজনের বিবরণ দাও।

9. সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:
পাতা-পতঙ্গ, কাঠি-পোকা, মোলক, টালপা এবং উড়ুক্কু লিমুর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

1. পরিবেশে নাইট্রোজেনের চক্র কি-ভাবে কাজ করে, তার বিবরণ দাও।
2. নাইট্রোজেন-চক্রের একটি চার্ট এঁকে, তার প্রতিটি গতি-প্রকৃতি নির্ণয় কর।
3. বিদ্যুৎক্ষরণে নাইট্রোজেনের স্থিতি কি-ভাবে হয় ?
4. নাইট্রোজেনের স্থিতিতে স্বাধীন ব্যাক্‌টিরিয়ার কি ভূমিকা আছে, তার বিবরণ দাও।
5. মিথোজীবী ব্যাক্‌টিরিয়ার সঙ্গে নাইট্রোজেনের কি সম্বন্ধ তা লেখ।
6. কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্রের চিত্রসহ বিবরণ দাও।
7. অক্সিজেনের বিবর্তন-চক্র বিশদভাবে বর্ণনা কর।

নবম পরিচ্ছেদ

1. নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর :

(i) মিথোজীবিতা, (ii) সহযোগিতা, (iii) পরজীবিতা, (iv) শিকারী, (v) খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, (vi) প্রতিযোগিতা।

2. পরিবেশ-প্রথা কাকে বলে ? উদাহরণসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।
3. পুকুরের পরিবেশ-প্রথা কেমন হয়, তার একটি চিত্র এঁকে দেখাও ও তার বিবরণ দাও।
4. পরিবেশ-প্রথা চক্রাকারে আবর্তন করে।
5. খাদ্য-নির্মাণকারী জীবের সহিত ব্যবহারকারী প্রাণীর সম্বন্ধের ধারা ব্যাখ্যা কর।
6. সংরক্ষণের বিষয় যা জান—লেখ।

দশম পরিচ্ছেদ

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কি-ভাবে হয়, তা একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।
2. আলোকবৃত্তি-জনিত উদ্ভিদের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে একটি পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যা দাও।
3. অভিকর্ষ কি-ভাবে উদ্ভিদের মূলকে আকর্ষণ করে, তার একটি পরীক্ষা ক'রে দেখাও।
4. ব্যাঙের ধমনীতন্ত্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।
5. ব্যাঙের পুং-রেচন-জননতন্ত্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।

—

পর্ষদ-নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নাবলী

1. স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে? একটি নিউরোনের চিহ্নাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর। নিউরোনের কাজ কি? নিউরোনের প্রকারভেদ লেখ।

2. স্নায়ুতন্ত্রের মুখ্য কাজ কি? স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম উল্লেখ কর।

3. সাইনাপ্‌স কি এবং এর কাজ কি? কোন্ স্নায়ু অনুভূতি বহন করে এবং কোন্ স্নায়ু আজ্ঞা বহন করে? 'স্নায়বিক শক্তি' কথার অর্থ কি? স্নায়বিক শক্তি কিভাবে পরিবাহিত হয়?

4. প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার একটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। প্রতিক্ষিপ্ত চাপের একটি চিহ্নাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর। সাপেক্ষ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া কাকে বলে, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

5. সংক্ষেপে সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন ও কার্যাবলী লেখ। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কাকে বলে? মানবদেহে এই তন্ত্রের কাজ কি? স্নায়ুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি?

6. মানুষের চোখের চিহ্নাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর। চোখের ভিতর আলো প্রবেশ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? লেন্স ও রেটিনা কি কাজ করে? পুঞ্জাক্ষি কাকে বলে?

7. মানুষের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গের নাম কি? সংক্ষেপে মানুষের কর্ণের গঠন বর্ণনা কর। মস্তিষ্কের কোন্ অংশ ভারসাম্য-রক্ষার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে? মাছ শব্দ-তরঙ্গের অনুভূতি গ্রহণ করে কিভাবে?

8. স্বাদ-কোরক কাকে বলে? মানুষ কিভাবে বিবিধ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে? স্বাদ-অনুভূতির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক কি?

9. এণ্ডোক্রাইন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কাকে বলে? হরমোন কাকে বলে? হরমোনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

10. উদ্ভিদের কয়েকটি হরমোনের নাম লেখ। ফুল ফোটার জন্য কোন্ হরমোনের প্রয়োজন? উদ্ভিদ-হরমোনের উপর কিভাবে বৃদ্ধি নির্ভরশীল, তার ব্যাখ্যা কর।

11. মানবদেহের বিভিন্ন প্রধান প্রধান হরমোনের নাম, তাদের উৎস-স্থল এবং কাজগুলি উল্লেখ কর।

12. পিট্যুইটারী গ্রন্থিকে কেন "মাস্টার অব এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ডস্" বলা হয়? অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হরমোনের কয়েকটি কাজ উল্লেখ কর।

13. বৃদ্ধি কাকে বলে? মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাকে বলে? উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোন্ কোন্ অংশে হয়? উদ্ভিদের মূলের বর্ধনশীল অঞ্চল কি-ভাবে নির্ণয় করতে হয়?

14. অঙ্গজ-প্রজনন কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্নপ্রকার অঙ্গজ-প্রজননের উল্লেখ কর। একটি উদ্ভিদ্ ও একটি প্রাণীর উদাহরণ দ্বারা অঙ্গের পুনর্গঠন আলোচনা কর।

15. প্রজনন কয়প্রকার এবং কি কি? প্রজননের উদ্দেশ্য কি? নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের বংশ কি-ভাবে বিস্তার হয়, তা সংক্ষেপে লেখ।

16. অযৌন-প্রজনন কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্নপ্রকার অযৌন-প্রজনন উল্লেখ কর। জন্মুঃক্রম কাকে বলে?

17. যৌন-প্রজনন কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্নপ্রকার যৌন-প্রজননের উল্লেখ কর। অযৌন ও যৌন প্রজননের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে লেখ।

18. অস্থি, নার্ভকোষ বা স্নায়ুকোষ ও পেশীকোষের বৃদ্ধি কি-ভাবে হয়? বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের কেন প্রয়োজন হয়?

19. কিরূপে বীজবিহীন ফল উৎপন্ন হয়? কলমের গাছ কাকে বলে? কলমের গাছের সুবিধা কি?

20. জীবদেহের কোষ-বিভাজন কেন হয়? কোষ-বিভাজনের প্রকারভেদ উল্লেখ কর। জীবদেহের নিউক্লিয়াসের গঠন ও ভূমিকা লেখ। দেহকোষ ও জনন-কোষ কাকে বলে?

21. ক্রোমোজোমের গঠন ও কার্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। সমগণীয় বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম কাকে বলে? অটোসোম কাকে বলে? কোষ-বিভাজনে সেণ্ট্রো-জোমের ভূমিকা কি?

22. মাইটোসিস কাকে বলে? মাইটোসিসের বিবিধ দশাগুলির নাম উল্লেখ ক'রে প্রতিটি দশার চিহ্নাঙ্কিত চিত্র আঁক।

23. মাইটোসিসকে কেন সম-বিভাজন প্রক্রিয়া বলা হয়? অ্যামাইটোসিস কাকে বলে? মাইটোসিসের তাৎপর্য কি?

24. মাইটোসিসের কোন্ দশায় এবং কি-ভাবে ক্রোমাটিড গঠিত হয়? নিউক্লিয়োলাসের কাজ কি? মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দশায় নিউক্লিয়োলাসের বিভিন্ন অবস্থানের নির্দেশ দাও।

25. মেয়োসিস কাকে বলে? রিডাক্‌শন ডিভিসন কাকে বলে? মেয়োসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দশাগুলির নাম উল্লেখ ক'রে চিহ্নাঙ্কিত চিত্র আঁক। মাইটোসিস ও মেয়োসিস কোথায় হয়?

26. সাইনাপ্‌সিস কাকে বলে? মেয়োসিস প্রক্রিয়ার বাইভ্যালেণ্ট কোন্ অবস্থায় সৃষ্টি হয়? এই প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের টেট্রাড কি-ভাবে গঠিত হয়? অতিক্রমণ (crossing over) কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কি?

27. মাইটোসিস ও মেয়োসিস প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। উভয় প্রক্রিয়ার তাৎপর্য সংক্ষেপে বিবৃত কর। জন্তুঃক্রমের সঙ্গে মাইটোসিস ও মেয়োসিসের সম্পর্ক কি?

28. বংশগতি কাকে বলে? কি কি কারণে দুইটি প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়? প্রজনন কাকে বলে?

29. মেণ্ডেল-এর এক-সংকর (Monohybrid) পরীক্ষায় F_1, F_2-তে কি দৃষ্ট হয়েছিল? এক-সংকর অনুপাত ক্রোমোজোমের আচরণ দ্বারা কি-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

30. স্পারমাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস কাকে বলে? শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনের দশাগুলি বর্ণনা কর।

31. মেণ্ডেল-কৃত একটি দ্বি-সংকর পরীক্ষার ছক্ প্রস্তুত কর এবং একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের উদাহরণ দ্বারা মেণ্ডেল-তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

32. প্রবলতাযুক্ত জিন (Dominant Gene) এবং সুপ্ত জিন (Recessive Gene) কাকে বলে? সংকরায়ণ (Hybridisation) কাকে বলে ব্যাখ্যা কর? এই পদ্ধতি কৃষিকাজে কি-ভাবে লাগানো হয়েছে?

33. অভিব্যক্তি বা বিবর্তন কাকে বলে? অভিব্যক্তিবাদের প্রধান প্রধান মতবাদগুলি উল্লেখ কর। অভিব্যক্তির সপক্ষে প্রমাণগুলি উল্লেখ কর।

34. তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান ও তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্বের প্রমাণের সাহায্যে কি-ভাবে অভিব্যক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

35. মিউটেশান কাকে বলে? এই মতবাদের প্রবক্তা কে? বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মতবাদ সংক্ষেপে লেখ।

36. লামার্ক-মতবাদ কি? উদাহরণসহ এই মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

37. "প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি হয়"—এই মতবাদের প্রবক্তার নাম কর। প্রবক্তার পর্যবেক্ষণগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ কর।

38. "ব্যক্তির গঠনক্রমে জাতির গঠনেতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে" (Ontogeny repeats Phylogeny)—এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা কর।

39. অভিযোজন কাকে বলে? অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি? জীব-জগতে অভিযোজনের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

40. জলে বসবাসকারী উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর অভিযোজনের জন্যে যে-সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাদের বিষয় সংক্ষেপে উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

41. খেচর প্রাণীর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। দ্রুতগতির জন্য অভিযোজনের মূল অঙ্গটি কি? প্রাণীদের মধ্যে কেন এর প্রয়োজন হয়? দ্রুতগতির জন্য অভিযোজনের একটি আদর্শ উদাহরণ দাও।

42. শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটি কাকে বলে? ঐরকম মাটিতে জন্মায় এমন কয়েকটি উদ্ভিদের নাম উল্লেখ ক'রে এদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। পশ্চিমবঙ্গে ঐ ধরনের মাটি কোথায় পাওয়া যায়?

43. গর্তে বাস করে, এমন কয়েকটি প্রাণীর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। পরজীবীদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

44. বাস্তুমণ্ডলের সঙ্গে জীবমণ্ডলের সম্পর্ক কি? অক্সিজেনের উৎস এবং বিভিন্ন প্রকারে এর ব্যবহার উল্লেখ কর। অক্সিজেন-আবর্তের একটি ছক অঙ্কন ক'রে দেখাও।

45. জীবগোষ্ঠী (Biotic community) এবং ভারসাম্য জীবগোষ্ঠী কাকে বলে? চিত্র-সহযোগে একটি পুকুরের বাস্তু-তন্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

46. বাস্তু-তন্ত্রে শক্তির প্রবাহ কি-ভাবে হয়? খাদ্য-খাদকের সংখ্যার পিরামিড কাকে বলে? সংখ্যার পিরামিডের জীবসমূহের ভারসাম্য কি-ভাবে বজায় থাকে?

47. সংরক্ষণ কাকে বলে? সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? পরিবেশ-সংরক্ষণে উদ্ভিদের ভূমিকা কি?

48. বিভিন্ন প্রাণীর অবলুপ্তির কারণ কি? অভয়ারণ্য কাকে বলে? অভয়ারণ্যের প্রয়োজনীয়তা কি? আমাদের দেশের কয়েকটি অভয়ারণ্যের নাম লেখ।

—